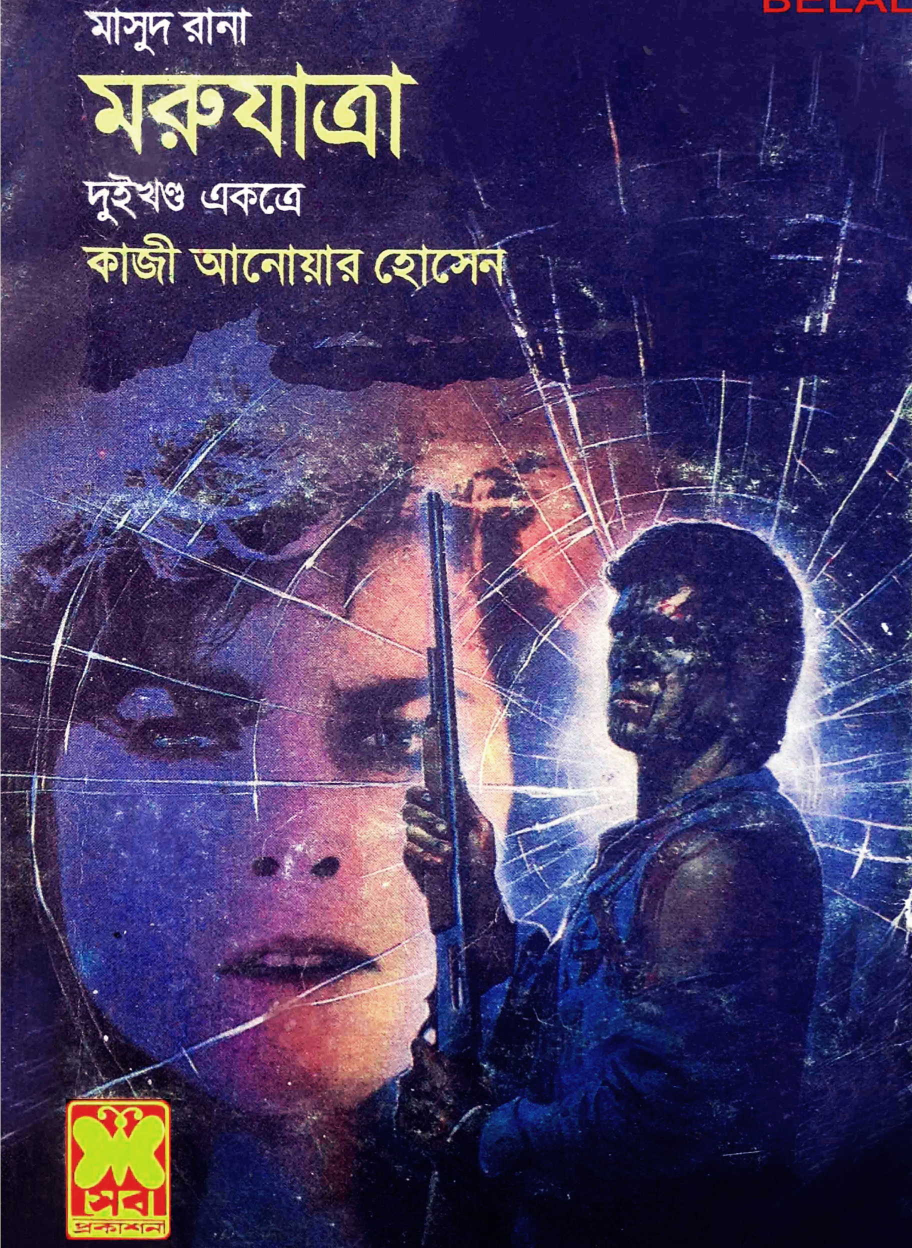

মাসুদ রানা
মরুযাত্রা
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

মরুযাত্রা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

জরুরী কাজে প্যারিসের বাইরে যেতে হচ্ছে
রানা এজেন্সির শাখা-প্রধান আশরাফ চৌধুরীকে।
কিন্তু কোন কথা শুনবে না সীন ওয়াট,
একটা কাজ তাকে করে দিতেই হবে।
গুরুত্বপূর্ণ কি যেন তথ্য বিক্রি করতে চায়
মাদাম স্যানডোরা। ব্যাপার কি খোঁজ নিয়ে
জানতে হবে তাকে। ছুটি কাটাচ্ছে রানা প্যারিসে।
বুদ্ধি চাইল আশরাফ। রানা পরামর্শ দিল:
নিয়ে নাও হে, নিয়ে নাও। টাকার বড় দরকার।
কাজটা হাতে নিল আশরাফ, তারপর হাসতে হাসতে
ফাঁসিয়ে দিল রানাকে। রানার ঘাড়ে কাজটা চাপিয়ে দিয়েই
সকল হাসি-কান্নার উর্ধ্বে চলে গেল আশরাফ চৌধুরী।
শুরু হলো গল্প।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

মরুযাত্রা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7123-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪
ষষ্ঠ প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮০৭৪০৮ (M–M)
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
MORUJATRA
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেতাল্লিশ টাকা

মরুযাত্রা-১ ৫—১২৫
মরুযাত্রা-২: ১২৬—২৪৮

সস্তায় মাসুদ রানার বই: ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৫/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪১/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪১/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৩৮/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৪/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩২/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	২৭/-
২৭-২৮	বিপদজ্জনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৪/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৫/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা (একত্রে)	৪০/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৬/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫২/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ (একত্রে)	৩৯/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৩৭/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৭-২১৮	অগ্নিশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৭/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৬/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-

মরুযাত্রা-১

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮৪

এক

'প্যারিস, আমার ভালবাসা, প্রথম প্রেম...'

সন্ধে লাগতে না লাগতে মনোলোভা সাজে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে নগরী। প্রজাপতির মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে যুবক যুবতীর দঙ্গল। মেট্রোপোল বারে বেশ ভিড়। কোমল, মৃদু, ঠাণ্ডা আলোয় স্বপ্নালু একটা পরিবেশ। উদাস চেহারার এক যুবক স্টেজে এসে দাঁড়াল, হাতে স্প্যানিশ গিটার, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এলোমেলো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভারি বিষণ্ণ সুরে ধরল সে গান—'প্যারিস, আমার ভালবাসা, প্রথম প্রেম...'

সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল এক বাংলাদেশী যুবক। নীল জিনস আর কালো জ্যাকেট পরে আছে সে। লম্বা, মজবুত কাঠামো শরীরের, চওড়া হাড়, মেদ নেই। দোরগোড়া থেকে এক পা এগিয়ে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল চারদিক।

কোন টেবিল খালি নেই। সবার থেকে একটু দূরে, কোণের টেবিলে একা বসে আছে মাঝ-বয়েসী এক আমেরিকান। ঈগলের মত ধারাল চেহারা, পরনে নিখুঁত ভাঁজ করা সিটি স্যুট, চোখে রিমলেস চশমা। ধারণা করা হয়, মার্কিন দূতাবাসে ছোটখাট কোন একটা পদে চাকরি করে সে। আসল ব্যাপারটা খুব কম লোকেই জানে—গত কয়েক বছর যাবৎ ফ্রান্সে সি.আই.এ-র শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে লোকটা। নাম, সীন ওয়াট। কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই বাংলাদেশী যুবককে দেখতে পেল সে, ভাঁজটা মিলিয়ে গেল কপাল থেকে, একটা হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর।

দু'সারি টেবিলের মাঝখান দিয়ে দৃঢ়, দ্রুত পায়ে এগোল আশরাফ চৌধুরী। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্যারিস শাখার বর্তমান প্রধান সে। সীন ওয়াটের জরুরী টেলিফোন পেয়ে দেখা করতে এসেছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওয়াট, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে করমর্দন করল আশরাফের সাথে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন, মি. চৌধুরী।' আঙুল নেড়ে ওয়েটারকে ডাকল সে, নিজের জন্যে নির্জলা হুইস্কি আর আশরাফের জন্যে পাইন্যাপল্ জুস দিতে বলল। দীর্ঘ দু'বছর ধরে আশরাফের সাথে পরিচয় তার, ঠেকায়-বেঠেকায় প্রায়ই রানা এজেন্সির সাহায্য নিতে হয় তাকে, জানে, এই লোক মদ স্পর্শ করে না।

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যেতে নিচু গলায় আলাপ শুরু করল ওরা।

'কাজটা ছোট্ট...'

মৃদু হেসে ওয়াটকে বাধা দিল আশরাফ। 'তার আগে বলুন, কবে ধরতে

হবে।'

'আজ রাতেই,' বলল ওয়াট। 'সামান্য কাজ, কিন্তু আমার মন বলছে···'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আশরাফ। 'দুঃখিত, মি. ওয়াট। আজ তো নয়ই, আগামী দু'একদিনও আমরা কোন কেস নিতে পারব না।'

মনে মনে উদ্বেগ বোধ করলেও চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না ওয়াট। মুখে হাসি টেনে জানতে চাইল, 'কেন?'

'আমার লোকজন কেউ ছুটিতে, কেউ কাজ নিয়ে প্যারিসের বাইরে গেছে। আমিও আজ রাতের ফ্লাইটে "নিসে" চলে যাচ্ছি। দু'দিন পর হলে করে দেয়া যেত, তার আগে কোনমতেই সম্ভব নয়।'

মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে চাইলেও সেটাকে জোর করে ধরে রাখল ওয়াট। ক্ষীণ একটু আবদারের সুরে বলল, 'কিভাবে ম্যানেজ করবেন সে আপনি জানেন, কিন্তু এই কাজটা আপনাকে করে দিতেই হবে। তেমন কিছু না, স্রেফ একটা মেয়ের সাথে দেখা করা···'

নিষেধ করার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি একটা হাত নাড়ল আশরাফ। কাজটা কি, শুনতে চায় না ও। বলল, 'উপায় নেই, সম্ভব নয়। আপনি আর কারও সাহায্য নিন, মি. ওয়াট।'

ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল ওয়াট। ওয়েটার এসে ওদেরকে হুইস্কি আর জুস দিয়ে চলে গেল। 'এই কাজটার জন্যে আর কারও সাহায্য নেবার কথা আমি ভাবছি না, মি. চৌধুরী। আপনি তো জানেন, সরাসরি আমার আন্ডারে কাজ করে এমন এজেন্ট নেই বললেই চলে। এভাবেই চালিয়ে নিতে হয় আমাকে। কাজটা কি শোনার পর আপনিও বুঝতে পারবেন কেন আমি অন্য কারও বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে চাইছি না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল আশরাফ, তাকে বাধা দিয়ে আবার বলল ওয়াট, 'প্রশংসা করছি না, কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলে রানা এজেন্সি সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে, মক্কেলের স্বার্থটাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেন আপনারা। মক্কেলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল বা অন্যায় ফায়দা আদায় করেন না। আর সব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারেও এই কথা বলতে পারলে খুশি হতাম। আপনারা রাশিয়াসহ বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশের অনেক কাজই করে দেন, এ-কথা জানার পরও আমরা টপ-সিক্রেট কাজে আপনাদের সাহায্য নিয়ে থাকি—এ-থেকেই কি আপনাদের ওপর আমাদের আস্থা প্রমাণ হয় না?' গ্লাসে চুমুক দেয়ার জন্যে থামল সে। আশেপাশের টেবিলগুলো একটু দূরে হলেও, ওগুলোয় যারা বসে আছে তাদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ল আশরাফ। সি.আই.এ.-এর শাখাপ্রধানকে তার সমস্যাটা বোঝানো কঠিন হবে।

'তাছাড়া,' আবার বলল ওয়াট, 'গত দু'বছরে আমার যে ক'টা কাজ হাতে নিয়েছেন, তার কোনটাতেই ব্যর্থ হননি আপনারা। আমার মন বলছে, ছোট দেখাচ্ছে বটে, আসলে এটা বড় কাজ। আমি চাই, কাজটা আপনারা নিন। লোকজন নেই, এটা কোন সমস্যা হতে পারে না। আর কেউ না থাক, আপনি তো

এখনও রয়েছেন।'

'কিন্তু সাড়ে এগারোটায় আমার ফ্লাইট···'

'কাজটা আপনাকে ধরতে হবে এগারোটায়,' উৎসাহের সাথে বলল ওয়াট। 'আমার ধারণা যদি ভুল হয়, এর মধ্যে যদি কোন বড় ব্যাপার লুকিয়ে না থাকে, মেয়েটার সাথে কথা শেষ করেও আপনি ফ্লাইট ধরার যথেষ্ট সময় পাবেন। এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোনে রিপোর্ট করবেন আমাকে, তাহলেই চলবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে হাসল আশরাফ। 'আপনি শুধু শুধু আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন, মি. ওয়াট। হাতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে কোন কাজ ধরা যায় না, সেটা আপনিও বোঝেন।'

'এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম,' বলল ওয়াট। 'কাজটা কি, শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন।' এরপর, আশরাফ বাধা দেবার আগেই গড় গড় করে কিভাবে কাজটা তৈরি হলো, প্রকৃতিটা কি রকম, সব বলে গেল সে। সবশেষে বলল, 'এর ভেতর গভীর তাৎপর্য থাকতে পারে, আবার গোটা ব্যাপারটাই ভুয়া বা ঠাট্টাও হতে পারে। মেয়েটা যা বিক্রি করতে চাইছে সেটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিনা না জানা পর্যন্ত আমি এটাকে আনঅফিশিয়াল রাখতে চাই।'

চুপ করে থাকল আশরাফ। কি যেন ভাবছে।

'প্লীজ, মি. চৌধুরী! কাজটা করে দিলে আমি ভাবব আপনি আমার একটা উপকার করলেন। আমি কিন্তু আপনাদের ফি অ্যাডভান্স করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছি···'

রানা ইনভেস্টিগেশনের ন্যূনতম ফি পাঁচশো ডলার। প্রতিষ্ঠানের চীফ, মাসুদ রানার কথা ভাবছিল আশরাফ। ছুটি নিয়ে ইউরোপে রয়েছে মাসুদ ভাই, এই প্যারিসেই। তাকে কাজে লাগানো যায় না? এত অনুরোধ-উপরোধ করার পর ওয়াটকে যদি নিরাশ করা হয়, লোকটা খুব খারাপভাবে নেবে ব্যাপারটাকে—ব্যবসার জন্যে সেটা শুভ নয়। কিন্তু তার নিজেরও কিছু করার নেই, নিসের কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, না গেলেই নয়। চীফের পরামর্শ নিলে কেমন হয়? এই পরিস্থিতিতে মাসুদ ভাইও হয়তো কোন সাহায্য করতে পারবে না ওয়াটকে, কিন্তু সমস্যাটা তাকে বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারবে নিশ্চয়ই।

'মাফ করবেন,' বলে উঠে দাঁড়াল আশরাফ। 'একটা ফোন করে দেখি।' বারের আরেক প্রান্তে চলে এল সে, টেলিফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করল রানা এজেন্সির একটা বিশেষ নাম্বারে। ডাইরেক্টরিতে পাওয়া যাবে না এ নাম্বার।

ছোট একটা দোতলা বাড়ি, নিচের তলায় অফিস। ওপরতলায় ঘর মাত্র দুটো, শুধু রানা বা তার অনুমোদিত কেউ প্যারিসে এলে সেগুলোর তালা খোলা হয়। সাইড রোডের সাথে একটা গেট আছে, দোতলায় ওঠার জন্যে সেটাই ব্যবহার করা হয়। অফিস বন্ধ, দোতলার নাম্বারে ফোন করছে আশরাফ। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে দেখল, সন্ধে আটটা। এই সময় মাসুদ ভাইকে বাড়িতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

সত্যিই বাড়িতে নেই, তবে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানা গেল টেপ রেকর্ডারের কাছ থেকে। এবার হোটেল রোজ গার্ডেনের রিসেপশনে ফোন করল

আশরাফ। এক মিনিট পর অপরপ্রান্তে এল রানা। 'হ্যালো?' একটু যেন অস্থির মনে হলো তাকে।

'আমি আশরাফ, মাসুদ ভাই। হঠাৎ একটা সমস্যায় পড়ে…'

'কি সমস্যা?'

'মার্কিন দূতাবাসের সীন ওয়াট, একটা কাজ করে দেবার জন্যে ধরেছে…'

বাকিটা শুনতে চাইল না রানা, বলল, 'ধরেছে, করে দাও।'

'কিন্তু মাসুদ ভাই, আমি তো সাড়ে এগারোটার ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি,' বলল আশরাফ। 'এই মুহূর্তে একজনও নেই যাকে বুঝিয়ে দিতে পারি দায়িত্বটা। অথচ ওয়াটের কাজটা আজ…'

'দেখো, আশরাফ,' রানার কণ্ঠটা প্রায় অনুরোধের মত শোনাল, 'দারুণ একটা মেয়ের সাথে ডিনার খাচ্ছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কত সুন্দর। এই সময়ে সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারছি না, কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায়। আমি বলি কি, শোনো, নিয়ে নাও কাজটা, করার একটা উপায় বেরিয়েই যাবে।'

'কিন্তু…'

'আবার কিন্তু! এই ছেলে,' অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল রানা, 'টাকার দরকার নেই আমাদের?'

'আছে, কিন্তু…'

'তাহলে আর কেউ ছিনিয়ে নেবার আগেই ছুঁচোটার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি আদায় করো কাজটা।'

'আপনি বলছেন?'

'একশো বার!'

'তাহলে কিন্তু আপনাকেই, মানে আর কেউ তো নেই…'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন,' ব্যস্ত সুরে বলল রানা। 'তোমার সমস্যা মিটেছে তো? এবার ছাড়তে পারি?'

ছোট্ট করে জবাব দিল আশরাফ, 'জ্বী।'

যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রেখে দু'সেকেন্ড সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল আশরাফ, তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ওয়াট, ওকে দেখে চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কোন ব্যবস্থা হলো, মি. চৌধুরী?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল আশরাফ, তারপর বলল, 'কিন্তু মিনিমাম ফি-তে কাজ হবে না। দামী লোকে করবে কাজটা, ডবল দিতে হবে।' সে জানে, হাড়-কিপটে লোক এই ওয়াট, কিন্তু এ-ও জানে, মাসুদ ভাইয়ের ডবল পাওয়া উচিত।

'মেয়েটার সাথে দেখা করে জানতে হবে কি বিক্রি করতে চায় সে, কাজ বলতে তো এইটুকু,' খানিক ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াট। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'তারপর কাজটা যদি গুরুত্ব পায়, অথবা ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন লোকের ফি কত হবে তা নিয়ে আবার কথা বলব আমরা, তাই তো?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো ওয়াট।

'আপনি যেভাবে মি. জেমস ক্লিফের কাজে নাক গলাচ্ছেন,' বলল আশরাফ, 'আপনাকে বিপদে ফেলার জন্যে এটা তার একটা ফাঁদ কিনা, কে বলবে! যেসব রিপোর্ট তার হাতে যাবার কথা, সেগুলো ডিল করছেন আপনি। এই মেয়েটাকে তিনিই হয়তো আপনার পেছনে লাগিয়েছেন। আপনি নিয়ম মানছেন না, এটা প্রমাণ করা সম্ভব হলে আপনাকে দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে পানির মত সহজ হয়ে যাবে।'

এই সম্ভাবনা ওয়াটের মনেও উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু ধারণাটাকে সাথে সাথে বাতিল করে দিয়েছে সে। জেমস ক্লিফ তার পদমর্যাদার আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে, তাকে ফাঁদে ফেলা তো দূরের কথা, তার কথা চিন্তা করারও অবসর নেই লোকটার। ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে, বলল, 'মি. ক্লিফ এসব নিয়ে মাথা ঘামান না বলেই তো আমাকে নাক গলাতে হয়।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর কাজের প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'আমি অ্যাকশন চাই, মি. চৌধুরী। জিনিসটা যদি দামী হয়, আরও অনেককে আকার করবে মেয়েটা।'

মনে মনে হাসল আশরাফ। জানে, বাণিয়ান জুজুর ভয়ে সদাই তটস্থ থাকে ওয়াট। 'অ্যাকশন যদি দরকার হয়, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাবেন আপনি, মি. ওয়াট।'

পকেট থেকে একটা চেক বই আর কলম বের করল ওয়াট। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নামে এক হাজার ডলারের একটা চেক লিখল সে। বই থেকে ছিঁড়ে পাতাটা বাড়িয়ে দিল আশরাফের দিকে। জানতে চাইল, 'কে করছে কাজটা?'

'তা আপনার না জানলেও চলবে,' বলল আশরাফ। 'মেয়েটার সাথে কথা শেষ করে আমাদের লোক টেলিফোন করবে আপনাকে।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না ওয়াট, একটা কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর ইঙ্গিতে ওয়েটারকে ডেকে মিটিয়ে দিল বিল। দু'জন একসাথে বেরিয়ে এল রু বসি দ'অ্যাংলে-তে। আবার কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে আশরাফের সাথে করমর্দন করল ওয়াট, বিড় বিড় করে বলল, 'গুডলাক।'

রাস্তা পেরিয়ে মার্কিন দূতাবাসের দিকে এগোল সে। তার গমনপথের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ডানদিকে ঘুরল আশরাফ, ধীরপায়ে এগোল নিজের পথে। ভাল একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে রাতের খাবারটা সেরে নিতে হবে, তারপর ফোন করবে চীফকে।

মোড়ে পৌঁছে ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হবার অপেক্ষায় দাঁড়াল আশরাফ। এপ্রিলের বাতাস গরম নয়, একটু শীত শীতই করছে। রাস্তা পেরিয়ে প্লেস ভেনদোমে চলে এল সে। খানিক এগিয়ে এসে দেখল, সামনে লিউ হোটেল। পাশের একটা দরজা দিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। হেড ওয়েটার পরিচিত, কোণের একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল ওকে। ডিনারের অর্ডার দিল সে।

ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ করল আশরাফ। কফির অর্ডার দিয়ে হাতঘড়ি দেখল। পৌনে ন'টা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, সোজা গিয়ে ঢুকল টেলিফোন বুদে। চোখ

বুজে ভাবল, এখন রোজ গার্ডেনে রিঙ করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই সুন্দরী মেয়েটাকে বিদায় করে ফিরে গেছে মাসুদ ভাই। অফিসের ওপরতলার নাম্বারে ডায়াল করতে করতে ভাবল: কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে যদি প্যারির নিশিথ দেখতে বেরিয়ে থাকে তাহলে…

অপর প্রান্তে রিঙ হচ্ছে, কিন্তু রিসিভার তুলছে না কেউ। মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আশরাফ, মাসুদ ভাইকে এখন পাওয়া না গেলে কি উপায় হবে! এক দুই করে চার বার রিঙ হলো। কি করবে ভাবছে, এই সময় অপর প্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। 'হ্যালো?'

কণ্ঠস্বরটা আগের মতই বাষ্প আর অস্থির শোনাল আশরাফের কানে। 'মাসুদ ভাই, আমি আশরাফ।'

'আবার কি হলো?'

'কাজটা নিয়েছি…'

'ভেরি গুড! করে ফেলো।'

'আমি কি করে করব! আমি তো নিস চলে যাচ্ছি। এখুনি চলে আসব আপনার ওখানে?'

প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'কেন? এখানে আসার কি দরকার পড়ল?'

'ফ্লাইট ধরতে হলে গোছগাছ করতে হবে না আমাকে?' বলল আশরাফ। 'এখুনি ব্রিফ না করলে আমি তো আর সময় পাব না!'

'কিসের সময় পাবে না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'কাজটা কি, কোথায় যেতে হবে, জানতে হবে না আপনার?'

'সে কি!' শব্দটা যেন বোমার মত বিস্ফোরিত হলো আশরাফের কানে। এরপর রানার তরফ থেকে পাঁচ সেকেন্ড আর কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর অত্যন্ত শান্ত, ধীর এবং গম্ভীর সুরে জানতে চাইল ও, 'তুমি কি আমাকে দিয়ে করাবে বলে কাজটা হাতে নিয়েছ, আশরাফ?'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আপনি নিজেই তো বললেন…'

'বলেছিলাম বুঝি?' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'তুমি যখন সাক্ষী দিচ্ছ, নিশ্চয়ই বলেছিলাম। তা, কি করতে হবে আমাকে বলে ফেলো।'

'টেলিফোনে বলা উচিত হবে না, মাসুদ ভাই,' বলল আশরাফ। 'আপনার ওখানে চলে আসি, নয়তো কোন জায়গার নাম বলুন, যেখানে আপনার সাথে দেখা করতে পারি।' এতক্ষণে কিছুটা আঁচ করে নিয়েছে আশরাফ, মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'তোমার সাথে ঘণ্টা দুয়েক পর দেখা করলে হয় না, আশরাফ?'

দুই কানে গিয়ে ঠেকল আশরাফের হাসি। অনেক কষ্টে হাসি সামলে নিয়ে বলল, 'উঁহুঁ, হয় না। সময় একেবারেই নেই। প্রায় ন'টা বাজে, মাসুদ ভাই, কাজটা এগারোটায়…'

'মাই গড! আজই রাত এগারোটায়? তাহলে তো এখুনি সব জেনে নিতে হয়!'

'জী।'

খুক করে একবার কাশল রানা, তারপর অনেকটা আপনমনে বলল, 'সেরেছে! কি করে যে বিদায় করি! আচ্ছা আশরাফ, আমাকে না জড়িয়ে কোনভাবেই কাজটা ম্যানিজ করতে পারো না?'

'আমি তো তখনই বলেছিলাম…'

'হুঁ,' বলল রানা। 'ঠিক আছে। আমি আসছি। ওডিওঁ মেট্রোর মুখে পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগবে আমার।'

বুদ থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এল আশরাফ। কফির কাপ তুলে চুমুক দেবার সময় চারদিকে তাকাল। রেস্তোরাঁয় দু'তিনটে দম্পতি রয়েছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত তারা। নিঃসঙ্গ এক যুবকের ওপর চোখ পড়ল। দৈনিক ফ্রাঁসে সোয়া পড়ছে। টেবিলের ওপর তার সামনে কফির কাপ। এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল আশরাফ, কিন্তু যুবকের সমস্ত খুঁটিনাটি মনের পর্দায় গেঁথে নিয়েছে সে। বছর কুড়ি বয়স হবে যুবকের। হালকা একটা ওভারকোট পরে আছে, কোমরের কাছে বেল্ট। ছোট করে ছাঁটা চুলের রঙ কালো, থুতনিতে সামান্য দাড়ি থাকায় বয়স যেন আরও কমে গেছে। যুবকের চোখের নিচে কালি পড়েছে, চেহারায় রুক্ষভাব। এইরকম একটা অভিজাত রেস্তোরাঁয় তাকে ঠিক যেন মানাচ্ছে না। সতর্ক হয়ে উঠল আশরাফ।

অর্ধেক কফি শেষ করে বিল দেবার জন্যে হেড ওয়েটারকে ডাকল সে। 'তোমার বাঁদিকে, ওভারকোট পরা লোকটা, কতক্ষণ ধরে আছে এখানে, জানো?'

'আপনার ঠিক পরপরই এসেছে, সিনর,' বলল হেড ওয়েটার।

বিল মিটিয়ে দিয়ে হেড ওয়েটারের সাথে হ্যান্ডশেক করল আশরাফ, বিদায় নিয়ে চলে এল লবিতে। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে সদর দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এল হোটেলের বাইরে। ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল লাল বাতির, তারপর রাস্তা পেরিয়ে এগোল প্যালেস রয়্যাল মেট্রো-র দিকে। পরবর্তী ক্রসিঙে আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তাকে। এই সুযোগে পকেট থেকে খুদে একটা আয়না বের করল সে। মস্ত থাবায় আয়নার অর্ধেকটা লুকিয়ে রেখে, বাকি অর্ধেকটায় পিছনের দৃশ্য দেখতে পেল। হোটেল লিউয়ের যুবক পিছু নিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। একটা লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

আয়নাটা পকেটে ভরে রাখল আশরাফ। কপালে চিন্তার রেখা। ওয়াট বলল, কেসটা ভুয়া বা ঠাট্টাও হতে পারে। আবার এ-কথাও বলেছে, মেয়েটা আরও অনেককে অফার দিতে পারে। এই ছাগল-দাড়ি যুবক হয়তো কিছু না, কিন্তু একে না খসাবার ঝুঁকিও নেয়া যায় না। রাস্তা পেরিয়ে মেট্রোর ধাপ টপকে নিচে নামল সে, টিকেট কিনে ধীর পায়ে এগোল নেশন লাইনের দিকে। ওডিওঁ-তে পৌঁছুতে হলে শ্যাটেলে ট্রেন বদল করতে হবে তাকে।

ট্রেন এল দু'মিনিট পর। ট্রেনে চড়ল আশরাফ, প্ল্যাটফর্মে তাকাবার ঝোঁকটা অতি কষ্টে চেপে রাখল। শ্যাটেলে পৌঁছল ট্রেন। দরজা বন্ধ হতে শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর বিশাল শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যবহার করে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, স্টেশন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন।

পাশের বগীর একটা কম্পার্টমেন্টে রয়েছে ছাগল-দাড়ি যুবক। মুহূর্তের জন্যে তাকে জানালায় দেখতে পেল আশরাফ। ঠোঁট গোল করে তার উদ্দেশে শিস দিল সে, একটা হাত তুলে নাড়ল। 'যাও বাবা, ট্রেন জার্নির ওপর রচনা লেখার মাল-মশলা জোগাড় করো।'

অন্য সুন্দরী বললে মেয়েটার ওপর অবিচার করা হয়। সৃষ্টিকর্তা অবসর সময়ে অথবা [illegible] নিয়ে মনের আনন্দে শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যেন গড়েছেন তাকে—অন্তত রানার তাই মনে হয়েছে। চোখ, নাক, ঠোঁট, কপাল কোথাও কোন খুঁত নেই। বেদানার মত গায়ের রঙ, লম্বায় পাঁচ ফিট দুই। আঠারো থেকে বিশের মধ্যে বয়স। উজ্জ্বল কলাপাতা রঙের একটা সোয়েটার আর উল দিয়ে তৈরি কালো ট্রাউজার পরেছে সে, দুটোই শরীরের সাথে সেঁটে আছে। মুখের আকৃতি অনেকটা ডিমের মত, চোখ দুটো গভীর নীল।

আজই সন্ধ্যায় পরিচয় হয়েছে মেয়েটার সাথে এক পার্টিতে। লুনা। আমেরিকান। বেড়াতে এসেছে প্যারিসে। দু'চার কথাতেই জমে গেল ভাব। দেখা গেল, দু'জন দু'জনের কথায় প্রচুর মজা পাচ্ছে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই দেখা গেল, একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজছে দু'জনে—পার্টির হৈ-চৈ আর ভাল লাগছে না।

ঠিক এমনি সময়ে ডিনারের প্রস্তাব দিল রানা। খুশি হয়ে উঠল লুনা। বেরিয়ে পড়ল ওরা হোটেল রোজ গার্ডেনের উদ্দেশে। ওখানেই খাওয়া ও ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয়ের মাঝামাঝি ডিসটার্ব করেছে আশরাফের ফোন।

তারপর অনেক হাসি, অনেক গল্পে মেয়েটাকে পটিয়ে নিয়ে এসেছে ও বাসায়। কফি বানিয়ে খেয়ে টার্ন টেবলে মাইকেল জ্যাকসনের লেটেস্ট রেকর্ডটা চাপিয়ে সবে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়েছে—এমনি সময়ে আবার বেরসিকের মত বেজে উঠল ফোন। আনমনে বসার ঘর থেকে শোবার ঘরে চলে এসেছে ওরা, সব কিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে এমনি সময়ে ফোনটা···ইশ্‌, জ্বালাতন! ইচ্ছে করেই ওটাকে বারকয়েক বাজতে দিল ও, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে এল বেডরূম থেকে।

ফিরল কয়েক মিনিট পর। দেখল, পিঠে কয়েকটা বালিশ দিয়ে বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে লুনা, হাত দুটো মাথার পিছনে। এমন একটা ভঙ্গি, চোখ ফেরানো যায় না, লাফ দিয়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় কলজেটা।

'তোমার সম্পর্কে বলো, রানা।'

'শোনো, লুনা—আমি দুঃখিত,' বলল রানা, 'আমাকে বেরুতে হচ্ছে। হঠাৎ একটা কাজ বেধে গেল, না গেলেই নয়। কখন ফিরব বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? এখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসল লুনা। কিন্তু হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

'এখানে তোমার একা সময় কাটাতে একটুও খারাপ লাগবে না,' বলল রানা। 'টিভি আছে, বই আছে, প্রচুর রেকর্ড আছে। ফিরে এসে যদি দেখি তুমি আছ, আমি খুব খুশি হব।'

'তুমি চলে যাবে, অথচ আমি থাকব, সেটা কি উচিত হবে?' বলল বটে, কিন্তু বিছানা থেকে নামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না লুনার মধ্যে। তাকিয়ে আছে রানার

মুখের দিকে।

'কেন উচিত হবে না? থাকো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব, কথা দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছ, অন্তত তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আছি আমি। কিন্তু রাত কাটাব এখানে, সে কথা আমি দিচ্ছি না।'

বাথরূমে ঢুকল রানা, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। শাওয়ারের ডান দিকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা একটা দেয়াল আলমারি। সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল, কৌশলে লুকানো একটা স্প্রিঙে চাপ দিতেই আলমারির পেছনের দেয়ালটা সরে গেল একপাশে। হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে নিয়ে এল হোলস্টারসহ একটা ছোট, চ্যাপ্টা অ্যামোনিয়া গান। জ্যাকেট খুলে হোলস্টারটা পরল ও, তারপর আবার গায়ে চড়াল জ্যাকেট। সেটা কোথাও ফুলে আছে কিনা দেখে নিল আয়নায় ঘুরেফিরে।

কিন্তু আওয়াজ করা দরকার, ফ্লাশ টানল, বেসিনের কল খুলে মুখ ধুলো। তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ মুছে চিরুনি চালাল মাথায়। তারপর বেরিয়ে এল বেডরূমে।

বুক কেসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লুনা। পায়ের আওয়াজ শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল, বলল, 'তোমার সাথে রুচির অনেক মিল আছে আমার। আমার শেলফও এদেরই সব বইয়ে ঠাসা।'

রানা হাত বাড়াতেই সেটা ধরে উঠে দাঁড়াল লুনা, ধরা দিল ওর বাহুর বন্ধনে। আগ্রহের সাথে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিল রানার চুম্বনে। তারপর হঠাৎ দু'হাতে ওর বুকে ধাক্কা দিয়ে সরে গেল দূরে।

'আমি তোমার সাথে তোমার ঘরে চলে এসেছি, রানা, তাই বলে আমাকে সস্তা মনে কোরো না কিন্তু। যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে আসতে চেষ্টা করো। মনে রেখো, অপেক্ষা করছি আমি। তুমি আমার মনে সত্যিই আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। ভাল কথা, কোথায় যাচ্ছ তুমি, জানতে পারি?'

'আমি নিজেই জানি না। একজনের সাথে দেখা করে জানতে হবে কোথায় যেতে হবে। টেলিফোন বাজলে সাড়া দেবার দরকার নেই। টেবিলের দেরাজে চাবি আছে, দরজায় তালা দিয়ে রাখো। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। রিফ্রিজারেটর ভর্তি আছে, খিদে পেলে যা খুশি খেয়ে নিয়ো।'

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ও।

দরজা বন্ধ করে সেখানেই অনড় দাঁড়িয়ে থাকল লুনা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে রানা, ওর পায়ের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। শব্দটা মিলিয়ে গেল। তারপর নিচ থেকে ভেসে এল গাড়ির দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। স্টার্ট নিল গাড়ি। বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

দেরাজ থেকে চাবি বের করে দরজায় তালা দিল লুনা। কান পেতে থাকল কিছুক্ষণ, কিন্তু কোন শব্দ পেল না। তারপর অত্যন্ত ধৈর্য আর একাগ্রতার সাথে সার্চ শুরু করল কামরাটা।

দুই

ওডিওঁ মেট্রোর প্রবেশ মুখে অপেক্ষা করছিল আশরাফ, তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে রানার পাশের সীটে উঠে বসল সে।

'একটু দেরি হয়ে গেল,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'কাজটা কি?'

'একটু অদ্ভুত ধরনের,' বলল আশরাফ। 'গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, আবার স্রেফ ধাপ্পা হওয়াও বিচিত্র নয়। বরাবরের মত আগেই ফি দিয়েছে ওয়াট। একটু বেশি আদায় করেছি, এক হাজার।' পকেটে হাত ভরল সে।

'তোমার কাছেই থাক।'

'কিন্তু আমি তো চলে যাচ্ছি…

'ফিরে এসে জমা দিয়ো ব্যাংকে,' বলল রানা। একটা চোখ পড়ে রয়েছে ড্রাইভিং মিররের ওপর। সেই ওডিওঁ মেট্রো থেকে পিছু নিয়েছে কালো একটা সিট্রন। হ্যাটটা সামনে টেনে নামিয়ে মুখের অনেকটা ঢেকে রেখেছে ড্রাইভার, ড্রাইভিং হুইলের পিছনে আড়াল নিয়েছে বাকিটুকু।

হঠাৎ করে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল রানা, গলিটা নির্জন দেখে বাড়িয়ে দিল স্পীড। সিট্রনও ঠিক তাই করল। কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল আশরাফ, রানা বলল, 'ফেউ লেগেছে।'

ঝট করে পিছন দিকে তাকাল আশরাফ।

'আমার ভুলও হতে পারে,' বলল রানা। 'দেখা যাক খসানো যায় কিনা।'

বড় রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওয়ান-ওয়েতে পড়ল টয়োটা। পার্ক করা গাড়িগুলো রাস্তাটাকে সরু করে রেখেছে। বাঁ দিকে বাঁক নিল রানা, কিন্তু তারপরই ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ি দাঁড় করাতে বাধ্য হলো।

গুটিগুটি এগিয়ে এসে টয়োটার দশ ফিট পিছনে থামল কালো সিট্রন।

'পেছনে তাকিয়ো না,' ভিউ মিররে চোখ রেখে বলল রানা। 'এখনও লেগে আছে।' সবুজ আলো দেখে গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

'গাড়ি দাঁড় করান, মাসুদ ভাই,' বলল আশরাফ। 'ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিই।'

'শিক্ষা যদি দিতেই হয়, পরে,' বলল রানা। 'আগে তোমার কথা শোনা হোক আমার।' পন্ট সালি পেরিয়ে বাঁক নিল টয়োটা, পড়ল কোয়াই দু'আনজু-তে। কোয়াই-এর অর্ধেক পেরিয়ে এসেছে, এই সময় আবার পিছনে দেখা গেল সিট্রনকে। সামনে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা একসার গাড়ি থেকে স্যাৎ করে বেরিয়ে এল সাদা একটা মরিস। দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, সদ্য খালি হওয়া জায়গাটা পূরণ করল টয়োটা। 'এখন দেখা যাক, কি করে ও।'

হঠাৎ করে স্পীড বাড়িয়ে দিল সিট্রনের ড্রাইভার, ওদের দিকে একবারও না

তাকিয়ে রাস্তা ধরে সোজা চলে গেল। কোয়াই-এর শেষ মাথায় পৌঁছে ডানদিক বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আপাতত খসানো গেছে,' স্টার্ট বন্ধ করে বলল রানা। 'ব্যাপারটা কি, আশরাফ? ও তোমার পিছু নেয়ার সুযোগ পেল কিভাবে? তোমাকে ফলো করছিল ও, আমাকে নয়।'

উদ্বিগ্ন দেখাল আশরাফকে। 'এক ছোকরা পিছু নিয়েছিল, থুতনির কাছে একটু দাড়ি আছে, ট্রেনে উঠে তাকে খসাতে কোন অসুবিধে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে সংখ্যায় ওরা হয়তো দু'জন ছিল।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল রানার। 'তাই তো থাকার কথা,' বলল ও। 'একজন সামনে, অপরজন পেছনে।'

'কিন্তু আমি যখন ট্রেনে উঠলাম, সিট্রন নিশ্চয়ই সামনে ছিল না!'

'তা ছিল না। কিন্তু একজন লোক ছিল। সে-ও ট্রেনে চড়ে। পিছনের লোকটাকে তুমি খসাতে পারলেও তাকে পারোনি। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছ দেখতে পেয়ে এই সিট্রনের ড্রাইভারকে ফোন করে সে।' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কাজটা কি?'

'আজ সকালে এক মহিলা টেলিফোন করে ওয়াটকে,' শুরু করল আশরাফ। 'মহিলা নিজের পরিচয় দেয় মাদাম স্যানডোরা বলে। ওয়াটকে সে জানায়, বিক্রি করার জন্যে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আছে। ওয়াটের ধারণা, এটা ধাপ্পাও হতে পারে, আবার সত্যিও হতে পারে। মেয়েটা তাকে আভাস দেয়, তার এই প্রস্তাব আরও অনেককে দিতে পারে সে। ওয়াট চাইছে, মেয়েটার সাথে যোগাযোগ করে আমরা জানি সত্যি তার কাছে বিক্রি করার মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে কিনা। তেমন হলে, দরদাম করতে পারব আমরা।'

'মেয়েটা কোথায়?'

'সুইট প্যারিসে এগারোটায় থাকবে বলে জানিয়েছে,' বলল আশরাফ।

'আর কিছু?'

মাথা নাড়ল আশরাফ। 'আর কিছু জানা যায়নি। বোঝাই যাচ্ছে, সহজ একটা কাজ...'

'না,' আশরাফকে বাধা দিয়ে শান্ত গলায় বলল রানা। 'যতটা সহজ ভাবছ ততটা সহজ নয়। মেয়েটা আরও কারও সাথে কথা বলেছে, তারাও এরই মধ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে ধরা পড়ে গেছ তুমি, এখন আমিও ধরা পড়ে গেলাম। ওদেরকে এখন শুধু আমার গাড়ির নাম্বার চেক করতে হবে, তাহলেই ওরা জানতে পারবে আমি কে, কি করি, কোথায় আছি।' এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর গম্ভীর সুরে আবার বলল ও, 'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, আশরাফ। এটা এসপিওনাজ। এখানে সামান্য ভুল হওয়ার মানে নিজের কবর খোঁড়া। বিপদ দেখে সেটাকে যদি চিনতে না পারো...', কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

ম্লান সুরে বলল আশরাফ। 'ভুল হয়েছে, সেটা এখন বুঝতে পারছি আমি, মাসুদ ভাই। এখন থেকে আরও সাবধান হব।'

'গুড,' নরম সুরে বলল রানা। 'ওয়াট কোথায় থাকবে?'

'বাড়িতে কিংবা অফিসে, যে-কোন এক জায়গায় পাওয়া যাবে তাকে।'

'তুমি?'

'বাড়ি থেকে সাড়ে দশটার দিকে বেরুব আমি, এয়ারপোর্টে পৌঁছুব পৌনে এগারোটায়,' বলল আশরাফ। ছোট একটা দু'কামরার অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে অফিসের আরও দু'জনের সাথে থাকে সে। সঙ্গীরা প্যারিসের বাইরে থাকায় ফ্ল্যাট এখন খালি থাকবে। 'আমার ফ্লাইট সাড়ে এগারোটায়।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'তোমার ফ্লাইট বাতিল করতে হতে পারে, তবে এখুনি বাতিল করতে বলছি না। সোজা বাড়ি ফিরে যাও, এগারোটা দশ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। হয় আমি আসব, না হয় ফোন করব।'

মনে মনে একটু অসন্তুষ্টই হলো আশরাফ—শুধু শুধু বিপদের ভয় করছে মাসুদ ভাই। মুখে বলল, 'ঠিক আছে।'

হিলটন হোটেলের বারে, একটা অ্যালকোভে বসে আছে কার্ল হফার। চৌকো, মোটাসোটা লোক, ঘন আর চওড়া ভুরুতে চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মুখের সাথে মানানসই বড় নাক, খাড়া। পরনে দামী স্যুট, বাটনহোলে রক্তলাল গোলাপ। বয়স পঁয়ষট্টি, কিন্তু দেখে মনে হয় অনেক কম। চেহারাতেই লেখা রয়েছে—কোটিপতি এবং অমানুষ। ছোট ছোট, মোটা আঙুলের ফাঁকে দামী চুরুট, মাঝে মধ্যে হাত তুলে চুমো খাচ্ছে চুরুটের পিছন দিকে। এই কুলুঙ্গিতে আধ ঘণ্টা হলো বসে আছে সে, নিষ্ঠুর চেহারায় চিন্তার ছাপ।

হিলটনের সবাই তাকে ভাল করে চেনে, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনীদের একজন সে। অক্টোপাসের বাহুর মত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ। আপাতত হিলটনকেই সে তার আস্তানা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

ধীর, নিঃশব্দ পায়ে বারে ঢুকল এক যুবক। হালকা একটা ওভারকোট পরে আছে সে, কোমরের কাছে বেল্ট জড়ানো। থুতনিতে সামান্য একটু দাড়ি। অ্যালকোভে ঢুকল সে, তারপর কার্ল হফারের কাছ থেকে ইশারা পেয়ে জড়োসড়ো ভঙ্গিতে বসল পাশের চেয়ারে।

যুবকের নাম নিগেল চ্যাপম্যান। ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল সে।

'ওয়াটের সাথে একজন লোক দেখা করেছে, নাম আশরাফ চৌধুরী। রানা ইনভেস্টিগেশন নামে একটা ফার্ম…'

'জানি,' ভারী গলা কার্ল হফারের, কিন্তু কর্কশ নয়। 'তারপর?'

'বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে আশরাফকে দিল ওয়াট, চেক হতে পারে, স্যার,' বলল চ্যাপম্যান। 'তার আগে বুদে ঢুকে একটা ফোন করে আশরাফ।'

'কাকে, জানতে পেরেছ?'

'না, স্যার। খানিক পর ওরা দু'জনেই মেট্রোপোল বার থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু দু'জন চলে যায় দু'দিকে।'

'আশরাফ কোথায় গেল?'

‘পায়ে হেঁটে লিউ হোটেলে আসে সে,’ বলল চ্যাপম্যান। ‘ওখানে ডিনার খায়। তারপর আবার কাকে যেন ফোন করে। হেড ওয়েটারের সাথে কথা বলে, তারপর বেরিয়ে আসে লিউ থেকে। আমার সাথে ফচেট ছিল। আশরাফ লিউ থেকে বেরিয়ে এলে তার সামনে ছিল সে। আমি ছিলাম পেছনে।’

নিজ হাতের কোদাল আকৃতির নখ পরীক্ষা করছে কার্ল হফার। ‘তোমাকে খসিয়ে দেয় ও।’

‘জ্বী,’ একটা ঢোক গিলে বলল চ্যাপম্যান। ‘ট্রেনে উঠে একটা কৌশল করে সে, শ্যাটেলে পৌঁছে শেষ মুহূর্তে নেমে যায় ট্রেন থেকে। কিন্তু ফচেট ছিল প্ল্যাটফর্মেই, লেগে থাকে পেছনে। এইমাত্র তার টেলিফোন পেয়েছি, ওডিওঁ মেট্রোর সামনে টয়োটা নিয়ে একজন লোক দেখা করেছে আশরাফের সাথে। এই লোকটাও বাংলাদেশী হতে পারে, কিন্তু তার পরিচয় এখনও আমরা জানতে পারিনি। টয়োটার নাম্বার জানা আছে, চেক করে দেখছে ফচেট। গাড়ি নিয়ে এখানে ফিরতে বলেছি ওকে।’

হাত ঘুরিয়ে তালুর রেখা পরীক্ষা করতে শুরু করল কার্ল হফার। পাঁচ সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর শান্ত গলায় বলল, ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠেকাতে হবে ওদেরকে। ওয়াটের সাথে কি কথা হয়েছে, আশরাফের কাছ থেকে জেনে নাও। জানতে গিয়ে ওর নাম যদি খরচের খাতায় উঠে যায়, আমার কিছু আসে যায় না।’

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল চ্যাপম্যান।

‘এখানেই আছি আমি,’ মুখ না তুলে বলল কার্ল হফার। ‘তাড়াতাড়ি সারবে।’ অ্যালকোভ থেকে চ্যাপম্যান বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে হাত বাড়িয়ে স্কচ-হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিল সে।

অ্যাভিনিউয়ে বেরিয়ে এসে কালো সিট্রনের সামনের সীটে, ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল চ্যাপমান। ড্রাইভার লোকটা লম্বা নয়, কিন্তু চওড়ায় খুব বেশি। গোল মুখ, চোখ দুটো ছোট ছোট, তার বয়সী তিনজন লোককে সে একাই পিটিয়ে লাশ করতে পারে। ঘাড় ফিরিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চ্যাপম্যানের দিকে তাকাল সে।

পিছনের সীটে আরও একজন রয়েছে। এই লোকটা লম্বা, রোগা, রোদে-পোড়া চেহারা। লোকটার কপাল আর মাথা বড়, মুখটা ক্রমশ সরু হয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে। চেহারাটা নির্লিপ্ত। বসার ভঙ্গিতে আশ্চর্য একটা অনড়, স্থির ভাব আছে—শুধু এই ভঙ্গিটাই মানুষের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

‘বস্ বলেছেন, আশরাফের সাথে কথা বলতে হবে,’ বলল চ্যাপম্যান। ‘ওকে আমরা রু ক্যাস্টিলিয়ঁ-তে পাব।’

ড্রাইভার ফচেট ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে স্টার্ট দিল গাড়িতে। যানবাহনের ভিড়ে জায়গা করে নিল সিট্রন, ছুটে চলল রু ক্যাস্টিলিয়ঁ-র দিকে। পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগল ওদের।

চ্যাপম্যান আর জ্যাসন গাড়ি থেকে নামল। পার্ক করার জায়গার খোঁজে সিট্রন নিয়ে সরে গেল ফচেট।

‘ফচেটকে ছাড়াই পারব আমরা,’ বলল চ্যাপম্যান।

'আমরা মানে আমি!' সরু বাঁশ আকৃতির গলা থেকে এই রকম কর্কশ, ভারী, দানবের সুর বেরিয়ে আসতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন।

ঝট করে জ্যাসনের দিকে ফিরল চ্যাপম্যান। লোকটা ওকে ঘৃণা করে, জানে ও। বস্ ওর ওপর ভরসা করছেন, সেটা সম্ভবত সহ্য হচ্ছে না জ্যাসনের। ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তায় আছে ও। জ্যাসনের সাথে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার, কিন্তু সেজন্যে সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। সব দিক থেকে তৈরি না হয়ে এই ভয়ানক লোকটার সাথে লাগতে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে।

লবিতে ঢুকল ওরা। কেয়ারটেকারের জানালাটা খোলা, কিন্তু পর্দা ঝুলছে। জানালার সামনে দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল ওরা। সিঁড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ল। ওদেরকে নিয়ে টপ ফ্লোরে উঠে এল এলিভেটর।

করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। মুখোমুখি দুটো দরজা, একটার সামনে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে কী-হোলটা দেখাল চ্যাপম্যান। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন। ওভারকোটের পকেট থেকে একটা পয়েন্ট থারটি এইট অটোমেটিক বের করল চ্যাপম্যান। অকারণে হাসছে সে, কিন্তু হাতের কাজ থেমে নেই। অটোমেটিকের ব্যারেলের সাথে বেঢপ আকৃতির একটা সাইলেন্সার ফিট করল। কী-হোলে একটা হাত চাপা দিল জ্যাসন, হাসিমুখে ডোর-বেলের বোতামে চাপ দিল চ্যাপম্যান।

বোধহয় পায়চারি করছিল আশরাফ, বেলের আওয়াজ শুনে কোন রকম সাবধান হওয়ার কথা তার মনেই থাকল না, দরজা খুলে দিল। পিস্তল তুলে তার বুকে তাক করল চ্যাপম্যান, নিষ্ঠুর হাসিটা লেগেই আছে মুখে। 'খবর নিতে এসেছি, ফ্রেন্ড,' বলল সে। 'কানের পাশে হাত তোলো, তারপর পিছিয়ে যাও।'

চ্যাপম্যানের পিছনে উদয় হলো জ্যাসন, তাকে দেখে চেহারা কালো হয়ে গেল আশরাফের। বাধা দেবার মতলবটা বাতিল করে দিল সে। 'কি চাও তোমরা?' বলেই পিছিয়ে যেতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতর ঢুকল চ্যাপম্যান।

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল জ্যাসন। নির্লিপ্ত চেহারা তার, যেন কাজ থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে।

দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে দোতলায় উঠে এল রানা। হাতে সময় আছে, লুনা কি করছে দেখার জন্যে ফিরে এসেছে ও। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখল, আলো জ্বলছে। কিন্তু ঘরে লুনা নেই। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? বেডরূমে আছে? ডাকল, 'লুনা?'

সাড়া নেই।

বেডরূমে ঢুকল রানা। নেই। 'লুনা?' বাথরূমের বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে আবার ডাকল ও। সাড়া এল না। এগিয়ে গিয়ে বাথরূমের দরজার হাতল ধরে টান দিতেই খুলে গেল দরজা। লুনা নেই।

ধীর পায়ে ফিরে এসে বিছানায় বসল রানা। মেয়েটাকে ধরে রাখতে পারল না, সেজন্যে মন খারাপ হবার কথা, কিন্তু তা হলো না। কয়েকটা প্রশ্ন দেখা দিল মনে।

চলে গেল কেন?- কে মেয়েটা?

চেহারায় সতর্ক একটা ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বেডরুমের চারদিক তাকাল, মনে হলো সব ঠিকই আছে। বড় ওয়ারড্রোবের সামনে এসে দাঁড়াল ও। সবচেয়ে নিচের দেরাজটা ব্যবহার করে না ও, টেল-টেইলের উপকরণ সেখানেই রাখা আছে। গাম দিয়ে একটা চুল সাঁটা আছে দেরাজের কিনারায়। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, চুলটা মাঝখানে ভাঁজ হয়ে আছে। পরিষ্কার হয়ে গেল রুমটা সার্চ করেছে লুনা।

বাথরুমে ঢুকল রানা। দেয়াল আলমারি পরীক্ষা করে দেখল নাইকন এফএম ক্যামেরা, দুটো মাইক্রোফোন, একটা টেপ রেকর্ডার, সিঁধেল চোরের প্রয়োজনে লাগে এমন কিছু যন্ত্রপাতি, কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও আরও অনেক কিছু রয়েছে, যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি আছে সব। সিলিঙের সাথে জ্বলছে খুদে একটা সবুজ বালব সেটা দেখে নিশ্চিত হলো রানা। এই জায়গার খোঁজ পায়নি লুনা।

আলমারি বন্ধ করে সিটিং রুমে ফিরে এল ও। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল কার্পেটের দিকে, ভাবল, আশরাফকে বকাঝকা করলাম, কিন্তু আমি নিজে কি? আমি কেন সাবধান হইনি?

কারা এরা? আশরাফের সাথে আমি দেখা করতে যাওয়ায় ওরা আমার খোঁজ পেয়েছে, তা নয়। তার আগে থেকে আমার সম্পর্কে জানে ওরা। খুব চতুরতার সাথে মেয়েটাকে লাগানো হয়েছিল আমার পেছনে, আমিও বোকার মত···

আশরাফের বিপদ হতে পারে, হঠাৎ করেই ভয় হলো। দ্রুত এগিয়ে এসে টেলিফোনের সামনে দাঁড়াল ও। রিসিভার তুলে ডায়াল করল আশরাফের নাম্বারে। রিঙ হচ্ছে তো হচ্ছেই, রিসিভার তুলছে না কেউ। সাড়া দেয়ার জন্যে কেউ নেই ওখানে বুঝতে পেরে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হেঁটে এল, দাঁড়িয়ে পড়ে তাকিয়ে থাকল সাদা দেয়ালের দিকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেন অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

আশরাফকে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে বলে দিয়েছে ও। নেই কেন? আর যদি থাকে, রিসিভার তুলল না কেন? দ্রুত পায়ে বাথরুমে ফিরে এল রানা, আলমারি খুলে অ্যামোনিয়া গান রেখে দিয়ে তার বদলে তুলে নিল একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক।

অত্যন্ত সাবধানে দরজা খুলল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ধীরে ধীরে। চোখ দুটো সতর্ক। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আধো অন্ধকার উঠানটা ভাল করে দেখে নিল, তারপর এগোল গাড়ির দিকে।

দশ মিনিট পর রু কাস্টিলিয়ঁ-তে পৌঁছল রানা। রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে খানিকটা হেঁটে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকল। এলিভেটর থেকে পাঁচতলায় নেমে আশরাফের দরজার বেল টিপল। ভেতর থেকে সাড়া পাবে বলে আশা করেনি, এক মিনিট অপেক্ষা করার পর কী-হোলে সরু একটা তার ঢুকিয়ে দু'চারবার ঘুরিয়ে খুলে ফেলল তালা।

কোল্ট হাতে খুদে হলঘরে ঢুকল রানা। সেখান থেকে চলে এল লিভিং রুমে।

বিছানায়, হলুদ ভেলভেটের চাদরের ওপর পড়ে রয়েছে আশরাফ। লাশ দেখেই কঠোর, হিংস্র হয়ে উঠল রানার চেহারা। সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। তারপর ধীরে ধীরে হিংস্র ভাবটা সরে গিয়ে থমথমে হয়ে উঠল মুখের চেহারা।

গলা টিপে খুন করা হয়েছে আশরাফকে। তার ডানহাতের নখগুলো উপড়ে নেয়া হয়েছে। নখহীন আঙুলগুলোর মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে ভেলভেটের একটা অংশ ভিজিয়ে দিয়েছে।

নির্যাতনের নমুনা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা। এই ধরনের নির্যাতন সহ্য করে মুখ বুজে থাকা আশরাফের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যারা ওকে খুন করেছে, তারা এখন জানে আজ রাত এগারোটায় মাদাম স্যানডোরার সাথে সুইট প্যারিসে দেখা করতে যাবে মাসুদ রানা।

লাশের পকেট সার্চ করল ও। এক হাজার ডলারের চেকটা পাওয়া গেল শুধু।

এগিয়ে গিয়ে লাশের পাশে দাঁড়াল রানা। একটা হাত বাড়িয়ে আশরাফের মাথা ছুঁলো ও। বিড় বিড় করে বলল, 'কথা দিলাম, প্রতিশোধ নেব '

এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কাজেই পোস্ট-মর্টেম হবে। পুলিসের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে দেশে পাঠাতে হবে লাশ। আশরাফের লাশ প্রথম দেখেছে ও, পুলিসকে এটা জনতে দেয়া চলবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। পুলিস জানলে ওয়াটও জানবে, এই মুহূর্তে সেটা চায় না ও। নিজের পরিচয় না দিয়ে আশরাফের মৃত্যুর খবর ওয়াটকে বা পুলিসকে জানানো যায়, তাই হয়তো জানাবে সে, কিন্তু সেটা এখুনি নয়। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খবর পেলেই ওকে খুঁজবে পুলিস, অযথা সময় নষ্ট করাবে।

অফিসে অথবা বাড়িতে অপেক্ষা করছে ওয়াট। ঠিক হয়ে আছে, রানা এজেন্সির একজন লোক তার সাথে যোগাযোগ করবে। কিন্তু কেউ যদি যোগাযোগ না করে? সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না ওয়াট, ব্যাপারটা কি জানার জন্যে খোঁজ-খবর নেবে সে। সাড়ে এগারোটার ফ্লাইটে আশরাফ প্যারিস ত্যাগ করবে, এ-কথা জানার পরও তার খোঁজে এখানে আসবে সে, অথবা লোক পাঠাবে। রানা ঠিক করল ফোন করবারও দরকার নেই তার, ওয়াটই আবিষ্কার করুক লাশটা। সে-ই খবর দেবে পুলিসে।

তিন

'টয়োটার লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি, স্যার,' বলল নিগেল চ্যাপম্যান।

কার্ল হফারের লাক্সারী সুইটে রয়েছে ওরা। সোফায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছে কার্ল হফার, আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরুটের আগুনে চোখ। তার ঠিক মাথার ওপর রূপালি মাছ আকৃতির একটা ওয়াল-ক্লক, দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

'বলে যাও।'

ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে কার্ল হফারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চ্যাপম্যান, চেহারায় বিনয় এবং শ্রদ্ধার ভাব। নিচু গলায় বলল সে, 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সম্পর্কে যতদূর জানতে পেরেছি, ওটা একটা গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান, ওই লোকটা হলো বস্, নাম মাসুদ রানা। রুদে সুইসে-তে অফিস, প্যারিসে এলে ওর ওপরতলায় থাকে লোকটা। একটু টাইট দিতেই আশরাফ স্বীকার করল, সুইট প্যারিসে মাদাম স্যানডোরার সাথে এই মাসুদ রানাই আজ রাত এগারোটায় দেখা করতে যাবে।'

কোন মন্তব্য করল না কার্ল হফার, নিঃশব্দে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল শুধু।

'মেয়েটা কি বিক্রি করতে চায় তা আশরাফও জানত না, ওয়াটও জানে না। পৌঁছতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, স্যার। গিয়ে দেখি, মাসুদ রানা বাড়িতে নেই। আশরাফের মত ওকেও শেষ করার ইচ্ছে ছিল আমার।'

'খুব ভাল করছ তুমি, নিগেল,' ধীর ভঙ্গিতে চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল কার্ল হফার, তাকিয়ে থাকল জুতোর চকচকে ডগার দিকে।

প্রশংসা শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চ্যাপম্যানের চেহারা। ভক্তির আধিক্যে চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল তার।

'কিন্তু আসল কাজটাই বাকি রয়ে গেছে, নিগেল,' বলল কার্ল হফার। 'এই মেয়ের সাথে মাসুদ রানার দেখা হবে না। তোমার ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকল, কোনভাবেই যেন হোটেলের ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে সে। যেভাবে পারো, যেখানে পাও, শেষ করে দাও। আর মেয়েটাকে ধরো। তার সাথে আমার কথা না হলেই নয়। ভয় দেখাও, কিডন্যাপ করো, কিন্তু জখম কোরো না। জ্যাসনের বাড়িতে নিয়ে যাও তাকে। ওখান থেকে আমাকে টেলিফোন করবে, তার অপেক্ষায় আমি বসে থাকলাম এখানে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আই রিপিট, মাসুদ রানার সাথে মেয়েটার কথা হওয়া চলবে না। আর কেউ তার সাথে কথা বলার আগে আমাকে সুযোগ পেতে হবে। পরিষ্কার?'

কার্ল হফারের প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়া বরং সহজ, জানে চ্যাপম্যান। এই দুর্লভ প্রশংসা পেয়ে নিজেকে তার ধন্য মনে হলো। কোটিপতি এই লোকটির ক্রীতদাস হতে পারলে জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই তার। ভক্তি গদগদ সুরে বলল সে, 'ইয়েস, স্যার। আপনার কথামতই হবে সব।'

বিদায় দেবার সময়ও চ্যাপম্যানের দিকে তাকাল না কার্ল হফার, শুধু একটা হাত নেড়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। চ্যাপম্যানের মত অনেক গুণ্ডা-পাণ্ডা চরিয়েছে সে, কিভাবে এদের ভক্তি আদায় করতে হয় জানা আছে তার। থুতনির দাড়ি, নোংরা পোশাক—চ্যাপম্যানের এগুলো পছন্দ করে না সে, কিন্তু যতদিন কাজ দেবে ততদিন ওর ওপর সন্তুষ্ট থাকতে আপত্তি নেই তার।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় মাটিতে পা পড়ল না চ্যাপম্যানের। পার্ক করা সিট্রনে ফিরে এল সে। বসের নির্দেশগুলো নিয়ে ফচেটের সাথে পরামর্শ শুরু করল। পিছনের সীটে অনড় বসে থাকল জ্যাসন, শলা-পরামর্শে যোগ দেয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ। তার কাজ হলো নিশ্চিহ্ন করা, ধ্বংস করা। চ্যাপম্যান আর ফচেট

তাকে পিশাচ বলে মনে করে, মুখে স্বীকার না করলেও ভয় পায়, জানে ও।

সিগারেট ধরিয়ে কড়া একটা টান দিল চ্যাপম্যান, কথা বলার সময় তার মুখ থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল, 'আরও লোক দরকার আমাদের। তোমরা অপেক্ষা করো এখানে।' গলার সুর আর বলার ভঙ্গিতে কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠল। 'ফোন করে লোক জোগাড় করছি আমি। ক্লাবটাকে সীল করতে হলে আরও অন্তত পাঁচজন লোক দরকার হবে আমার।'

ঠোঁটে একটা সিগারেট তুলে চ্যাপম্যানের চলে যাওয়াটা দেখল ফচেট। হাত দুটো দুলছে শরীরের দু'পাশে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটছে। ছেলেটার সব কিছু খুব দ্রুত গতিতে, সময়ের চেয়ে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে, ভাবল সে। লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরাল, ভিউ মিররে চোখ রেখে তাকাল জ্যাসনের দিকে। গভীর দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাসন। চোখের মণি, পাতা, নাকের ফুটো, হাত-পা, বুক—কিছুই তার নড়ছে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল সে। আশরাফকে নিয়ে কি করেছে লোকটা, চ্যাপম্যানের মুখে শুনেছে সব। ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যে টাকা দরকার তারচেয়ে বেশিই দেয় কার্ল হফার, ভাবল সে, এই লোকের কাজ করতে আপত্তি নেই তার; কিন্তু দলে জ্যাসন না থাকলে আরও মন দিয়ে কাজ করতে পারত।

পাঁচ ফিট দু'ইঞ্চি হবে মেয়েটা। চেহারাটা খুব ভাল। উজ্জ্বল কলাপাতা রঙের সোয়েটার আর উল দিয়ে তৈরি কালো ট্রাউজার, দুটোই শরীরের সাথে সেঁটে আছে। হাতে একগাদা খবরের কাগজ। গাড়ির পাশে এসেই হাতল ধরে টান দিল সে, দরজা খুলে জানতে চাইল, 'পেপার?' নীল চোখ দিয়ে প্রথমে সে ফচেট, তারপর জ্যাসনকে পরীক্ষা করল।

চোখ বড় বড় করে মেয়েটাকে দেখল ফচেট। এমন সুন্দরী মেয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করছে, ভাবাই যায় না। 'আরও ভাল কোন কাজ পেলে করবে?' জিভের ডগা দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল সে। 'ইচ্ছে করলে রাজরানীর হালে থাকতে পারো তুমি...'

পিছিয়ে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল মেয়েটা। গুরু নিতম্বে ঢেউ তুলে তার চলে যাওয়াটা লোভাতুর চোখে দেখল ফচেট।

'কাজের মধ্যে রয়েছি, তা নাহলে...খাসা মাল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এই রকম একটা জিনিস পেলে ভালমানুষ হয়ে যেতেও আপত্তি নেই আমার, মাইরি বলছি!'

জ্যাসনের তরফ থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া গেল না। মেয়েদের ব্যাপারে তার কোন দুর্বলতা নেই। মেয়েদেরকে যারা উত্যক্ত করে না তারা এক ধরনের প্রশংসা পেয়ে থাকে, জ্যাসনকেও সেটা পেতে দেখেছে ফচেট, সেজন্যে লোকটাকে ঈর্ষা এবং ঘৃণা করে সে।

এক মিনিট পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এল চ্যাপম্যান। সবুজ সোয়েটার পরা মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার ছায়ায়, চ্যাপম্যান তাকে দেখতে পেল না। সিট্রনে চড়ছে সে, কলম বের করে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় গাড়ির নম্বর লিখে নিল মেয়েটা।

সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসে চ্যাপম্যান বলল, 'বুল ক্লি-শি-তে চলো। আধঘণ্টার মধ্যে পাঁচজন জড়ো হবে ওখানে। জলদি, ফচেট! রানার আগেই সুইট প্যারিসে পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ফচেটের গলা থেকে। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে। লে'টয়েল-এর দিকে ছুটে চলল সিট্রন।

রেস্তোরাঁটা ছোট, কিন্তু খুব ভিড়। দেয়াল-ঘেঁষা একটা টেবিলে সামনে কফির কাপ নিয়ে বসে আছে রানা। চিন্তা করছে।

পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে প্যারিসের আশপাশে তিন জায়গায় ফোন করেছে ও। রাত দুটোর মধ্যে রানা এজেন্সির তিনজন এজেন্ট ফিরে আসবে প্যারিসে। দুঃসংবাদটা জানিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে ও, আশরাফের লাশের ব্যবস্থা যা করার তারাই করবে। বিশেষ ভাবে নিষেধ করে দিয়েছে রানা, তার উপস্থিতি এবং হাতের কাজটা সম্পর্কে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। প্যারিসে ফিরে এলেও, কোন অবস্থাতেই রানার সাথে যোগাযোগ করবে না তারা।

হাতঘড়ি দেখল ও। দশটা। আর দেড় ঘণ্টা সময় আছে। জানে, আশরাফকে যারা খুন করেছে সুইট প্যারিসে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে তারা। যদি প্রফেশনাল হয়, এমন ব্যবস্থা করবে, যেন সুইট প্যারিসের ধারেকাছে ও ঘেঁষতে না পারে। এরই মধ্যে এলাকাটাকে দুর্গম করে তুলেছে তারা। সাবধান না হলে সরাসরি তাদের ফাঁদে গিয়ে ধরা পড়তে হবে ওকে।

ওয়াটকে টেলিফোন করলে কেমন হয়? কিন্তু তাতে লাভ কি! এই পরিস্থিতিতে তাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না ওয়াট। কাজটা আশরাফের কাছ থেকে ও পেয়েছে, এটা যত কম লোক জানে ততই ভাল। তাছাড়া, লোকটার সাথে ওর পরিচয়ও নেই।

যা করার একাই করতে হবে ওকে। প্রথম কাজ, মাদাম স্যানডোরার সাথে কথা বলে জানা, কি বিক্রি করতে চায় সে। দু'ভাবে যোগাযোগ করা যায়। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সুইট প্যারিসে যেতে পারে, কিংবা টেলিফোন করে মেয়েটাকে বলতে পারে, অমুক জায়গায় এসো তুমি।

আরও এক মিনিট চিন্তা করল রানা। ধারণা হলো, ইতিমধ্যে মেয়েটার নাম ঠিকানা জেনে ফেলেছে প্রতিপক্ষ, কাজেই এখন তারা সম্ভবত কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে তাকে। আশরাফের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে, সে-ধরনের অত্যাচার কোন মেয়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ওদের হাতে মেয়েটা পড়লে সব বলে দেবে। তখন আর ব্যাপারটার কোন গুরুত্বই থাকবে না। কথা আদায় করতে পারলে মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে। আর মেয়েটা যদি মারা যায়, কি নিয়ে এত খুন-খারাবি, সেটা জানার আর কোন রাস্তা থাকবে না ওর।

সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সিদ্ধান্ত নিল রানা, সুইট প্যারিসে যাবে সে। আড়ালে-আবডালে ঘুরঘুর করলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

আবার কফির অর্ডার দিল ও। ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে আছে। কালোকেশী মেয়েটা, লুনা, কে সে? এই খুন-খারাবির সাথে কি সম্পর্ক তার,

কোথায় সে খাপ খায়?

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে বিল মিটিয়ে দিল ও, বেরিয়ে এল রাস্তায়। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ঠিক করল, গাড়িটা পার্কিং লটে যেখানে আছে সেখানেই আপাতত থাক। খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল ও। ড্রাইভারকে বলল, 'সেন্ট ল্যাজার স্টেশন।'

স্টেশনের সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি বিদায় করে দিল ও। বুলভার ক্লিশি অনেকটা দূরের পথ, পায়ে হেঁটে রওনা হলো। ফুটপাথে বেশ ভিড়। যে-কোন আকস্মিক বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে ও। হাতঘড়ি দেখল, দশটা পনেরো। পিছনের একটা রাস্তায় চলে এল ও, বুলভারের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে। ওকে ঠেকাবার জন্যে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা। কি ধরনের ব্যবস্থা হতে পারে সেটা? চারদিকে লোকজন রয়েছে, রাস্তার মধ্যে তাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করবে না। কোটের ভেতর হাত ভরে পয়েন্ট ফরটি-ফাইভের বাঁটে আঙুল জড়াল ও। ঠাণ্ডা স্পর্শটা দারুণ স্বস্তি এনে দিল মনে। হঠাৎ শির শির করে উঠল ঘাড়ের পিছনটা। চোখের কোণ দিয়ে বেঁটে একজন লোককে দেখেছে। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে একটা ফটো ইকুইপমেন্টের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। উল দিয়ে কিনারা মোড়া একটা কোট পরে আছে, মাথায় সবুজ রঙের সুইস হ্যাট। পাশ কাটাবার সময় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল একবার। তারপর পিছু নিল।

মুখের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল রানার। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে লোকটাকে খুন করতে পারে ও। কিন্তু এই লোকটাই আশরাফের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কিনা, এখুনি সেটা জানা যাচ্ছে না। সুইট প্যারিস এখনও অনেকটা দূরে, তারমানে, বিরাট এলাকা জুড়ে জাল ফেলেছে ওরা। ঠিক আছে, আমিও দেখব কিভাবে বাধা দাও! ওখানে আমি ঢুকবই!

পিছন ফিরে একবারও তাকাল না রানা, যেভাবে হাঁটছিল হাঁটতে লাগল। পিছনে ভারী পায়ের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। তারপর, হঠাৎ করে, খোলা একটা দরজা দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে ঢোকার দরজা এটা, উঠানটা প্রায় অন্ধকার। আকাশে চাঁদ আছে, কিন্তু নিস্তেজ।

উঠান পেরিয়ে আসতেই গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল রানা। ফ্ল্যাট বাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও। খোলা দরজা দিয়ে তাকালেও কেউ দেখতে পাবে না ওকে।

দু'মিনিট কেটে গেল। কিছুই ঘটছে না। ফুটপাথ থেকে লোকজনের পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

আরও তিন মিনিট কাটল। খোলা দরজা পথে উঁকি পর্যন্ত দিল না কেউ। ধৈর্য হারাল না রানা। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ওর স্নায়ুর ওপর এখন আর তেমন কোন চাপ সৃষ্টি করে না, অনেক প্র্যাকটিস করে অভ্যেস করেছে।

ছ'মিনিটের মাথায় আর থাকতে পারল না লোকটা, খোলা দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সামনের আধো অন্ধকার উঠানটা পেরুতে হবে বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়াল সে। হাবভাব দেখে মনে হলো, নার্ভাস হয়ে পড়েছে। নড়ল না রানা।

চোখের সামনে ভেসে উঠল আশরাফের লাশ। চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। নিশপিশ করতে লাগল হাত দুটো।

আয় শালা!

আরও খানিক ইতস্তত করে পকেটে হাত ভরে কি যেন বের করল লোকটা। চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল জিনিসটা। রানা বুঝল, ছুরি।

সাবধানে উঠানে নেমে এল লোকটা। একটু একটু করে এগোচ্ছে, অতি সতর্ক, তাকাচ্ছে চারদিকে। সাত ফুট দূরে থাকতে রানাকে দেখতে পেল সে। ছুরির ওস্তাদ লোকটা, সাংঘাতিক ক্ষিপ্র। রানাকে দেখেই বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে।

একই সঙ্গে লাফ দিল ওরা।

এক লাফে চারফুট এগিয়ে এল লোকটা। কোমরের কাছ থেকে ওপর দিকে, রানার বুক লক্ষ্য করে ছুটে এল ছুরি। লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেছে রানা, একটু কাত হয়ে পিছনে হেলল, সেইসাথে ভাঁজ করে নিল ডান পা।

ছুরির ফলা নাগালের মধ্যে পেল না রানাকে। নেমে এল রানা। বাম পা মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল লোকটার হাঁটুতে।

ছুরিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এমনিতেই ভারসাম্য হারিয়েছিল লোকটা, হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড সাইড কিক খেয়ে পা মচকে গেল ওর, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে।

একলাফে সামনে এগিয়ে এল রানা, বামহাতের কারাতে কোপ মেরে ঠেকিয়ে দিল ছুরির দ্বিতীয় আক্রমণ। কব্জির কাছে প্রচণ্ড আঘাত পড়তেই ছিটকে চলে গেল ছুরিটা দশ হাত দূরে। গুনে গুনে ছয়টা ঘুসি মারল রানা দেড় সেকেন্ডে—শেষ দুটো ঘুসি মারল লোকটার কিডনি বরাবর। কিন্তু এই দুটোর খবর বলতে পারবে না লোকটা—নাক, চিবুক, চোয়াল আর সোলার প্লেক্সাসে চারটে হাতুড়ির ঘা খেয়েই জ্ঞান হারিয়েছে।

পিছন ফিরে একবার তাকালও না, হন হন করে আলোকিত রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। লোকজনের চলমান ভিড়টা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে।

এখন আগের চেয়েও সাবধান। ক্লাব আর মাত্র দু'মিনিটের পথ। ঘড়ি দেখল। এগারোটা বাজতে পঁচিশ।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা কাফে-বার। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের ভিড়ে গিজগিজ করছে ভেতরটা। ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল, মুখে না কামানো জঙ্গল। মেয়েদের পরনে টাইট ফিট জিনস, গেঞ্জি। মিউজিক সেট থেকে আসছে দ্রুত-লয় ড্রামের শব্দ, তার সাথে যোগ হয়েছে স্যাক্সোফোন, আর হাস্য-মধুর আলাপন। ভিতরে ঢুকে ভিড় ঠেলে এগোল রানা। একপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ফোন কেবিন আর টয়লেট এলাকায়। একটা কেবিনে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। সুইট প্যারিসের নাম্বারে ডায়াল করল।

অসহিষ্ণু একটা পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস?'

'আপনাদের ওখানে মাদাম স্যানডোরা আছেন?' সাবলীল ফ্রেঞ্চে জানতে চাইল রানা।

ড্যান্স মিউজিক আর ড্রামের অস্পষ্ট আওয়াজ পাচ্ছে রানা, যেন অনেক দূর

থেকে ভেসে আসছে। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিল ও। কাঁচ দিয়ে ঘেরা কেবিনের বাইরে মৃদু আলোকিত লবি, সতর্ক চোখ জোড়া বিপদ খুঁজে ফিরছে সেখানে।

জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি করল লোকটা, পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'আপনি কে বলছেন?'

'মাদাম স্যানডোরা ওখানে থাকলে, তিনি আমাকে আশা করছেন,' বলল রানা।

'ধরে থাকুন।'

ওপরের বার থেকে ভেসে এল তীক্ষ্নকণ্ঠের একটানা মেয়েলি হাসি। আবার লুনার কথা মনে পড়ে গেল রানার। কি সুন্দর, নিষ্পাপ চেহারা, এসব খুনখারাবির সাথে এই মেয়ের সম্পর্ক আছে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কেবিনের ভেতর গরম, রুমাল বের করে ঘাড়ের পিছনটা মুছল ও। অপরপ্রান্তে অনেক দেরি করছে লোকটা।

হঠাৎ করেই আবার তার গলা পেল রানা, 'মাদাম স্যানডোরা আছেন এখানে। আপনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।'

তিক্ত একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। শুধু মাদাম স্যানডোরা কেন, আরও অনেকেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে। বলল, 'ওঁর সাথে কথা বলতে চাই আমি। আপনি কি দয়া করে...' কেবিনের উল্টোদিকের দেয়ালে একজন লোকের ছায়া দেখে চুপ হয়ে গেল ও। রিসিভার রেখে দিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে নিচু হলো। কেবিনের নিচের অংশটা কাঠের, বাইরে থেকে এখন আর ওকে দেখতে পাবে না কেউ। বাঁ হাত দিয়ে দরজার হাতল ধরল ও, ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে কোল্ট অটোমেটিক।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। নিজেকে কোণঠাসা মনে হলো। বাইরে থেকে হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই খুলে যাবে দরজা, আড়ালে দাঁড়িয়ে কেবিনের ভেতর গুলি করা সম্ভব, গুলি খাওয়ার সময় শত্রুর রিভলভার ধরা হাত ছাড়া আর কিছু হয়তো দেখতেই পাবে না ও। কিংবা কাঁচ ভেঙে ওপর থেকেও গুলি করতে পারে লোকটা। তারপর উপলব্ধি করল, গুলির আওয়াজ হলে সরু সিঁড়ি বেয়ে কম করেও পঞ্চাশজন হিপ্পি ছেলেমেয়ে বাঁধ ভাঙা পানির মত নেমে আসতে চেষ্টা করবে, কোন বন্দুকবাজই এই ধরনের বাধা টপকে পালাতে পারবে না।

একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ও। তারপর কাছে-পিঠে আর কোন শব্দ নেই। পিস্তলের বাঁট পেঁচিয়ে ধরা আঙুলগুলো ব্যথা করছে। তবু আরও খানিক অপেক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল ও। একটা টয়লেটের ভেতর থেকে পানির আওয়াজ হলো। আবার দরজার শব্দ, খুলল সেটা। তারপর আবার বন্ধ হলো।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে নিচু হয়েই থাকল রানা, কান দুটো সতর্ক। ওপর থেকে বাজনা আর হাসির আওয়াজ আসছে, নিচে কোন শব্দ নেই। অত্যন্ত সাবধানে কেবিনের দরজা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করল ও, ফাঁকের মুখে তাক করল পিস্তল। কম আলো, কিন্তু লবিতে কোন লোক বা ছায়া দেখল না। ধীরে ধীরে মাথা তুলে সিধে হলো ও। কোন শব্দ না করে আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল কেবিনের

ভেতর। তারপর বেরিয়ে এল।

লবির চারদিকে তাকাল রানা। কেউ নেই। এতক্ষণে বড় করে একটা শ্বাস নিল। টয়লেট লেখা একটা দরজার পাশে আরও একটা দরজা দেখে এগোল ও, সেটা খুলে ভেতরে তাকাতেই দেখল, প্রায় খাড়া ভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে একটা সিঁড়ি। দেয়ালে একটা টাইম সুইচ রয়েছে, একবার চাপ দিলে সিঁড়িতে আলো থাকবে তিন মিনিট। চাপ দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে ছুটল।

চারপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠে এল, ওপর দিকটা ভাল করে দেখার জন্যে থামল একবার। পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া আরও তিন প্রস্থ সিঁড়ি টপকাতে হবে ওকে। আবার উঠতে শুরু করল ও। ছয়তলায় উঠে এসেছে, নিভে গেল আলো। দেয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজছে, পাবার আগেই আবার জ্বলে উঠল আলো। পায়ের আওয়াজ পেল ও। ওপর থেকে নেমে আসছে কেউ।

কোটের ভেতর হাত ভরে পিস্তলটা ধরল রানা। পরবর্তী ল্যান্ডিঙে মধ্য-বয়স্কা এক মহিলাকে দেখল ও। ওকে দেখে থমকে গেল সে, চোখে রাজ্যের সন্দেহ আর ভীতি নিয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। ভারী উলের তৈরি একটা শাল রয়েছে তার কাঁধে, মাথার চুল নেট দিয়ে জড়ানো। রানা উঠে আসছে দেখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে।

অভয় দিয়ে মৃদু একটু হাসল রানা, কিন্তু তাতে মহিলাকে আরও জড়োসড়ো হয়ে উঠতে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল ও। তাকে পাশ কাটাবার সময় লক্ষ করল, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটো তুলে রেখেছে বেচারি। পরবর্তী ল্যান্ডিঙে পৌঁছে পিছন ফিরল ও। দেখল, পড়িমরি করে নেমে যাচ্ছে মহিলা।

আটতলায় উঠে এসে লম্বা একটা করিডর দেখল রানা। দু'পাশে দুটো করে মোট চারটে কামরার দরজা, সবগুলো বন্ধ। শেষ মাথায় আর একটা দরজা, সেটা স্টীলের, বোল্ট লাগানো।

বোল্ট খুলে উঁকি দিতেই রাতের তারাজ্বলা আকাশ দেখল রানা। চৌকাঠ টপকে বেরিয়ে এল সমতল ছাদে, কোন শব্দ না করে বন্ধ করে দিল ভারি দরজা। ছাদের চারদিকে রেলিং, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে অনেক নিচে ব্যস্ত বুলভারের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ক্যাসিনো থিয়েটারের দোরগোড়াটা দেখা গেল পরিষ্কার। ওর আরও ডানদিকে বারবার জ্বলছে আর নিভছে সুইট প্যারিসের নিওন সাইন।

সামনের ছাদগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। তিনটে ছাদ কোন সমস্যাই নয়, সমতল। চার নম্বরটা দোচালা, ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে, মাথাটা চোখা। তারপরের বিল্ডিঙে সুইট প্যারিস ক্লাব, ছাদটা অর্ধেক সমতল, অর্ধেক ঢালু।

কাজটা শুধু কঠিন নয়, সাংঘাতিক ঝুঁকি আছে। তবু এই ছাদ টপকেই সুইট প্যারিসে পৌঁছুবে বলে ঠিক করল সে।

চোখা ছাদে পৌঁছুতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল ওর। এখানে ওকে থামতে হলো। সামনের বাধাটা পরীক্ষা করে দমে গেল মন। টালির ছাদটা প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে মাথার দিকে, টালিতে পা রেখে দাঁড়াবার কোন উপায় নেই। ছাদের কিনারায় পানি নিষ্কাশনের জন্যে নর্দমা আছে, টিন দিয়ে তৈরি। এই টিনের ওপর

ভরসা রাখা যায় না, কিন্তু তাছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। মন চাইছে না, তবু এই নর্দমার ওপর পা ফেলে ছাদটা পেরোবার সিদ্ধান্ত নিল ও। জানে শরীরের পুরোটা ভার এই টিনের ওপর ফেলা যাবে না। পরবর্তী সমতল ছাদে পৌঁছুতে হলে নর্দমার ওপর দিয়ে দশ ফুট এগোতে হবে ওকে।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে সেফটি ক্যাচ অন করল রানা। সামনের দিকে ঝুঁকে বাঁটের আঘাতে একটা টালি ভাঙল। ভাঙা টুকরোটা তুলে পাশের টালিতে রাখতেই গড়িয়ে নামতে শুরু করল সেটা, থামল নর্দমার ভেতর। সদ্য তৈরি ফাঁকের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে কাঠের ফ্রেমের একটা কিনারা ধরল ও, এই ফ্রেমটার ওপরই সাজানো রয়েছে টালিগুলো। অত্যন্ত সাবধানে টিনের নর্দমায় একটা পা রাখল, শরীরের বেশির ভাগ ভর থাকল কাঠের ফ্রেমের ওপর। প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল টিন, ডেবেও গেল বেশ একটু, কিন্তু পায়ের তলা থেকে খসে গেল না।

আবার সামনের দিকে ঝুঁকে আরও একটা টালি ভাঙল ও। নতুন তৈরি ফাঁকের দিকে হাত বাড়াবার সময় শরীরের বেশির ভাগ ওজন নর্দমার উপর চাপাতে হলো, তাতে করে যায় যায় অবস্থা হলো সেটার। ঘামতে শুরু করল রানা। নিচের বুলডারের দিকে তাকাল না, কিন্তু পা ফসকে পড়ে গিয়ে কিভাবে নেমে যাচ্ছে শরীরটা, কল্পনার চোখে দেখতে পেল পরিষ্কার।

দুটো টালি ভেঙে অল্প খানিকটা এগিয়েছে ও, তেমন কোন কায়িক পরিশ্রমের কাজ নয় এটা, তবু হাঁপিয়ে উঠেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে হাতটা আবার লম্বা করে দিল, পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে ভাঙল আরও একটা টালি। হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে হোলস্টারে ভরল পিস্তল, তারপর হাত বাড়াল সদ্য তৈরি ফাঁকের দিকে। ফাঁকের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে কাঠের ফ্রেম ধরবে, সেই সাথে ছেড়ে দেবে অপর হাতে ধরা ফ্রেমের আরেকটা অংশ। এই সময়টাই বিপজ্জনক। নর্দমার ওপর সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে এখনই। সদ্য তৈরি ফাঁকের দিকে বাঁ হাত বাড়াল, এগোচ্ছে সামনের দিকে, এমনি সময়ে পায়ের তলা থেকে খসে গেল টিনের আবরণ। ঝপ করে নেমে গেল পা দুটো, ঝুলতে থাকল শূন্যে। খপ করে গর্তের কিনারা ধরার চেষ্টা করল ও, পারল না, ছোবল মারার ভঙ্গিতে আবার চেষ্টা করল। ফাঁকের ভেতর ঢুকে গেল হাত। দুই গর্তের ভেতর দুই হাত, পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। একটা পা ভাঁজ করে নর্দমার সামনের অংশে তুলতে চেষ্টা করল ও। টিনের ওপর পা রেখে, হাত দুটো থেকে কমিয়ে একটু একটু করে পায়ের ওপর শরীরের ভর চাপাতে শুরু করল। ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল টিন, কিন্তু পায়ের নিচ থেকে খসল না।

ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পা-ও নর্দমার ওপর তুলল রানা। দুই হাত ফাঁকের ভেতর গলিয়ে টালির গায়ে গা ঠেকিয়ে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল। হাঁপাচ্ছে। তারপর আবার সামনে বাড়ল, পিস্তল বের করে শেষ টালিটা ভাঙল বাঁট দিয়ে। হোলস্টারে ভরে রাখল পিস্তল, দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাতাস। সাবধানে এগোল এবার। ফাঁকের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে ফ্রেম ধরল, ওখান থেকে লাফ দিয়ে পড়ল তিন ফিট নিচে সমতল পাশের ছাদে।

হাঁটু আর কনুই ছাদের মেঝেতে, মাথা উঁচু করে চারদিকে তাকাল রানা। চোখে কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না। গজ দেড়েক সামনে একটা স্কাইলাইট, উঠে দাঁড়িয়ে সেটার সামনে এসে থামল ও। ঝাপসা কাঁচের ভেতর অন্ধকার, কিছুই দেখা গেল না। স্ক্রু খুলে কাঁচের ফ্রেমটা সরাল ও। পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে আলো ফেলল নিচের দিকে। একটা ল্যান্ডিং আর সিঁড়ি দেখা গেল। ফাঁকটা দিয়ে গলে খানিকটা নিচে নামল ও, ফ্রেমটা আবার বসিয়ে দিল জায়গামত। তারপর ঝুপ করে পড়ল ল্যান্ডিঙের মেঝেতে।

আপন মনে হাসল রানা। কারও চোখে ধরা না পড়ে সুইট প্যারিসে পৌঁছে গেছে সে।

চার

কোমরে হাত রেখে চ্যালেঞ্জের সুরে বলল চ্যাপম্যান, 'গোটা এলাকা সীল করে দিয়েছি। আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্লাবের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না ও।' হাতঘড়ি দেখে নিয়ে ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'আসার সময় হয়ে গেছে তার, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।'

ফচেটকে সাথে নিয়ে অন্ধকার একটা দোকানের বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তার উল্টোদিকে সুইট প্যারিস ক্লাব। গোটা ব্যাপারটা একঘেয়ে আর বিরক্তিকর লাগছে ফচেটের। ঠোঁট উল্টে বলল সে, 'যার জন্যে এত আয়োজন, সে-ই যদি না আসে? লোকটা যদি একটা ভীতুর ডিম হয়?'

'আসবে না মানে!' খেঁকিয়ে উঠল চ্যাপম্যান। 'কাকে তুমি ভীতু বলছ! পরিচয় নেই, কথাও হয়নি, কিন্তু আমি জানি, আমার চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করেছে। এই লোককে আরেকজন আশরাফ চৌধুরী মনে করলে মস্ত ভুল করবে তুমি।'

'বেশ, মানলাম, এই লোক টাফ ক্যারেক্টার,' বলল ফচেট। 'তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে না হয় এলোও সে। তারপর?'

পকেটে ভরা হাত দিয়ে রিভলভারে ফিট করা সাইলেন্সার স্পর্শ করল চ্যাপম্যান। 'তারপর গুলি করব। কিভাবে কি হলো, কেউ টের পাবার আগেই কেটে পড়ব। ব্যস।'

'এরমধ্যে অবশ্য বাহাদুরির কিছু নেই,' বলল ফচেট। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু সাবধান, এমনভাবে গুলি করবে, যেন মরে।' তারপর জানতে চাইল, 'গ্রে কোথায়?'

'ওদিকের রাস্তায়,' বলল চ্যাপম্যান। 'রানার ফটো দেখেছে সে। এদিকে তাকে আসতে দেখলেই আমাদের খবর দেবে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর অলস ভঙ্গিতে জানতে চাইল ফচেট, 'সবদিক কাভার করেছ তো?'

'অবশ্যই!'

'ছাদে? ছাদে কাউকে রেখেছ?'

'ছাদে?' ঝট করে ফচেটের দিকে ফিরল চ্যাপম্যান। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠেছে চোখ। 'ছাদে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফচেট। 'বললে, গোটা এলাকা সীল করে দিয়েছ। ছাদ বাদ পড়লে সীল হলো কিভাবে? গরু খোঁজা করেও তাকে আমরা পাইনি কোথাও, এ-থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, লোকটা ঘাস খায় না। ঘটে তার কিছু পদার্থ নিশ্চয়ই আছে। সে যদি ভেবে থাকে, ছাদ দিয়ে আসবে, তাহলে?'

ফচেটের কথা শুনে থ হয়ে গেল চ্যাপম্যান। সে এত বুদ্ধিমান, বস্ তার বুদ্ধির প্রশংসা করেন, অথচ সম্ভাবনাটা উঁকি দিল কিনা ফচেটের মত একটা গবেটের মাথায়! বয়সে ছোট হলে কি হবে, সে তার মাথাটাকে খাটায় বলেই না বসের সুনজর কাড়তে পেরেছে। সেই মাথা আজ তার সাথে বেঈমানী করল কেন!

এই ধরনের ভুল বসের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠল চ্যাপম্যান। ঘাম দেখা দিল কপালে। দ্রুত চাপা গলায় বলল সে, 'তুমি যাও, ফচেট। কথাটা আমারই মনে পড়া উচিত ছিল। ছুটে গিয়ে এলিভেটরে চড়ো, নজর রাখো ছাদের ওপর। জলদি!'

ঘোঁৎ করে আওয়াজ ছেড়ে ঘাড় ফেরাল ফচেট। 'আমি? আমি কোথাও যাচ্ছি না। গরজ থাকলে তুমি যেতে পারো। এত কি দায় পড়েছে আমার যে…'

কোমরে হাত রাখল চ্যাপম্যান। 'আমি তোমাকে অর্ডার করছি, ফচেট!' হিংস্র দেখাল তাকে। 'যাও!'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ফচেট। ভাবল, ছোকরা কার্ল হফারের প্রিয়পাত্র, ওর সাথে তর্ক করা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে, বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

গোমড়া মুখ নিয়ে পা বাড়াল ফচেট, চ্যাপম্যানের ইচ্ছে হলো তার পাছায় কষে এক লাথি মারে।

রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের বিল্ডিঙে ঢুকল ফচেট। এই বিল্ডিঙের নিচের তলায় সুইট প্যারিস ক্লাব। লবিতে ঢুকে সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল সে। সেলার থেকে ভেসে আসছে উদ্দাম জ্যাপমিউজিক।

শেষ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করবে রানা, নিচের লবিতে ফচেটকে ঢুকতে দেখে স্থির হয়ে গেল ও, সেঁটে গেল দেয়ালে। দেখল, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এলিভেটরে চড়ল ফচেট, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এলিভেটর ওপর দিকে রওনা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল লবিতে।

লবির এক প্রান্তে নিওনে লেখা রয়েছে—সুইট প্যারিস। পাশেই একটা তীর-চিহ্ন, নিচে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ির দিকে যেতে বলছে। নিওন সাইনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, স্যুটের অবস্থা পরীক্ষা করল। আলো এখানে খুব উজ্জ্বল বলে গাঢ় রঙের স্যুটে কিছু কালি-ঝুলির ছাপ দেখা গেল, হাত-ঝাপটা দিয়ে খানিকটা ঝেড়ে ফেলে মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর করল ও। জুতো আর হাতের চামড়া সামান্য ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়, কিন্তু এ-ব্যাপারে করার কিছু নেই। মানিব্যাগ

থেকে একশো ফ্র্যাঙ্কের দুটো কড়কড়ে নোট বের করল, ভাঁজ করে তালুর ভেতর নিয়ে নেমে এল সিঁড়ির নিচে।

ক্লাবে ঢোকার মুখে বাধা পেল রানা। লাল রঙের ইউনিফর্ম পরে আছে ডোরম্যান। একবার মাত্র তাকাল রানার দিকে, পরমুহূর্তে পথরোধ করে দাঁড়াল।

চেহারায় অসন্তোষ ফুটিয়ে গম্ভীর সুরে বলল সে, 'শুধু সদস্যদের জন্যে।'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'জানি,' খালি হাতটা বাড়িয়ে লাল ইউনিফর্মের একটা ভাঁজ টেনে সিধে করে দিল ও। একজন বিদেশীর মুখে বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ শুনে অবাক হয়ে গেল ডোরম্যান। 'সদস্য হতে গেলে সময় আর সুযোগ দরকার, আমি সেটা পাইনি।' লোকটার হাতে ভাঁজ করা নোট দুটো গুঁজে দিল ও। 'এসো, আমরা দুই বন্ধু হই।'

ডোরম্যানের হাত দুটোয় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাঁজ করা নোট দুটো খুলে দেখল সে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, গম্ভীর সুরে বলল, 'আমার সাথে আসুন।' বলে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সে, এক রকম টানতে টানতেই ওকে নিয়ে ঢুকল লাউঞ্জে। ওখানে দাঁড়িয়ে একটা দরজা দেখাল সে, দরজার মাথায় লেখা রয়েছে টয়লেট। বলল, 'আগে পরিষ্কার হয়ে নিন, মঁশিয়ে। সন্দেহ নেই, আপনি কোথাও আছাড় খেয়েছেন।'

'ঠিক ধরেছ,' টয়লেটের দিকে এগোল রানা।

'কিছুর দরকার হলে আমাকে জানাবেন, মঁশিয়ে,' পিছন থেকে বলল লোকটা। 'দরজায় আছি আমি।'

তিন মিনিট পর টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে ডোরম্যানকে লাউঞ্জে দেখল না রানা। লাউঞ্জে অনেকগুলো দরজা, এক একটা এক এক দিকে চলে গেছে। খোলা একটা দরজার ভেতর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। ওখানে বোধহয় গাঁজা বা ওই জাতীয় কিছু সেবন হচ্ছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বুক-কাঁপানো ড্রামের আওয়াজ আর হাস্যরোল। সবুজ জ্যাকেট আর সাদা ট্রাউজার পরা এক লোক রানার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা এতই মোটা, দেখলে হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হয়।

'মঁশিয়ে কি আগেই টেবিল রিজার্ভ করেছেন?' সবিনয়ে জানতে চাইল সে।

'মাদাম স্যানডোরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল রানা।

লোকটার মাংসল চেহারায় সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠল। খুঁটিয়ে রানাকে দেখল সে, তারপর আপনমনেই মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'এদিকে আসুন।'

একটা হলঘরের পাশ দিয়ে রানাকে নিয়ে চলল লোকটা। হলঘরের অনেকগুলো দরজা, তার একটার সামনে না দাঁড়িয়ে পারল না রানা। দ্রুত তালে ব্যান্ড বাজছে, আর স্টেজে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ধীর, অলস ভঙ্গিতে এক এক করে কাপড় খুলছে একজন স্ট্রিপার। ভালই দেখতে মেয়েটা। নিজের পেশায় অভিজ্ঞও বটে। কাপড় খুলতে অকারণ দেরি করে, অঙ্গে ঢেউ তুলে, ঢুলু ঢুলু চোখ আর একটু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটে যৌনাবেদন ফুটিয়ে রেখে দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে সে।

করিডরের শেষ মাথায় একটা দরজা খুলে ধরে অপেক্ষা করছিল সবুজ জ্যাকেট, রানা পৌঁছুতে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেই

সাথে বাইরে আটকা পড়ল হলঘরের তুমুল হৈ-চৈ। আগের চেয়ে সরু একটা করিডরে চলে এসেছে ওরা। দু'পাশে দরজা।

মোটা লোক বলল, 'ছ'নম্বর ঘরে আছেন তিনি, মঁশিয়ে।' ঘুরে দাঁড়াল সে, দরজা খুলল। হৈ-চৈ ঢুকে পড়ল করিডরে। দরজা আবার বন্ধ হতেই আর কোন শব্দ নেই। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগোল রানা।

ছ'নম্বর কামরার সামনে দাঁড়াল ও। হোলস্টার থেকে বের করে পিস্তলটা হাতে নিল, অপর হাত দিয়ে নক করল দরজায়।

কেউ ডাকল না।

আবার নক করল রানা। এবারও কেউ সাড়া দিল না দেখে দরজা খুলে সাবধানে ভেতরে ঢুকল ও। চৌকো কামরা, সামনে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত একটা আয়না। ঘরের মাঝখানে জোড়া ডিভান, বিছানা হিসেবেও ব্যবহার করার জন্যে। মেঝেতে নরম কার্পেট।

কেউ নেই ঘরে। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে রাখল ও।

'বসুন, প্লীজ,' মেয়েলি কণ্ঠস্বর, কিন্তু কোত্থেকে এল বোঝা গেল না। ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, কিন্তু উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল, এটা তার মাতৃভাষা নয়। আওয়াজটা একটু যান্ত্রিক শোনাল, তাতে করে ধারণা হলো রানার, মেয়েটা বোধহয় মাইক্রোফোনে কথা বলছে। 'আয়নার দিকে মুখ করে ডিভানের ওপর বসতে হবে আপনাকে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পারল রানা। দেখা করার জন্যে নিজের সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়েছে মাদাম স্যানডোরা। বোকার হদ্দ মাতাল খদ্দেরকে এখানে নিয়ে আসে দেহপসারিনী মেয়ে, পয়সা দিয়ে টিকেট কিনে কিছু লোক তাদের মিলন চাক্ষুষ করে এই ট্রিক মিররের সাহায্যে। কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই আয়না রাখা বেআইনী, কিন্তু ক্লাবগুলো পুলিসকে মাসোহারা দিয়ে আইনকে বশ করে ফেলেছে। রানার সামনে আয়না রয়েছে, মাদাম স্যানডোরার সামনে আছে একটা জানালা।

ডিভানে বসে আয়নার দিকে চোখ রাখল রানা।

'কে আপনি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

রানার মনে হলো, অদৃশ্য মাদাম স্যানডোরা তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে।

'এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক, এর কি কোন প্রয়োজন ছিল?' জানতে চাইল ও।

আবার একই প্রশ্ন, 'কে আপনি?'

শ্রাগ করল রানা। পরিবেশটা এরই মধ্যে বিরক্তিকর লাগছে ওর। 'আমার নাম মাসুদ রানা। তুমি ওয়াটের সাথে যোগাযোগ করেছিলে, ওয়াট আশরাফ নামের একজনের সাথে যোগাযোগ করেছিল, সে-ই দিয়েছে আমাকে কাজটা। নোংরা লোক আমি, টাকা দিলে লোকের নোংরা কাজ করে দিই। তুমি কি ঠিক এই ধরনের তথ্য জানতে চাইছ?'

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। অদৃশ্য মাদাম স্যানডোরা চুপ করে আছে।

'কথা বলো।'

'আমি?' অবাক দেখাল রানাকে। 'কি কথা বলব? আমি তো শুনতে এসেছি, বলতে নয়। তোমার প্রস্তাবটা কি? যা কিছু ঘটেছে, শুরু করেছ তুমি।'

'আপনি ওয়াটের কাছ থেকে এসেছেন, তার প্রমাণ কি?'

'ওয়াট না পাঠালে আর কে পাঠাতে পারে আমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে, কি যেন বিক্রি করতে চাও তুমি। জিনিসটা কি, কত দাম চাও, এসব জেনে নিয়ে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। নাও, শুরু করো।'

'কি যেন নাম বললে? আশরাফ। কে সে?'

'তার ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে তোমার,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'সে মারা গেছে। খুন করা হয়েছে তাকে।'

হিস করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল মাইক্রোফোন থেকে, মাদাম স্যানডোরার নিঃশ্বাস আটকে গেছে মাঝপথে। 'খুন?' আঁতকে উঠল সে।

'হ্যাঁ। গলা টিপে। টরচার করার পর।'

'কে…কে…খুন করল?'

'তোমার তাতে কি আসে যায়?' সামনে ঝুঁকে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'ওয়াট তোমাকে একটা ঠাট্টা বলে ধরে নিয়েছে। আশরাফ তোমাকে একটা ধাপ্পা মনে করেছিল। কিন্তু আমি তা মনে করিনি, তাই এখনও বেঁচে আছি। তুমি…'

'কিন্তু ওয়াটকে আমি বলেছিলাম…'

'শুধু ওয়াটের সাথে নয়, আরও কারও সাথে কথা বলেছ তুমি,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'ওয়াটের প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তাদের তুমি চেনো। কাজটা তুমি ভাল করোনি।'

'আশরাফ মারা যাবার আগে…'

'হ্যাঁ, সব কথা বলে গেছে সে,' বলল রানা। 'ওয়াটের প্রতিদ্বন্দ্বীরা জানে, তোমার সাথে এখানে আমার দেখা হবে। আমাকে ধরার জন্যে বাইরে জাল পেতে রেখেছে ওরা। ছাদ দিয়ে এসেছি আমি। ওরা ভয়ঙ্কর, পেশাদার খুনে, তোমাকে হাতে পেলে একতাল মাংস বানিয়ে ছাড়বে। তার আগে একটা একটা করে তোমার আঙুলের নখ উপড়াবে ওরা। ধরা পড়লে মুখ তোমাকে খুলতেই হবে, তখন আর বিক্রি করার কিছু থাকবে না তোমার হাতে। মাথায় ঢুকছে কিছু?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল স্যানডোরা, তারপর বলল, 'এসবের আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো শুধু মি. ওয়াটের সাথে যোগাযোগ করেছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাহলে আর কেউ মুখ খুলেছে। তারমানে যতটা আশা করছ ততটা দাম তুমি পাবে না। জানতে পারি, কি সেই সাত রাজার ধন?'

আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্যানডোরা বলল, 'রবার্ট ওয়েন প্যাকার কোথায় আছেন, আমি জানি।'

রানার কপালে চিন্তার রেখা, চোখ জোড়া সতর্ক। নামটা চেনা চেনা লাগল, কিন্তু কোথায় শুনেছে তড়িঘড়ি মনে করতে পারল না। তারপর মনে পড়ল। শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল ওর। চেহারায় ফুটে উঠল আগ্রহ। দ্রুত জানতে চাইল, 'সি.আই.এ. এজেন্ট রবার্ট ওয়েন প্যাকার, যিনি বছর চারেক আগে রাশিয়ায়

চলে গেছেন?' সবাই একবাক্যে ওয়েন প্যাকারকে দুষলেও, অভিযোগটা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারেনি রানা। সেই প্রথম থেকেই ওর ধারণা, এর মধ্যে কোন জটিল রহস্য আছে।

'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে জবাব দিল স্যানডোরা।

'তিনি তো এখন রাশিয়ায়, তাই না?'

'দশদিন আগে রাশিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছেন।'

'এখন তাহলে কোথায় তিনি?'

'এই খবরটাই আমি বেচতে চাই।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। ওয়েন প্যাকারের চেহারাটা পরিষ্কার মনে আছে ওর। লম্বা, একহারা গড়ন, মাথাভর্তি সোনালি চুল। এসপিওনাজ জগতের যে ক'জন লোককে শ্রদ্ধা করে ও, ওয়েন প্যাকার তাদের একজন। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে রানা, সুযোগ পেলে আরও অনেক শিখতে পারত। শুধু বুদ্ধিমান নয়, তাঁর একটা আদর্শ ছিল, নীতির বাইরে কোন কাজে তাঁর সায় পাওয়া যেত না। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল মনে দাগ কাটার মত। এমনিতে মনে হত দুর্ভেদ্য, কাছে ঘেঁষা কঠিন, কিন্তু কেউ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে তাঁকে আপন করে নিতে জানতেন। তিনি নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করে রাশিয়ায় চলে গেছেন, এই খবর ছড়িয়ে পড়লে মহা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা বাস্তব, কাজেই অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না, তবু বিশ্বাস করতে সায় দেয়নি রানার মন। কেন, এর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারবে না ও।

আরও পরে কূটনৈতিক সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল, নতুন রিক্রুট করা সোভিয়েত এজেন্টদের ইনস্ট্রাকটর হিসেবে মস্কোয় কাজ করছেন এই স্পাই চূড়ামণি। ট্রেনিং শেষে এদেরকে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে পাঠানো হবে। কিন্তু মস্কোর কোন্ জায়গায় এই বিশেষ ট্রেনিং স্কুল, সেটা অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি।

'তুমি কি বলতে চাইছ ওয়েন প্যাকার আবার দল বদল করেছেন?' সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'নাহয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আড়ালে না থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেই তো পারেন, এত লুকোচুরির দরকার কি?'

'অনেক গোপন তথ্য জানেন তিনি। কোথায় আছেন তিনি এটা জানাজানি হয়ে গেলে তাঁকে বাঁচতে দেয়া হবে না। এটাই তাঁর জন্যে মস্ত একটা বাধা।' খানিক চুপ করে থেকে আবার বলল স্যানডোরা, 'তিনি অসুস্থ। বেশিদিন বাঁচবেন না।'

'তোমার প্রস্তাবটা কি?'

'আমি বলতে পারি, কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে। তাঁর কাছে যাবেন আপনারা। আমাকে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করছি জানতে পারলে আপনারা আমাকে টাকা দেবেন।'

'অনেক গোপন তথ্য জানেন তিনি, কথাটা ব্যাখ্যা করতে পারো?'

'কয়েকটা ফাইল আছে তাঁর কাছে, সাথে করে নিয়ে এসেছেন। বলেছেন,

পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্যে এই ফাইলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

রানার মনে হলো, শেখানো বুলি আউড়ে যাচ্ছে মেয়েটা। তার ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল না, কোন্ দেশের মেয়ে। এই উচ্চারণে আগে কাউকে কথা বলতে শোনেনি ও। বলল, 'কোন প্রমাণ দিতে পারো, যে ওয়েন প্যাকার সত্যিই রাশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন? কিংবা, তিনিই পাঠিয়েছেন তোমাকে?'

'তাঁর নিরাপত্তার খাতিরেই আমার হাতে তিনি কোন প্রমাণ দেননি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তোমার কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ তাহলে থেকেই যাচ্ছে,' বলল ও। 'তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করে পঞ্চাশ হাজার ডলার হাতছাড়া করবে ওয়াট, আমার তা মনে হয় না। ওয়েন প্যাকার আর কি নিয়ে এসেছেন?'

'এত বছর রাশিয়ায় থেকে ওদের স্পাই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে সব জেনেছেন তিনি,' বলল স্যানডোরা। 'তথ্য হিসেবে তার মূল্য অনেক।'

'তা বুঝলাম,' বলল রানা। এক মিনিট চিন্তা করল ও। 'ঠিক আছে, ওয়াটের সাথে কথা বলে দেখি। আগ্রহ নাও দেখাতে পারে সে, জানি না। ডাবল এজেন্টকে কে-ই বা বিশ্বাস করতে চায়?'

'আমার খুব তাড়া আছে,' বলল স্যানডোরা। তার কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার আতঙ্কের আভাস পেল রানা। 'কাল রাতে মি. ওয়াটকে টেলিফোন করব আমি। হ্যাঁ বা না, দুটোর একটা শুনতে চাই। আমার এই খবর কিনতে চায় এমন লোক আরও আছে।'

'না!' দ্রুত বলল রানা। 'ওয়াটের সাথে যোগাযোগ কোরো না। তুমি যদি প্রস্তাবটা আর কাউকে না দিয়ে থাকো, সন্দেহ নেই ওয়াটের অফিসে ফুটো আছে। সেই ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে খবরটা। ওয়াটকে নয়, আমাকে ফোন করবে তুমি। সবদিক থেকে নিরাপদ হবে সেটা। কাল সন্ধে সাতটায় জেসমিন জিরো-জিরো-ফাইভ-ওয়ানে অপেক্ষা করব আমি। ঠিক আছে?'

'টাকা নিয়ে আসবে তুমি?' জানতে চাইল স্যানডোরা।

'ওয়াট যদি দেয়।'

খানিক ইতস্তত করে মেয়েটা বলল, 'ঠিক আছে।'

'এক মিনিট,' বলল রানা, 'ওয়েন প্যাকার কি প্যারিসে আছেন?'

'গুড নাইট,' বলল স্যানডোরা। আয়নার পিছনে মৃদু শব্দে একটা দরজা বন্ধ হলো, পরিষ্কার শুনল রানা।

আয়না থেকে চোখ নামিয়ে কার্পেটের ওপর দৃষ্টি ফেলল রানা। ভাবছে। হাড়-কিপটে ওয়াট, টাকা দিতে রাজি হবে বলে মনে হয় না; কিন্তু ওয়েন প্যাকারকে যদি তার টেবিলের সামনে নিয়ে এসে হাজির করা যায়, পাঁচ লাখ ডলার দিতেও আপত্তি করবে না সে।

ব্যাপারটা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। ব্যাপারটার সাথে জড়িয়ে পড়েছে ও। স্যানডোরার প্রস্তাব যদি ধাপ্পাও হয়, আশরাফের খুনের মীমাংসা করার জন্যে হলেও এই ঘটনার ভেতর ঢুকতে হবে ওকে। আর স্যানডোরার প্রস্তাব যদি ধাপ্পা না হয়, সত্যিই যদি সাহায্য দরকার হয় ওয়েন প্যাকারের, অন্তত মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে সাহায্য করা ওর একটা কর্তব্য। আসলেই কি

বেঈমানী করেছিলেন প্যাকার? কে জানে, চার বছর পর এখন হয়তো এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যাবে। পিছন থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল রানা।

আয়নায় চোখ পড়তেই দেখল, হাতে রিভলভার নিয়ে ঘরে ঢুকছে একজন। তার পিছু পিছু আরেকজন।

'গর্দভ!' বিড়বিড় করে নিজেকে তিরস্কার করল রানা।

পাঁচ

ছায়ার মত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ওরা বন্ধ করে দিল দরজা।

পিস্তলের দিকে উড়ে যাবার জন্যে রানার ডান হাত নিশপিশ করতে লাগল, কিন্তু বেকায়দা অবস্থায় বসে আছে বলে একচুল নড়ার সাহস হলো না ওর। ওদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ও, তাছাড়া রিভলভারে ফিট করা সাইলেন্সারটা ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে উঠল ওর, বুঝল, সম্ভবত এরাই টরচার করে খুন করেছে আশরাফকে।

'কোথায় মেয়েটা?' ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল চ্যাপম্যান। আয়নায় রানার চোখে চোখ রেখেছে সে, হিংস্র চোখ, কপালে চকচক করছে ঘাম।

ভয়ে এমন অস্থির হয়ে আছে চ্যাপম্যান, গলার আওয়াজ আয়ত্তে রাখতে পারছে না। এই প্রথম কার্ল হফারের একটা কাজে ব্যর্থ হয়েছে সে। কার্ল হফার বারবার নিষেধ করে দিয়েছেন, রানা যেন মেয়েটার সাথে কথা বলতে না পারে। যেভাবেই হোক ক্লাবে ঢুকে মেয়েটার সাথে কথা বলেছে রানা, কার্ল হফার এর জন্যে তাকে দায়ী করবেন। কাজে কেউ ব্যর্থ হলে তাকে ঘৃণা করেন তিনি, আর তাঁর ঘৃণার পাত্র হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক শান্তির।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা। মন বলছে, মৃত্যু আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। 'চলে গেছে,' বলার সময় শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ল ওর। 'প্রায় দশ মিনিট আগে।'

ঘাড় ফিরিয়ে মুহূর্তের জন্যে জ্যাসনের দিকে তাকাল চ্যাপম্যান। 'একে শেষ করেই আসছি আমি, তুমি দেখো মেয়েটাকে আটকাতে পারো কিনা।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন জানো তোমরা?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি জানি না। কথা বলার সময় আমাদের মাঝখানে ওই ট্রিক মিরর ছিল। খুন করবে? কেন? ভেবে দেখেছ, বেঁচে থাকলে আমি হয়তো তোমাদের সাহায্যে আসতে পারব?' এই সঙ্কটের মধ্যেও জ্যাসনের হাবভাব দেখে ক্ষীণ একটু স্বস্তি বোধ করল ও, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, চ্যাপম্যানের হুকুম পেয়েও নড়ার কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে।

'গেলে না?' খেঁকিয়ে উঠল চ্যাপম্যান। রানার মাথার দিকে রিভলভার তুলে লক্ষ্যস্থির করল সে।

গুলি যদি হয়, বাঁচার কোন আশা নেই, তবু শেষ চেষ্টার জন্যে তৈরি হয়ে গেল রানা। তীক্ষ্ণ চোখে চ্যাপম্যানের ট্রিগার ধরা আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে ও। তার আঙুলের ডগা সাদা হয়ে উঠেছে। ডিভান থেকে লাফ দিয়ে কার্পেটে পড়তে যাবে ও, দেখল, বিদ্যুৎ গতিতে চ্যাপম্যানের রিভলভার ধরা হাতে সাপের মত ছোবল মারল জ্যাসন। ঢুপ করে আওয়াজ হলো, রানার পায়ের কাছে কার্পেটে তৈরি হলো ছোট একটা গর্ত।

চ্যাপম্যানের রিভলভার ধরা হাতে আঘাত করেই নিজের রিভলভার বের করে ফেলেছে জ্যাসন। চ্যাপম্যান এবং রানা, দু'জনকেই কাভার করছে সে। তার চোখে ঠাণ্ডা পেশাদার দৃষ্টি দেখে নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, এই লোক ওই ছোকরার চেয়ে হাজার গুণ বেশি বিপজ্জনক।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি চ্যাপম্যান, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে জ্যাসনের দিকে। নিজের হাতে জ্যাসনের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল ও, পরমুহূর্তে টের পেল, তার রিভলভারটা নিয়ে গেছে সে।

চ্যাপম্যানের দিকে তাকালই না জ্যাসন। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে থাকল ঘরের ভেতর, অনেকক্ষণ। সাবধান হয়ে আছে রানা, এক চুল নড়ছে না। জ্যাসনের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল চ্যাপম্যান।

'এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে!' রাগে উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছে চ্যাপম্যান, গলাটাও কেঁপে গেল। 'বস্ বলেছেন রানাকে মেরে ফেলতে হবে। আমি ঠিক তাই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে বাধা দিয়েছ! এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে!'

অলস ভঙ্গিতে হাত তুলে টেলিফোনটা চ্যাপম্যানকে দেখাল জ্যাসন। শান্ত সুরে বলল, 'রিঙ করো ওকে। কি ঘটেছে বলো।'

'তোমার কথায়?' মারমুখো হয়ে জানতে চাইল চ্যাপম্যান। 'বস্ সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছেন আমাকে। আমার সময়মত তাঁকে আমি রিপোর্ট করব।' গলাটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে সে। 'আজ যা করলে তুমি, এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে, জ্যাসন! তুমি একটা রাম গর্দভ! দেখতে পাচ্ছ না, আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি?'

ঘামের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল রানা, গলা থেকে পাঁজর বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

'এখনও সময় আছে!' জরুরী আবেদনের সুরে আবার বলল চ্যাপম্যান। 'এখন যদি ওকে আমরা খুন করি, কেউ জানবে না! মারো ওকে! গুলি করো! তুমি না পারো রিভলভারটা আমাকে দাও!' জ্যাসনের দিকে এক পা এগোল সে। 'বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকো না! রিভলভারটা দাও!'

'এগোলে কোন লাভ হবে না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল জ্যাসন। 'আমরা ভুল করেছি মানে?' নির্দয় হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। 'আমরা নই, তুমি। তুমি ভুল করেছ। তোমার প্রথম ভুল, নিগেল। যাও, বলো ওকে! বলো, আপনার কথামত কাজ করতে পারিনি, স্যার। তোমার ধারণা, তোমাকে ভালবাসে—শুনে হয়তো রাগ তো করবেই না, কাছে টেনে চুমো খাবে।'

বোকা বোকা হয়ে গেল চ্যাপম্যানের চেহারা। একদৃষ্টে জ্যাসনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঘাড় ফিরিয়ে টেলিফোনটা দেখল।

চ্যাপম্যানের দিকে নয়, সারাক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাসন। রানা জানে, ওকে ক্ষীণ একটু নড়তে দেখলেও গুলি করবে লোকটা।

'এই যে অকারণে দেরি করছ, এটাকেও অপরাধ বলে মনে করবে বস্,' বলল জ্যাসন।

গুটি গুটি টেলিফোনের দিকে এগোল চ্যাপম্যান। ডিভানের কাছাকাছি একটা টেবিল, টেলিফোনটা তার ওপর। রানা না তাকিয়েও টের পেল ওর ডান পাশে, তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে চ্যাপম্যান। সেদিকে তাকাল না ও, কিন্তু বলল, 'ক্লাবের সুইচবোর্ড হয়ে বাইরে যাবে কলটা। মাথাব্যথাটা তোমাদের, তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের কথা মেয়েটা শুনবে।'

রানার ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল। আয়নায় দেখল, তীক্ষ্ণ চোখে ওর মাথার পিছনে তাকিয়ে আছে জ্যাসন। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল ও। টেলিফোন থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চ্যাপম্যানও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'এতটা বাহাদুরি কি না দেখালেই নয়?' বলল রানা। 'একটা চুক্তিতে আসতে রাজি আছি আমি। তোমরা বুঝছ না, কিন্তু তোমাদের বস্ নিশ্চয়ই বুঝবেন। ঘটনা এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে, তোমাদের উপকার করে আমি কিছু টাকা কামাতে পারব। টাকার আমার খুব দরকারও। ছোট একটা মিথ্যে কথা বলে তোমাদেরকে আমি বাঁচিয়েও দিতে পারি। এখানে আমি যেভাবেই পৌঁছে থাকি, দোষটা তোমাদের ঘাড়ে চাপবে না। এসো, টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলি ব্যাপারটা।'

চ্যাপম্যানের পেশীতে ঢিল পড়তে দেখল রানা। আয়নায় চোখ রেখে তাকাল জ্যাসনের দিকে। বিপজ্জনক লোকটাকে একটু চিন্তিত দেখাল। ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার হলো রানার মনে।

'আমি একটা গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের মালিক,' আবার বলল রানা, 'কিন্তু আমার সব রোজগার হালাল, এ-কথা বলতে পারি না। অসৎ পথে রোজগার করার সুযোগে যদি ছেড়ে দিই, উপোস থাকতে হবে। ওই কাজটা আমি পারি না। পেটে কিছু না থাকলে মাথায় রক্ত চড়ে যায় আমার। আমি জানি, তোমাদেরও ঠিক তাই হয়। তাহলেই দেখো, তোমাদের সাথে আমার তেমন কোন পার্থক্য নেই।' এক সেকেন্ড থামল রানা, তারপর আবার শুরু করল, 'যেখান থেকে টেলিফোন করতে পারবে, তোমাদের সাথে সেখানে যেতে রাজি আছি আমি। খোদার কসম, আমার কোন কুমতলব নেই। আমি শুধু চাই, তোমাদের বস্‌কে ফোন করে বলো, আমি তার সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছুতে রাজি আছি। এই মেয়েটার সাথে কাল ডেট আছে আমার, আমি ছাড়া আর কারও সাথে দেখা করবে না সে। এটাও জানাও তোমাদের বস্‌কে।'

তবু নড়ল না ওরা কেউ।

'শোল্ডার হোলস্টারে আমার পিস্তল রয়েছে,' বলল রানা। 'ইচ্ছে করলে ওটা তোমাদের জিম্মায় রাখতে পারো।'

এতে অন্তত নড়ানো গেল ওদেরকে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে ওর সামনে

এসে দাঁড়াল চ্যাপম্যান। পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল রানা, কোটের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে নিল সে। মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে দাঁড়াল ও, ওর কাছে আর কোন অস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করল চ্যাপম্যান। তারপর পিছিয়ে গেল।

জ্যাসনের দিকে তাকাল চ্যাপম্যান, মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন।

'তাই চলো যাই,' বলল জ্যাসন। তাকাল রানার দিকে। 'দেখতেই পাচ্ছ, সাইলেন্সার লাগানো গান এটা। কোন পাঁয়তাড়া কষার চেষ্টা করলেই মারা পড়বে।'

'চোখ রাঙাবার দরকার নেই,' বলল রানা, হাত দুটো শরীরের পাশে নামিয়ে আনল ও। 'তোমাদের হয়ে কাজ করব, এটা আমারই প্রস্তাব। ভাল পয়সা পেলে কোন কিছুতেই আপত্তি নেই আমার।'

রানাকে মাঝখানে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। জ্যাসনের কোটের ভেতর থেকে রিভলভারটা ঠেকে আছে রানার শিরদাঁড়ায়। সরু করিডর থেকে চওড়া করিডরে এল ওরা, নাচ-গানের আসর আগের চেয়েও জমে উঠেছে। হলঘরের স্টেজে একটা লালচুলো মেয়েকে দেখা গেল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। খুদে একটা বাথটাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে মস্ত স্পঞ্জ। সেটা দিয়ে শরীরের লজ্জা ঢাকার ভান করছে।

রানাকে দেখে একগাল হাসল ডোরম্যান। 'আশাকরি আমাদের শো উপভোগ করেছেন, মঁশিয়ে!'

'খুব,' চোখ মটকে বলল রানা, তারপর পিঠে রিভলভারের খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে এল ক্লাব থেকে। সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠল ওরা।

লবিতে পৌঁছে জ্যাসন বলল, 'থামো।'

জ্যাসনের নির্দেশ পেয়ে লবি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল চ্যাপম্যান। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল জ্যাসন, তারপর রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ফুটপাথে লোকজনের ভিড় আরও বেড়েছে। ভিড় ঠেলে কালো সিট্রনের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। পিছনের সীটে উঠতে বলা হলো রানাকে, ওর পিছু পিছু উঠল জ্যাসন। সামনের সীটে আগেই উঠে বসেছে চ্যাপম্যান, তার পাশে ড্রাইভিং সীটে বসে আছে হতভম্ব ফচেট।

'এই রাস্তার শেষ মাথায় একটা কাফে আছে,' বলল রানা, সেখানে অটোমেটিক টেলিফোন পাব আমরা।

আঘাতটা আসতে দেখে সরে যেতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। জ্যাসন ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। চোয়ালে ঘুসি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল ও। হাতের রিভলভার ঘুরিয়ে নিল জ্যাসন, বাঁট দিয়ে রানার ঘাড়ের পিছনে ধাঁই করে বসিয়ে দিল আরেক ঘা।

'ও আর কোন ঝামেলা করবে না,' বলল জ্যাসন। 'আমার বাসায় চলো, ফচেট।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে দ্রুত জানতে চাইল ফচেট, 'এসবের মানে কি? মেয়েটা কোথায়?'

'শাট আপ!' খেঁকিয়ে উঠল চ্যাপম্যান।

অবাক দৃষ্টি মেলে তাকে একবার দেখল ফচেট, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন দিল রাস্তার দিকে।

সীটের ওপর কুঁকড়ে বসে আছে চ্যাপম্যান, উইন্ডশীল্ড ভেদ করে রাস্তার ওপর পড়ে আছে দৃষ্টি, কিন্তু কিছুই দেখছে না সে। অনেকদিন ধরেই তার খুঁতখুঁতে মনে অস্পষ্ট একটা সন্দেহ ছিল, জ্যাসন বোধহয় তাকে ঘৃণা করে। সন্দেহটা আজ যে শুধু সত্যি প্রমাণিত হলো তাই নয়, নগ্ন চেহারা নিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল ঘৃণাটা। এখন থেকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তাকে। কার্ল হফারের কথা মনে পড়ল তার, কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। রানাকে মেয়েটার সাথে কথা বলতে দিয়েছে সে, এ-কথা জানার পর তাকে নিয়ে কি করবেন তিনি?

বাঁক নিয়ে সরু একটা রাস্তায় ঢুকল সিট্রন, এই রাস্তার এই একটাই মুখ। একটা কনফেকশনারি দোকানের নিচে, বেসমেন্টে তিন কামরার ভাড়াটে জ্যাসন। তার জন্যে এই জায়গাটা খুব সুবিধের। রাত আটটার পর দোকান বন্ধ হয়ে গেলে নির্জন হয়ে যায় গলিটা।

ধরাধরি করে অচেতন রানাকে নামানো হলো গাড়ি থেকে। জ্যাসন আর ফচেটকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল না চ্যাপম্যান। সিঁড়ি বেয়ে বেসমেন্টে নেমে এল ওরা। জ্যাসনের বসবার ঘরে কার্পেটে শুইয়ে দেয়া হলো রানাকে। ঘরে সোফা, টিভি, ডেক, শোকেস, ডিভান, ওয়াল ক্লক, পেইন্টিং—কিছুরই অভাব নেই। সবার শেষে ভেতরে ঢুকল চ্যাপম্যান। সে-ই তালা লাগাল দরজায়।

জ্যাসনের বাড়িতে এই প্রথম এলো ফচেট। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল সে, চেহারা একটু ম্লান হয়ে গেল, বলল, 'বেশ আরামেই থাকো দেখছি!'

ফচেটের কথার উত্তরে কোন মন্তব্য না করে টেবিলের দিকে এগোল জ্যাসন।

জ্যাসন ডায়াল ঘুরিয়ে অপেক্ষা করছে, নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে আছে চ্যাপম্যান আর ফচেট।

'মি. হফার?' যোগাযোগ হতে জিজ্ঞেস করল জ্যাসন। ইঙ্গিতে চ্যাপম্যানকে কাছে ডাকল সে।

জ্যাসনের হাত থেকে রিসিভার নেয়ার সময় তলপেটে অদ্ভুত এক আলোড়ন অনুভব করল চ্যাপম্যান।

'বোকার মত কেমন চুপ করে আছে দেখো!' চাপা গলায় ধমক লাগাল জ্যাসন।

অপরপ্রান্ত থেকে কার্ল হফারের ভারি, মার্জিত কণ্ঠস্বর পেল চ্যাপম্যান, 'ইয়েস?'

'চ্যাপম্যান, স্যার। সব ঠিকঠাক মত ঘটেনি। লোকটাকে আমরা জ্যাসনের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। মেয়েটার সাথে ওর কথা হয়েছে।' কোন বিরতি ছাড়াই, এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সে। অপরপ্রান্তে চুপ করে আছে কার্ল হফার, অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসুস্থ করে তুলল চ্যাপম্যানকে। জুলফি থেকে থুতনির দাড়িতে নেমে আসছে ঘামের একটা ধারা।

'জ্যাসনের বাড়িতে মেয়েটা আছে, আসলে তুমি এই কথা বলতে চাইছ, তাই

না?' মৃদু, ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল কার্ল হফার।

'না, স্যার। মেয়েটা পালিয়েছে। আমরা এখানে মাসুদ রানাকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

কানের সাথে আরও জোরে রিসিভার চেপে ধরল চ্যাপম্যান, কিন্তু কোন আওয়াজ পেল না। খানিক পর কার্ল হফার বলল, 'আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি আসছি।'

রিসিভারটা আস্তে করে নামিয়ে রাখল চ্যাপম্যান। 'তিনি আসছেন,' বলল সে। কর্তৃত্ব ফিরে পাবার আশায় নির্দেশের সুরে আবার বলল, 'রানাকে ডিভানে তোলো।'

ফচেট বা জ্যাসন, দু'জনের কেউই নড়ল না। একটা কাঠের চেয়ারের হাতলে বসল জ্যাসন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে লাইটারের খোঁজে পকেট হাতড়াতে শুরু করল ফচেট।

অপমানে লাল হয়ে উঠল চ্যাপম্যানের চেহারা। 'কি বললাম আমি!'

'গলা নামাও, নিগেল' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল জ্যাসন। 'বলার কি দরকার, কাজটা তুমি নিজে করছ না কেন?'

নড়ে উঠল রানা, একটু গোঙাল, চোখ পিট পিট করে তাকাল ওদের দিকে। তাকিয়ে থাকল ওরা, কিন্তু কথা বলল না। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে বসার চেষ্টা করল রানা, এগিয়ে এসে ওর পাঁজর লক্ষ্য করে পা তুলল জ্যাসন।

খপ করে পা ধরেই মোচড় দিল রানা। দড়াম করে আছাড় খেলো জ্যাসন। আধশোয়া অবস্থা থেকে তার দিকে এগোবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পিছন থেকে ওর মাথার চুল খামচে ধরে ফচেট ওকে আটকাল।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল জ্যাসন, হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার। উল্টো করে ধরল সেটা, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে এগিয়ে এল। রানা আর তার মাঝখানে চলে এল চ্যাপম্যান। 'বস্ ওর সাথে কথা বলবেন,' বলল সে। 'এখন ওকে জখম করা চলবে না।'

উঠে বসল রানা। রক্তচক্ষু মেলে তাকাল জ্যাসনের দিকে। 'আমাকে দাঁড়াতে দাও, ওদেরকে নাক গলাতে বারণ করো, তারপর লাগতে এসো—দুশো ছ'টা হাড়ের সব ক'টা গুঁড়ো করে দেব।'

হাত ঝাপটা দিয়ে চ্যাপম্যানকে সরিয়ে দিল জ্যাসন, ছোট ছোট চোখে ঘৃণা আর খুনের নেশা, কিন্তু সামনে না এগিয়ে পিছিয়ে গেল সে, বসল চেয়ারের হাতলে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা, হাঁটার সময় একবার টলে উঠল শরীরটা, ডিভানে বসল ও।

হিপ পকেট থেকে চ্যাপ্টা আকৃতির ছোট ফ্লাস্ক বের করে ঢক ঢক করে দু'ঢোক ব্র্যান্ডি খেলো ফচেট, সেটা আবার পকেটে রেখে দিতে গিয়ে কি মনে করে তাকাল রানার দিকে। ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে। ফ্লাস্কটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'মনে হচ্ছে, দু'এক ঢোক তোমারও দরকার।'

হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্কটা নিল রানা। দু'ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে ফিরিয়ে দিল ফ্লাস্কটা।

'সিগারেট?' জিজ্ঞেস করল ফচেট।

মাথা নাড়ল রানা।

সবই লক্ষ করল চ্যাপম্যান। ফচেটকেও ভয় পেতে শুরু করল সে। ফচেট নিশ্চয়ই ভাবছে, তার বাদশাহী শেষ হয়ে গেছে, তা না হলে রানার সাথে এই ব্যবহার করছে কেন?

কথা বলছে না কেউ, ওদের তিনজনের কেউ নড়াচড়াও করছে না, শুধু একটা হাত তুলে ঘাড়ের পিছনটা ডলছে রানা। মাঝখানে আরেকবার ফ্লাস্ক বের করে ব্র্যান্ডি খেলো ফচেট। ইঙ্গিতে সাধল রানাকে, কিন্তু মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা।

রানার ওপর থেকে চোখ সরাল না জ্যাসন। তার ঠাণ্ডা চোখে খুনের নেশা। একটা সোফার হাতলে বসে আছে ফচেট, গোল মুখে গাম্ভীর্য। ছোট ছোট কুটিল চোখ দিয়ে মাঝে মধ্যে চ্যাপম্যানকে খুঁটিয়ে দেখছে সে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে উঠল চ্যাপম্যান, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে সরে গেল সবার কাছ থেকে, চেয়ারটা পেতে বসল তাতে।

এইভাবে কেটে গেল আরও তিন মিনিট। তারপর একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেল ওরা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চ্যাপম্যান, হন হন করে এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেলল দরজা। তারপর পিছিয়ে এসে পথ করে দিল, তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল কার্ল হফার। মোটা আঙুলের ফাঁকে চুরুট, নির্লিপ্ত চেহারা। চ্যাপম্যান, জ্যাসন, ফচেট—এদের কারও দিকে তাকাল না সে। শান্তভাবে হেঁটে এসে দাঁড়াল রানার সামনে।

কার্ল হফারকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। হালকা বাদামি রঙের দামী স্যুট পরে আছে সে, বাটন হোলে লাল গোলাপ। আরামে থাকার সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে লোকটার চেহারায়। চোখ দুটো ঠাণ্ডা, কিন্তু নিস্তেজ নয়—চোখে হাসি নিয়ে এই লোক জঘন্যতম কাজটিও করতে পারে অবলীলায়।

রুদ্ধশ্বাসে বলল চ্যাপম্যান, 'এই-ই মাসুদ রানা, স্যার।'

রানার চোখে চোখ রেখে কথা বলল কার্ল হফার, 'বেরিয়ে যাও তোমরা।'

কোন শব্দ না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন। দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কার্ল হফার, তারপর ধীর পায়ে পিছিয়ে এসে একটা সোফায় বসে মুখে চুরুট তুলল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকাল ঘরের চারদিকে। তারপর, যেন নিজেকে শুনিয়েই বলল, 'রোজগার এরা ভালই করে, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা!' ফিরে এসে দৃষ্টিটা আবার স্থির হলো রানার চোখে। 'আমি কার্ল হফার। আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি?'

কথা না বলে ঘাড়ের পিছনটা যেমন ডলছিল তেমনি ডলতে লাগল রানা।

'আপনার সম্পর্কে কিছু কিছু জানি আমি, মি. রানা,' আবার বলল কার্ল হফার। 'লোকমুখে যতটা জানা যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। ইনভেস্টিগেশন ফার্ম গড়ে তুলে নাম এবং টাকা, দুটোই বেশ কামিয়েছেন। শোনা যায়, ওপর মহলের সাথেও আপনার নাকি দহরম-মহরম আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে

বিপজ্জনক কাজে আপনার অভিজ্ঞতা কতটুকু, আদৌ আছে কিনা—এই তথ্য আমি জোগাড় করতে পারিনি। আমার বিচারে, মানে তুলনায়, আপনি কিছুই না, মি. রানা। এই কথাটাই আপনাকে আমি বোঝাতে চাইছি।'

রানা ভাবল, বোঝা যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারেনি কার্ল হফার। একদিক থেকে ভালই হবে সেটা। শত্রু তোমাকে ছোট ভাবলে নানা সুবিধে।

নিঃশব্দে হাসল রানা, বলল, 'খুদে চারাই তো একসময় মহীরুহ হয়ে ওঠে। আপনার মত একজন লোককে ঘর থেকে বের করে আনতে পেরেছি, এ-থেকেই কি প্রমাণ হয় না একেবারে ছোট্টটি নই আমি?'

'সব চারাই মহীরুহ হয় না,' মুচকি হেসে বলল কার্ল হফার। 'অনেক চারা অকালে মরে যায়।' হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল তাকে। 'আপনার ঘাড়ের ওই ব্যথার জন্যে আমি দুঃখিত, মি. রানা।'

'কাজের কথায় আসবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যদি বলি, আমার প্রথম কাজ হওয়া উচিত আপনাকে খুন করা?' তীক্ষ্ণ চোখে রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল কার্ল হফার।

'কিছু পাবার আশায় কিছু করে মানুষ,' অম্লান হেসে জানতে চাইল রানা, 'আমাকে খুন করে কি পাবেন বলে আশা করেন আপনি? তারচেয়ে আমার সাথে চুক্তিতে আসা কি আপনার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?'

'চুক্তি?'

'আমি আপনার কাজে লাগতে পারি,' বলল রানা। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে কৌশল খাটাতে হবে, সেটা কি ধরনের হবে আগেই ভেবে নিয়েছে ও।

'হয়তো,' বলল কার্ল হফার। খানিক চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'আমার সাথে হাত মেলানো ছাড়া আপনার আর কোন উপায়ও নেই, মি. রানা। আমি যদি বুঝতে পারি, আপনি আমার কোন উপকারে লাগবেন না, এই ঘর থেকে আপনাকে জ্যান্ত ফিরতে দেয়া সম্ভব নয়।'

'ভয় দেখাবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

সোফার দুই হাতলে হাত রাখল কার্ল হফার, ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। 'কাজের কথা শুরু হোক। মাদাম স্যানডোরার সাথে দেখা হয়েছে আপনার?'

'হয়েছে।'

'অথচ আমার লোকদের ওপর নির্দেশ ছিল, তার সাথে আপনার দেখা হতে দেয়া চলবে না!'

'ওরা ক্লাবটা সীল করার অনেক আগে থেকেই ওখানে লুকিয়ে ছিলাম আমি।' মিথ্যে কথা বলল রানা।

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কার্ল হফার, সেই একই দৃষ্টি রানাও ফিরিয়ে দিল তাকে। এক সময় কাঁধ ঝাঁকাল কার্ল হফার।

'মেয়েটা জানে, কোথায় আছে ওয়েন প্যাকার?'

'জানে।'

'আপনাকে বলেছে, কোথায়?'

মাথা নাড়ল রানা সেই সাথে ভুলের শাস্তি পেল। ঘাড় থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথাটা। মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে গেল মুখ। ঘাড়টা ডলতে শুরু করে বলল, 'এই তথ্যের জন্যে টাকা চায় সে। কাল রাতে আবার ওর সাথে দেখা হবে আমার।'

'কত?'

কোনরকম ইতস্তত না করে বলল রানা, 'এক লাখ ডলার। নগদ।'

কার্ল হফারের কপালে একটা ভাঁজ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, 'সন্দেহ নেই, মি. রানা, আপনি সত্যি সত্যি বাড়তে শুরু করেছেন।'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'আমি তো আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি!'

'তাহলে, এক লাখ ডলারের বিনিময়ে মেয়েটা আপনাকে জানাবে, ওয়েন প্যাকার কোথায় আছে? নাকি এর মধ্যে আর কোন শর্ত আছে?'

'আর কোন শর্ত নেই,' বলল রানা। 'নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে আমাকে ফোন করবে সে। সাথে টাকা আছে এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে, তারপর সে বলবে কোথায় আছে ওয়েন প্যাকার।'

আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরুটের দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল কার্ল হফার, 'এই এক লাখ ডলার কোত্থেকে পাবেন বলে আশা করছেন আপনি?'

'কেন, সীন ওয়াটের কাছ থেকে!' বলল রানা। 'তার সম্পর্কে আপনাকে নতুন করে কিছু জানাবার দরকার আছে কি?'

'ওয়াটকে জানি।' ভাবলেশহীন চেহারা কার্ল হফারের। 'কিন্তু আমি বলব, মি. রানা, ওই লোককে সাহায্য করার ইচ্ছে ত্যাগ করলে নিজের উপকার করবেন আপনি। আমি ওয়েন প্যাকারের খোঁজ পেতে চাই। এক লাখ ডলার, বলছেন? এ-থেকে নিজের জন্যে কত রাখবেন আপনি?'

দেঁতো হেসে বলল রানা, 'বিজনেস সিক্রেট।'

'আর ফি হিসেবে সীন ওয়াটের কাছ থেকে কত আদায় করবেন, জানতে পারি?'

'কত আদায় করতে পারব, বলা কঠিন,' বলল রানা। 'ওয়াট লোকটা হাড় কিপ্টে।'

'আমি যদি আপনাকে আরও এক লাখ ডলার দিই, শুধু আপনার ফি হিসেবে, কেমন হবে সেটা?' চুরুট থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল কার্ল হফার।

অবাক হওয়ার ভান করল রানা। একটু চিন্তা করল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'নিজেকে আমার সুখী আর ভাগ্যবান মনে হবে।'

'পাবেন।'

'কাল রাতে মেয়েটার সাথে কথা বলার সময় আমার কাছে থাকতে হবে টাকাটা,' বলল রানা, 'ওর এক লাখ ডলার দিন আমাকে। ফিরে এসে আপনাকে আমি জানাতে পারব, কোথায় আছে ওয়েন প্যাকার। আমার ফি নাহয় তখনই দেবেন।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা ধীরেসুস্থে ধরাল কার্ল হফার। চুরুটের শেষ মাথাটা লাল

ওয়ার্নিং সিগন্যালের মত জ্বলে উঠল। 'সব যদি এত সহজ হত, মি. রানা,' কথা বলার সময় তার মুখ থেকে নীলচে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল, 'জীবন আরও অনেক কম জটিল হত। প্যাকার কোথায় আছে সেটা জানাই যথেষ্ট নয়। আমি নিশ্চিত ভাবে জানতে চাইব, তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। জানতে চাইব, এই দুনিয়ায় সে আর নেই।'

'আপনার কথা আমি ঠিক...'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল কার্ল হফার। 'এক লাখ ডলার পাবেন আপনি, কিন্তু বিনিময়ে ওয়েন প্যাকারকে খুঁজে বের করার এবং খুঁজে বের করে খুন করার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে। শুধু তাই নয়, খুন করার আগে রাশিয়া থেকে যে ফাইলগুলো নিয়ে এসেছে সে, সেগুলো উদ্ধার করতে হবে আপনাকে। ওই ফাইলগুলো আমার হাতে আসা ওয়েন প্যাকারকে খুন করার মতই জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ।'

ঘাড়ের পিছনটা আবার ডলতে শুরু করল রানা। 'আমি বরং মেয়েটার সাথে কথা বলি আগে, তারপর এসব বিষয়ে আলাপ করা যাবে—আপনি কি বলেন?'

কার্পেটের ওপর পা দুটো লম্বা করে দিল কার্ল হফার, জুতোর ডগায় চোখ রেখে বলল, 'আপনি হয়তো আমাকে চিট করার কথা ভাবছেন। মেয়েটাকে দেবার জন্যে এক লাখ ডলার দিলাম আপনাকে, টাকাটা তাকে না দিয়ে আপনি প্যারিস থেকে কেটে পড়লেন। কিংবা আমার কাছ থেকেও টাকা নিলেন, আবার ওয়াটের কাছ থেকেও টাকা নিলেন, কিন্তু মেয়েটার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য আমাকে না দিয়ে দিলেন ওয়াটকে। আপনার ফার্ম এরই মধ্যে তার কাছ থেকে ফি হিসেবে দুই হাজার ডলার পেয়েছে, আপনি হয়তো তার প্রতিই বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করবেন।'

'আমার ওপর আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল রানা।

'বিশ্বাস আমি কাউকে করি না, মি. রানা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কার্ল হফার। 'বিশেষ করে টাকা দিয়ে। আপনাকে আমি এক লাখ ডলার দেব, ঠিক, কিন্তু সেই সাথে আপনার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থাও করব। আমাকে চিট করে বেঁচে আছে, এমন একটা লোক নেই। চিট করলে আপনিও থাকবেন না। যেখানেই লুকান, খুঁজে বের করা হবে।'

'এটা আমার ব্যবসা,' বলল রানা। 'আর সবার চেয়ে ভাল দাম দিচ্ছেন, কাজেই আপনিই হবেন আমার লক্ষ্মী খদ্দের। আপনাকে ঠকাতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'অন্তত একটা দুঃখ আপনার আছে, মি. রানা,' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল কার্ল হফার। 'আপনার সহকারী দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সেজন্যেই আপনাকে এক লাখ ডলার দেয়া হবে। আপনার ফি তো মাত্র দুই হাজার, বাকি টাকাটা ওই মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বলে ধরে নিতে হবে। ব্যাপারটাকে এইভাবে নিলে আপনার মনে আর কোন দুঃখ থাকার কথা নয়।'

চোখ নামিয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'এক লাখ ডলারের বিনিময়ে সব ভুলে যেতে রাজি আছি আমি।'

'ভেরি গুড। আমার ধারণা, প্যাকারকে খুঁজে বের করার জন্যে আপনিই যোগ্য ব্যক্তি। আর আপনি যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারেন, তাহলে তাকে খুন করার জন্যেও আপনিই হবেন সবচেয়ে উপযুক্ত। এই কাজের ফি এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে নগদ এক লাখ ডলার পাবেন আপনি। এখন বলুন, আপনি রাজি?'

'রাজি।'

মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল কার্ল হফার, কি যেন চিন্তা করল, তারপর প্রশ্ন করল, 'সবদিক ভেবেচিন্তে দেখে বলছেন তো, মি. রানা?'

'এর মধ্যে ভেবে-দেখার কিছু নেই। আমার টাকা দরকার।'

'ইচ্ছে করলে আমার অফার আপনি না-ও গ্রহণ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে,' বলল কার্ল হফার। 'কিন্তু একবার কথা দিলে আপনি আর পিছিয়ে যেতে পারবেন না।'

'জানি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল হফার। 'ভেরি গুড। কাল আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হবে টাকাটা। মেয়েটার সাথে দেখা করে আপনি জানবেন, কোথায় লুকিয়ে আছে প্যাকার। ওখান থেকে সোজা হিলটন হোটেলে এসে আমাকে বলবেন, কোথায় সে। তারপর আমরা দু'জনে বসে ঠিক করব কিভাবে তাকে সরানো যায়।'

'ঠিক আছে।'

রানার দিকে পিছন ফিরে দরজার দিকে এগোল কার্ল হফার। দরজার সামনে দাঁড়াল সে। বলল, 'কাল তাহলে সন্ধের দিকে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে, মি. রানা, হোটেল হিলটনে—আপনি কথা দিয়ে ফেলেছেন।'

'মনে আছে,' কার্ল হফারের চওড়া পিঠে চোখ রেখে বলল রানা।

'মন যেন না বদলায়,' দরজা খুলে বলল কার্ল হফার। 'তাহলে আপনাকে দুনিয়া বদলাতে হবে।' বলে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। আপনা থেকেই ধীরে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ছয়

মার্কিন দূতাবাসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সীন ওয়াট, হিমেল হাওয়া ঠেকাবার জন্যে কাঁধ দুটো একটু তুলে রেখেছে। তাকে দেখে পায়চারি থামিয়ে স্থির হয়ে গেল গেটের গার্ড, তারপর সসম্ভ্রমে স্যালুট করল। জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ওয়াট। গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাল সে, তারপর রাস্তা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল পিগট চারশো চারের সামনে। পার্ক করা গাড়িগুলোর কাছে একজন টহল পুলিসকে দেখা গেল, চিনতে পেরে সে-ও স্যালুট করল তাকে। দরজার তালা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ওয়াট, বোতাম টিপে সাইড লাইট জ্বালল। গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে সিলভার ওমেগায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

বাড়ি ফেরার তাগাদা নেই, তাই পাঁচটার পর আরও কয়েক ঘণ্টা কাজ করার বদ-অভ্যেস হয়ে গেছে তার। রোজকার মত আজও পিয়নকে দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ আর এক গ্লাস দুধ আনিয়ে খেয়েছে। রাতে তার আর কিছু না খেলেও চলবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে এই সংযম অনেকদিন থেকেই মেনে চলছে সে। সেজন্যেই আজও তার শরীরে মেদ জমতে শুরু করেনি। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেও দেখে চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশি মনে হয় না। স্ত্রীকে ডিভোর্স করেছে অনেক বছর হয়ে গেল, সেই থেকে একাই একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর তাকে নিয়ে এমন কি চিন্তাও করে না। কাজ পাগল মানুষ সে, কাজেই তার আনন্দ।

প্যারিসের মার্কিন দূতাবাসে আজ বিশ বছর ধরে কাজ করছে ওয়াট। ধীরে ধীরে উন্নতি করে অবশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটা দখলে এসেছে—সি.আই.এ.-র ফ্রেঞ্চ ডিভিশনের প্রধান কর্মকর্তা। পদটা পাবার পর প্রথম ক'বছর যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেয় সে, কিন্তু বছরখানেক থেকে তার মনে হচ্ছিল ওয়াশিংটন বোধহয় তার ওপর আগের মত খুশি নয়। চাকরির মেয়াদ শেষ হতে তিন বছর বাকি, মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফিরে যাবে সে, মেয়াদ বাড়াবার জন্যে বলবে না, এই রকম ভাবনা-চিন্তা করছিল। এই সময় ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো হলো জেমস ক্লিফকে। তাকে জানানো হলো, তার এজেন্ট আর কন্ট্যাক্ট নিয়ে আগের মতই কাজ করে যাবে সে, আর জেমস ক্লিফ ডিভিশনটাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে সুপারভাইজ করার দায়িত্ব নেবে।

প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও মনে মনে ওয়াট জানে, ওয়াশিংটন তার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে ক্লিফকে পাঠিয়েছে। তাকে ওরা আরও তিন বছর ফ্রেঞ্চ ডিভিশনের প্রধান হিসেবে রাখতে চায় না। ক্লিফকে পাঠানো হয়েছে একটা অজুহাত সৃষ্টির জন্যে, যাতে করে ওয়াশিংটন তাকে দেশে ডেকে নিয়ে যায়।

ক্লিফের কাজে নাক গলাবার ব্যাপারে আশরাফ যে-কথাটা বলেছিল, সেটা সত্যি। টেলিফোন বা ডাকযোগে যা-কিছু আসে দূতাবাসে, তার মধ্যে যেগুলোকে সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়, সব নিজের কাছে রেখে দেয় ওয়াট। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন তার একমাত্র আশা, বড় ধরনের কোন একটা কাজে সাফল্য দেখিয়ে ওয়াশিংটনকে খুশি করে তোলা, তাহলে হয়তো ক্লিফকে ফিরিয়ে নিয়ে বাকি তিন বছর তাকে নিশ্চিন্তে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হবে।

অ্যাভিনিউ বসকিউ-এ পৌঁছে গেল ওয়াটের পিগট। সরু একটা গলিতে তার অ্যাপার্টমেন্ট, গাড়ি ঢোকে না। পার্ক করার জায়গা খুঁজতে বেশ কয়েক মিনিট বেরিয়ে গেল। রোজ রাতেই এই ঝামেলা পোহাতে হয় তাকে। গলির মুখে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল সে, লবিতে ঢুকে দেখল বুড়ো কেয়ারটেকার খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। ওয়াটের কাছ থেকে প্রতিমাসে মোটা বকশিশ পায় সে।

এলিভেটরে চড়ল ওয়াট। পাঁচতলায় পৌঁছে তালা খুলে ঢুকল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। দরজা বন্ধ করল। হালকা ওভারকোট খুলে ঝুলিয়ে রাখল হল

কুজিটে। তারপর কয়েকটা সুইচ অন করে ঢুকল লিভিং রুমে। বেশ বড় একটা কামরা এটা, দামী আর আরামপ্রদ ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। ডেস্কের পিছনে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল সে, পকেট থেকে চাবি বের করে দেরাজ খুলল। কাগজের মোটা একটা তাড়া বের করতে যাবে, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

মাথা তুলল ওয়াট, কুঁচকে উঠেছে ভুরু। খানিক ইতস্তত করে রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল সে।

'মি. ওয়াট?' একটি মেয়ে জানতে চাইল।

'ইয়েস।'

'পাপিতা। আপনি বাড়ি ফিরেছেন কিনা জেনে নিলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি আমি।'

'ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে দিল ওয়াট।

ডেস্কের দুধ-সাদা ব্লটারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল সে। দু'মিনিট পর দেরাজ বন্ধ করে তালা লাগাল। উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্ক ঘুরে চলে এল বড় একটা ইজি-চেয়ারের সামনে। ঈগলের মত ধারাল চেহারায় চিন্তার ভাব ফুটে আছে। চকচকে কাঁচের পিছনে চোখ জোড়ায় একটু অস্বস্তির ভাব। ইজি-চেয়ারে বসে নিচু টেবিল থেকে নিউ ইয়র্কার-টা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। পাতা খুলছে, কিন্তু কোন লেখাতেই মন নেই। সবগুলো পাতা উল্টে আবার প্রথম থেকে শুরু করল।

সময় আর কাটতে চায় না। একটা লেখায় মন বসাবার চেষ্টা করল। পড়ল, কিন্তু পড়া শেষ হতে কি পড়েছে মনে করতে পারল না। চোখ বুলাল ওমেগায়। পাপিতা ফোন করার পর আধ ঘন্টা হয়েছে।

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওয়াট। স্পাই হোলে চোখ রেখে প্রথমে দেখে নিল কে এসেছে, তারপর তালা খুলল। দরজা খুলে ধরতেই দ্রুত হলে ঢুকল পাপিতা।

দরজা বন্ধ করে ফিরল ওয়াট, দেখল, ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে পাপিতা, ব্যস্ত হাতে খুলছে হাতের দস্তানা। দস্তানা থেকে মুখ তুলে মৃদু হাসল সে। পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে বয়স হবে তার, মাঝারি গড়ন, সুন্দর নাক-চোখ, একবার তাকিয়েই রূপসী বলা যায়। চোখ দুটো বড় বড়, মণি দুটো ঘন কালো। দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গ মেশানো ভাব আছে, সেটা তার চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আভিজাত্য এনে দিয়েছে। এটা বেশিরভাগ পুরুষকে তীব্র আকর্ষণ করে, কিন্তু ওয়াটকে করে না। অনেক দিন আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে, মেয়েরা শুধু বিপজ্জনক নয়, ন্যুইসেন্সও বটে। মেয়েদের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে না সে, কিন্তু এদের যে প্রয়োজন আছে এই বাস্তবতাও মেনে নিয়েছে।

পাপিতাকে পাশ কাটিয়ে লিভিং রুমের দিকে পা বাড়াল ওয়াট। 'এসো।' পিছনে পাপিতার পায়ের আওয়াজ পেল সে। 'এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে আমার। খুব বেশি সময় দিতে পারব না তোমাকে। কি মনে করে এসেছ বলো দেখি?'

লিভিং রুমে ঢুকে কোট খুলে একটা চেয়ারের পিঠে রাখল পাপিতা। সোফায়

বসে স্কার্টের কিনারা টেনে সুন্দর হাঁটু জোড়া ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'আশরাফ চৌধুরীকে আপনি কোন কাজ দিয়েছেন?'

এই রকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না ওয়াট, মুহূর্তের জন্যে নির্লিপ্ত ভাবটা খসে পড়ল চেহারা থেকে।

ওয়াটের চেহারায় ভাবের এই পরিবর্তন লক্ষ করল পাপিতা। পুরুষ মানুষের ভাব পরিবর্তন খুঁটিয়ে লক্ষ করে সে সবসময়।

'কিজন্যে জানতে চাইছ?' ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করল ওয়াট।

'আমি আপনার কাজ করি, কাজেই আমার সাথে কথা বলার সময় এতটা সতর্ক না হলেও চলে আপনার!' পাপিতার গলার সুরে একটু ব্যস্ততা, একটু ঝাঁঝ, একটু অভিমান। 'আমি আপনাকে সাধারণ একটা প্রশ্ন করেছি—আশরাফ চৌধুরী আজ রাতে আপনার হয়ে কোন কাজ করছে কিনা।'

পাপিতার মুখের দিকে চোখ রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল ওয়াট। অতীতে অনেক কাজে তাকে সাহায্য করেছে মেয়েটা। এখন ওকে দেখে মনে হলো, আশরাফকে কাজটা বুঝিয়ে দেবার আগে ওর সাথে পরামর্শ করে নিলে মন্দ হত না। মাদাম স্যানডোরা মেয়েমানুষ, তার কাছে আরেকজন মেয়েমানুষকেই পাঠানো উচিত ছিল। 'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে জবাব দিল সে। তারপর সিগারেট ধরাল।

'গুরুত্বপূর্ণ?'

'হতে পারে। এখনও ঠিক জানি না।'

দামী একটা হ্যান্ডব্যাগ খুলল পাপিতা, ভেতর থেকে সোনালি সিগারেট কেস বের করল। 'ব্যাপারটা কি নিয়ে, জানতে পারি, মি. ওয়াট?' সোনালি লাইটার দিয়ে ফিলটার টিপ সিগারেট ধরাল সে। নড়েচড়ে বসে মন দিয়ে তাকাল ওয়াটের দিকে।

ইতস্তত করল ওয়াট। 'এসবের মানে কি, পাপিতা? তুমি জানতে চাইছ কেন?'

নাকের ছোট ছোট ফুটো দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল পাপিতা। মৃদু হাসল একটু। 'ঠিক আছে,' বলল সে। স্কার্টের কিনারা দিয়ে আবার চেষ্টা করল হাঁটু ঢাকার। 'আপনি যদি ঠিক করে থাকেন মুখের সেলাই খুলবেন না, আপনার কাজে ডিসটার্ব না করে আমার ফিরে যাওয়া উচিত।'

কিন্তু পাপিতার মধ্যে ওঠার কোন লক্ষণ না দেখে ওয়াট বলল, 'তুমি জানো, তোমার ওপর আমি ভরসা করি, পাপিতা। তোমার কাছে কোন খবর আছে, তাই না? কি সেটা?'

অসহায় ভঙ্গি করে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল পাপিতা, সিগারেটের ছাই ঝাড়ল কার্পেটে, বলল, 'তাহলে বলেই ফেলি। আজ সন্ধের খানিক পর রাস্তায় আশরাফ চৌধুরীকে দেখলাম। একটা অল্প-বয়েসী ছেলে তাকে ফলো করছিল। থুতনির কাছে একটু দাড়ি আছে ছেলেটার। আশরাফের সামনেও ছিল আরেকজন। কিন্তু পিছনের ছেলেটাকে দেখতে পেলেও সামনেরটাকে খেয়াল করেনি আশরাফ। একসময়ে তাকে খসিয়ে দেয় সে। তখন তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি, তাই চলে

যেতে দিই ওদেরকে। কিন্তু পরে আমার মনে হলো, ওই দাড়ি আমি আগেও কোথাও দেখেছি। একটু চেষ্টা করতেই স্মরণ হলো, ছেলেটা কার্ল হফারের কাজ করে। চ্যাপম্যান, নিগেল চ্যাপম্যান ওর নাম।'

সোফার কিনারায় সরে এল ওয়াট। 'তুমি ঠিক জানো?'

বেজার দেখাল পাপিতাকে। 'অ্যাদ্দিন পর এই প্রশ্ন! না জেনে কবে কথা বলেছি আমি?'

'বেশ। তারপর?'

'জানি আশরাফ চৌধুরীকে দিয়ে আপনি কাজ করান, তাই চিন্তা হলো। একটা ক্লাবে যাওয়ার কথা ছিল, প্রোগ্রামটা বাতিল করে দিলাম। হিলটন হোটেলে পৌঁছে দেখি, বারে বসে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে কার্ল হফার। চ্যাপম্যান এল, হফারের সাথে কথা হলো তার, তারপর চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরল সে, এবার কথা বলল টেলিফোনে। ইতিমধ্যে আমার কৌতূহল তুঙ্গে উঠেছে, ওখান থেকে বেরিয়ে এসে টেলিফোন করলাম আশরাফ চৌধুরীর ফ্ল্যাটে। কিন্তু রিসিভার ধরল না কেউ। তাই ফোন করে চলে এলাম আপনার কাছে।'

'ফোন করে পাওনি আশরাফকে?' মনে মনে ঘাবড়ে গেল ওয়াট। আশরাফের ফ্লাইট সাড়ে এগারোটায়, জানে সে। এগারোটার আগে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হবার কথা নয় তার।

'না।'

নাক থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে কাঁচ দুটো মুছল সে। চেহারায় উদ্বেগ ফুটে আছে। বেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকল পাপিতা।

'তুমি আমাকে একটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলে, পাপিতা,' মুখ তুলে বলল ওয়াট।

'ব্যাপারটা কি নিয়ে, বলা যাবে আমাকে?'

'আজ সকালে একটা মেয়ে আমাকে টেলিফোন করে,' চশমা পরে বলল ওয়াট। নিজের পরিচয় দিল মাদাম স্যানডোরা বলে। বলল, 'একটা ইনফরমেশন বিক্রি করতে চায়।'

'কি ইনফরমেশন?' জানতে চাইল পাপিতা। 'মানে, জানিয়েছে কি ধরনের ইনফরমেশন?'

উত্তর না দিয়ে বলে চলল ওয়াট, 'এ-ধরনের ফোন-কল প্রায়ই পাই আমরা, ইনফরমেশন দিতে চায়। বেশিরভাগ ফালতু বা ধাপ্পা। এটাকেও আমি ওই ধরনের মনে করেছিলাম। মেয়েটা বলল, টেলিফোনে বেশি কথা বলতে চায় না সে, আমার সাথে কোথাও দেখা করতে চায়। থার্ড ক্লাস একটা ক্লাবের কথা বলল, আজ রাত এগারোটার সময় ওখানে থাকবে সে। আমি বললাম, ইনফরমেশনটা কি ধরনের তা না জেনে আমি তার সাথে দেখা করতে পারি না। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছুর আভাস দিয়ে কানেকশন কেটে দিল সে।'

'তারপর?'

'তারপর রানা এজেন্সির আশরাফ চৌধুরীকে ডেকে কাজটা বুঝিয়ে দিলাম।'

'কখন রিপোর্ট করবে সে?' জানতে চাইল পাপিতা।

'কাজটা আশরাফ নিজে করছে না। তার অফিসের আর কাউকে দিয়ে করাবে। যে-কোন মুহূর্তে টেলিফোন পাব বলে আশা করছি আমি।'

'কে সে? মেয়েটার সাথে কে দেখা করতে গেছে?'

'বললাম তো, ওদের অফিসের কোন লোক।'

'লোকটা কে, আপনি জানেন না?'

নাক থেকে চশমা নামিয়ে আবার রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছতে শুরু করল ওয়াট। 'না।'

'মেয়েটার সাথে কখন দেখা করছে লোকটা?'

'এগারোটায়।'

ছোট্ট হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল পাপিতা। পৌনে এগারোটা বাজে। 'আমি মনে করি আপনার অপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছে না,' মুখ তুলে বলল সে। 'এর মধ্যে যদি হফার থাকে, বিপদ হতে পারে।'

ওয়াটও তাই ভাবল। সোফা ছেড়ে ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল আশরাফের নাম্বারে। খানিক পর ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে এল পাপিতার সামনে। 'আশরাফ চৌধুরী নেই।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

তারপর ওয়াট বলল, 'কি একটা কাজে সাড়ে এগারোটার ফ্লাইটে নিস-এ যাবে আশরাফ চৌধুরী, ওকে হয়তো এয়ারপোর্টে পাব।' বলে আবার ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

পাঁচ মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রেখে পাপিতার দিকে ফিরল আবার, বলল, 'এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে নেই সে।'

'হয়তো বাড়িতেই আছে,' ফিসফিস করে বলল পাপিতা।

কথাটা বলে কি বোঝাতে চাইল পাপিতা, জানে ওয়াট।

'আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না,' আবার বলল পাপিতা। 'গিয়ে একবার দেখে আসা উচিত আমাদের।'

এক সেকেন্ড পর সায় দিল ওয়াট, 'ঠিক।' আবার ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। দেরাজের তালা খুলে একটা পয়েন্ট থারটি এইট অটোমেটিক বের করল। দক্ষ হাতে চেক করল সেটা, তারপর ভরল হিপ পকেটে।

বিশ মিনিট পর আশরাফ চৌধুরীর ফ্ল্যাটের সামনে নামল ওরা গাড়ি থেকে।

হাত তুলে ডোরবেলের বোতাম ছুঁতে যাবে ওয়াট, দেখল সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে দরজার কবাট। হিপ পকেট থেকে বের করে পিস্তলটা ওভারকোটের পকেটে ভরল সে, অপর হাত দিয়ে আস্তে করে ঠেলে কবাট জোড়া সম্পূর্ণ খুলে ফেলে ঢুকল। পিছনেই থাকল পাপিতা। সিটিং রুমে আলো জ্বলছে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল ওয়াট। আশরাফের লাশ দেখে আঁতকে না উঠলেও, শক্ত হয়ে গেল শরীর, তার পিঠে একটা হাত থাকায় সেটা টের পেল পাপিতা।

'দরজা বন্ধ করো,' মৃদু গলায় বলল ওয়াট। 'ও আছে…কিন্তু বেঁচে নেই।'

পাপিতার চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে

গিয়ে সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। সিটিং রুমে ঢুকে দেখল, ভেলভেটের ওপর পড়ে থাকা আশরাফের লাশ পরীক্ষা করছে ওয়াট। লাশের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল সে, বমি বমি একটা ভাব অনুভব করল গলার কাছে। 'ওর হাতটা দেখেছেন।' কাঁপা গলায় বলল সে।

বিড় বিড় করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল ওয়াট, ঠিক বোঝা গেল না—'নিষ্ঠুর' বা 'বেজন্মা' এই ধরনের কিছু হবে। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিক পরীক্ষা করছে পাপিতা, তার পাশে এসে দাঁড়াল সে।

'রুমটা ওরা সার্চ করেছে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল পাপিতা। 'খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল ওরা। মেরেধরে কথা আদায় করেছে, খুন করেছে, তারপর পালিয়েছে।'

'চলো, যাই,' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল ওয়াট। 'এখানে ধরা পড়তে চাই না।'

যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

ওয়াটের গাড়িতে উঠে পাপিতা বলল, 'এটা ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়, মি. ওয়াট। কাজটা রানা এজেন্সিকে দিয়ে আপনি ভুল করেছেন, একথা আমি বলতে চাই না। তবে মেয়েটার সাথে আপনি নিজে দেখা করলে ভাল করতেন।'

'এই ধরনের টেলিফোন কল রোজই দু'একটা আসে,' আত্মরক্ষার সুরে বলল ওয়াট। 'কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে বুঝব কিভাবে?'

'ক্লাবটা কোথায়?'

'বুল' ক্লিশি-তে।'

'ওখানে যাব আমরা।'

পাপিতার দিকে ফিরল ওয়াট। 'অনেক রাত হয়ে যাবে। সাড়ে এগারোটা বাজে।'

'তা হোক। যাওয়াটা দরকার,' বলল পাপিতা। 'তাড়াতাড়ি করুন!' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ওয়াট। বলে চলল পাপিতা, 'এ হফারের কাজ না হয়েই যায় না। খুব বড় ধরনের কিছু একটা না হলে, আশরাফকে খুন করত না সে। আপনার কি কোন ধারণাই নেই মেয়েটার সাথে দেখা করার জন্যে কাকে পাঠিয়েছিল আশরাফ চৌধুরী? ওদের সবাইকেই তো আপনার চেনার কথা।'

'রানা এজেন্সি আমাদের শত্রু নয়, মিত্র,' বলল ওয়াট। 'সময় নষ্ট মনে করে ওদের সবার ব্যাপারে খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি। শুধু আশরাফকে দিয়েই কাজ করাতাম।'

'এখন ওদের অফিসে কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে করেন?'

'না।'

খানিক চুপ করে থাকল পাপিতা, তারপর ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'গোটা ব্যাপারটা আপনি লেজে-গোবরে করে ফেলেছেন। মি. ক্লিফ অন্তত তাই বলবেন। খবরটা প্রথমে আপনি পেলেন, কিন্তু মি. ক্লিফকেও কিছু জানালেন না, দায়িত্বটা নিজেও নিলেন না, চাপালেন কিনা আশরাফ চৌধুরীর ঘাড়ে, তা-ও সে যদি নিজে দেখত

ব্যাপারটা। গড নোজ, কাকে পাঠিয়েছে সে! আমার ধারণা, ইতিমধ্যেই মুঠোর ভেতর তাকে আটকে ফেলেছে হফার। মেয়েটা কি বেচতে চায়, হফার এখন তা জানে...যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য! আপনি হেরে গেছেন, মি. ওয়াট।'

ওয়াট অনুভব করল, ঘামে চট চট করছে তার হাতের তালু। মাঝে মধ্যেই তাকে এই রকম অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয় পাপিতা। এর আগেও কয়েকবার মনে হয়েছে, আজ এখন আবার মনে হলো, মেয়েটাকে বিয়ে করলেই বোধহয় ভাল হত। একটা সময় ছিল, যখন সানন্দে রাজি হত পাপিতা। বিয়ে করা বউ হলে তার সাথে কথা বলার সময় এতটা স্বাধীনতা বোধহয় নিতে পারত না সে। অন্তত ওর ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব থাকত তার।

'ভুল আমরা সবাই করি,' বলল ওয়াট। 'জানি না আমাকে কিভাবে দোষ দেয়া যায়।'

সিগারেট ধরাল পাপিতা।

তার দিকে একবার দৃষ্টি হানল ওয়াট, ভাবল, আর কোন অজুহাত সৃষ্টি না করাই ভাল।

বারোটার কয়েক মিনিট আগে সেলার ক্লাবে পৌঁছুল ওরা। আশরাফের লাশ আবিষ্কার করে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছিল ওয়াট, সেটা এতক্ষণে প্রায় সামলে উঠেছে সে, এখন আবার কাজ করছে তার মাথা 'তুমি গাড়িতে থাকো,' নির্দেশ দিল সে। 'আমি একাই দেখছি।'

ধীর ভঙ্গিতে মাথা কাত করে রাজি হলো পাপিতা। গাড়ি থেকে নেমে গেল ওয়াট।

লবিতে ঢুকল সে, অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে এল সবুজ জ্যাকেট আর সাদা ট্রাউজার পরা ভীষণ মোটা এক লোক। প্রথমে তার নাম জেনে নিল সে, তারপর বলল, 'তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই, মিলটন।' লবির এক প্রান্তে তাকে টেনে নিয়ে এসে পকেট থেকে বের করে দূতারাসের পাস দেখাল। 'ব্যাপারটা পুলিসী ঝামেলা পর্যন্ত গড়াতে পারে।'

হতচকিত দেখাল মিলটনকে। ওয়াটের আচরণে কর্তৃত্বের ভাব দেখে সতর্ক হয়ে উঠল সে। পুলিস এসে যদি ট্রিক মিরর দেখে, ক্লাব চালাবার লাইসেন্স বাতিল তো হবেই, আইনের প্যাঁচেও জড়িয়ে পড়তে হবে। 'এখানে নয়, মশিয়ে,' বলে অত্যন্ত খাতির করে ছোট একটা অফিস ঘরে নিয়ে এল সে ওয়াটকে। গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসাল তাকে, তারপর সবিনয়ে জানতে চাইল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মশিয়ে। ব্যাপারটা দয়া করে খুলে বলুন আমাকে।'

'আমার কাছে খবর আছে,' বলল ওয়াট, 'মাদাম স্যানডোরা নামে একজন মহিলা এখানে ছিল।'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল মিলটন। ভারী শরীর নিয়ে একটা চেয়ারে বসল সে, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল সেটা। বলল, 'ছিল, মশিয়ে।'

'এখনও আছে কি?'

'বেশ কিছুক্ষণ হলো চলে গেছে, মশিয়ে।'

'তার সাথে দেখা করার জন্যে এসেছিল কেউ?'

'জ্বী। একজন এশিয়ান ভদ্রলোক।'

'মাদাম স্যানডোরা সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

হাতির পিঠের মত মস্ত কাঁধ একটু ঝাঁকাল মিলটন, ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল চেয়ার। 'কাল এসে মাদাম স্যানডোরা বলল, আজ রাত এগারোটার সময় এক বন্ধুর সাথে নির্জনে দেখা করার জন্যে তার একটা কামরা দরকার। টাকা অ্যাডভান্স দিতে চাইল, কাজেই ঘর দিতে আপত্তি করিনি আমরা।'

'দেখতে?'

'কালো। অস্বাভাবিক লম্বা। সুন্দর নাক-চোখ। বয়স কমই, আঠারো-বিশ। কাপড়চোপড় দেখে বোঝা যায়, ফ্যাশনের ভক্ত।'

'কালো?' মিলটনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ওয়াট।

'ওয়েস্ট আফ্রিকান···সম্ভবত সেনেগাল থেকে এসেছে।'

ওয়াটের মনে পড়ল, টেলিফোনে শোনার সময় অদ্ভুত লেগেছিল মেয়েটার ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ।

'দেখা করতে এসেছিল এশিয়ান একজন লোক?' প্রশ্ন করল সে। 'দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে, মশিয়ে। এই খানিক আগে তিনিও বেরিয়ে গেলেন। দু'জন লোকের সাথে।'

'এই দু'জন, এরা কারা?'

'কি জানি। ক্লাবে ঢুকে বারে বসল, ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ওদেরকে কোথাও দেখলাম না। শেষবার দেখলাম, ওই এশিয়ান ভদ্রলোকের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'চেহারা?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মিলটন। তারপর বলল, 'ওদেরকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিনি, মশিয়ে। যতদূর মনে পড়ছে, একজন ছিল একহারা গড়নের, থুতনির কাছে একটু দাড়ি আছে। আরেকজনের কথা মনে করতে পারছি না। কত লোক আসে···'

'এশিয়ান লোকটা?'

রানাকে চেনে না ওয়াট, তার চেহারার বর্ণনা শুনেও পরিচয় জানল না। 'এর আগে আর কখনও মাদাম স্যানডোরাকে দেখোনি তুমি?' জানতে চাইল সে।

'না, মশিয়ে।'

'গাড়ি নিয়ে এসেছিল?'

'বলতে পারব না।'

'যার সাথে দেখা করল সে, তার নাম বলেনি তোমাকে?'

'না।'

হাল ছেড়ে দিল ওয়াট। দু'একটা তথ্য যে পাওয়া যায়নি তা নয়, কিন্তু এগুলো তার কোন কাজে লাগবে কিনা এখুনি বোঝা যাচ্ছে না। আশরাফ চৌধুরীর লোক মেয়েটার সাথে দেখা করেছে। তারপর চলে গেছে মেয়েটা, কিন্তু আশরাফের

লোকটা ধরা পড়েছে কার্ল হফারের লোকজনদের হাতে। আশরাফকে টরচার করে জেনে নিয়েছিল ওরা এই ক্লাবের কথা।

উঠে দাঁড়াল সে। 'ধন্যবাদ। যা জানার ছিল, জেনেছি আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল মিলটন। 'আমাদের কোন অসুবিধে হবে না তো, মশিয়ে?'

'না,' বলে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওয়াট।

গাড়িতে ফিরে এসে সব ব্যাখ্যা করল সে।

'সব কথা মি. ক্লিফকে জানালে ভাল হত না?' জিজ্ঞেস করল পাপিতা।

'দরকার কি?' জেদের সুরে বলল ওয়াট। 'আমি নিজেই এটা সামাল দিতে পারব। সেনেগালের মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া তেমন কঠিন হবে বলে মনে করি না। এয়ারপোর্টকে বলব, ওরা চেক করে দেখুক। হয়তো মাত্র দু'এক দিন আগে ফ্রান্সে এসেছে সে। তার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা আছে আমার কাছে। এয়ারপোর্টের কেউ হয়তো মনে রেখেছে তাকে।'

'রানা এজেন্সির লোকের কাছ থেকে মেয়েটার পরিচয় ইত্যাদি সব জেনে ফেলেছে হফার,' বলল পাপিতা। 'কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, ওরা জানে। আপনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন, মি. ওয়াট।'

'এইটুকু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। আমার যদি দেরি হয়ে যায়, ক্লিফেরও দেরি হয়ে গেছে। আমার চেয়ে ভাল কি করতে পারবে ও?'

অকারণেই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ফিরে চলল সীন ওয়াট।

সাত

কার্ল হফার কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেতরে ঢুকল চ্যাপম্যান, ব্যাকুল চোখে তাকাল রানার দিকে, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'আমার সম্পর্কে কিছু বললেন উনি?'

চ্যাপম্যানের আতঙ্কিত, রক্তশূন্য চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘাড়ের পিছনটা কিছুক্ষণ ডলল রানা, তারপর বলল, 'তোমরা পৌঁছুবার অনেক আগে থেকেই ক্লাবের ভেতর লুকিয়ে ছিলাম আমি। কথাটা শুনে মনে হলো খুশিই হয়েছে। তোমারও খুশি হবার কথা।'

ফচেট আর জ্যাসন ভেতরে ঢুকল। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল ফচেট। 'তুমি তো দেখছি দারুণ স্মার্ট হে! মিথ্যে বলব না, তোমার মাথা ফুটো করার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম আমি। বস্‌কে পটালে কিভাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'মরা মানুষ জ্যান্ত হতে এই প্রথম দেখলাম।'

'সাথে যদি থাকি, আরও অনেক কিছু দেখার সৌভাগ্য হবে তোমাদের,' বলল রানা। ফিরল চ্যাপম্যানের দিকে। 'আমার ঘুমোতে যাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

পিস্তলটা নেব।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কোল্টটা বের করে দিল চ্যাপম্যান, সেটা নিয়ে হোলস্টারে ভরল রানা। 'আমাকে কেউ ঘাঁটাবে না, তাহলেই বন্ধুত্ব হতে পারে—আমি নিজের মত থাকতে পছন্দ করি।' দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফেরাল ও। তাকাল জ্যাসনের দিকে। 'আগে কাজ, তারপর ফুর্তি। হাতের এই কাজটা শেষ হোক, তারপর তোমাকে নিয়ে একটু ফুর্তি করব—যদি বেঁচে যাও, তিন মাস বিছানা থেকে উঠতে পারবে না।'

ফচেটের গলা থেকে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল অট্টহাসি, সেটা থামার অপেক্ষায় না থেকে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। দুটো বাজতে কয়েক মিনিট বাকি, কিন্তু বিছানায় যাবার আগে আরও একটা কাজ সারতে হবে ওকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল, ড্রাইভারকে বলল, 'চ্যাম্পস এলিসি-তে চলো, লে ফিগারো ভবনে যাব আমি।'

ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে দৈনিক লে ফিগারোর রিসেপশনে ঢুকল ও, বয়স্কা এক মহিলা ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে।

'পল আর্নি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অফিসে। কি নাম বলব?'

নাম বলল রানা। টেলিফোনে কথা বলল মহিলা। অপর প্রান্তের কথা শুনে একটু অবাক দেখাল তাকে। রিসিভার রেখে দিয়ে কলিং বেল বাজাল। ভেতর থেকে সাথে সাথে বেরিয়ে এল একজন অষ্টাদশী। সাদা মিনিস্কার্টে তার সুন্দর হাঁটু ঢাকা পড়েনি। রানাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মধ্য-বয়স্কা বলল, 'মশিয়ে রানাকে মশিয়ে আর্নির কামরায় নিয়ে যাও।'

রানার দিকে ফিরল মেয়েটা, স্মিত হেসে বলল, 'আসুন।'

মেয়েটার পিছু পিছু চলল রানা। ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আর্নি, রানাকে ঢুকতে দেখে এক রকম ছুটে এল সে। 'দোস্ত! তুমি!' রানার হাত চেপে ধরল সে। 'কবে এলে প্যারিসে? একটা খবরও পেলাম না...'

'বসতে দাও,' নিজেকে ছাড়িয়ে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। 'কফি খাওয়াও দেখি।'

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে কলিং বেল বাজাল আর্নি। ঘরে ঢুকল সেই অষ্টাদশী। 'দু'কাপ,' বলল আর্নি।

মেয়েটা কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বলল রানা, 'হাতে বেশি সময় নেই, দোস্ত। কাজে এসেছি।'

একগাল হাসল আর্নি। 'বান্দা হাজির!'

রানার চেয়ে বছর কয়েক বড় হবে আর্নি, লে ফিগারোর গসিপ কলামের এডিটর সে। বছর কয়েক আগে একটা গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিল, একটা কেসে অন্যায় ভাবে ফাঁসানো হয়েছিল তাকে। বিপদ থেকে রানা এজেন্সি তাকে রক্ষা করতে পারলেও গোয়েন্দাগিরির লাইসেন্স হারায় আর্নি। সেই থেকে ওদের পরিচয় এবং বন্ধুত্ব। আর্নিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে প্রচুর খাটতে হয়েছিল রানাকে, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন ফি নেয়নি ও। একই পেশার আরেকজনের

প্রতি ওর পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এটাই বোঝাতে চেয়েছিল।

'কার্ল হফার সম্পর্কে কি জানো তুমি?' প্রশ্ন করল রানা।

ভুরু কুঁচকে উঠল আর্নির। 'কার্ল হফার? হিলটনে আছে যে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর সম্পর্কে তো সবাই সব কিছু জানে।' রানার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেছে আর্নি।

'আমি জানি না,' শান্ত সুরে বলল রানা, 'জানলে তোমার কাছে আসতাম না। কে ও? কি ও?'

কফি নিয়ে এল অষ্টাদশী। সে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল আর্নি, তারপর বলল, 'ধরো, তুমি একটা বাঁধ তৈরি করতে চাও হঙকঙে। মনে করো, বোম্বেতে তুমি একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট খাড়া করতে চাও। কিংবা, তুমি হয়তো ইংল্যান্ড আর ডেনমার্কের মাঝখানে ফেরী সার্ভিস চালু করতে চাও। এই ধরনের যে-কোন বড় প্রজেক্টে হাত দেয়ার আগে টাকা ম্যানেজ করার জন্যে কার্ল হফারের সাথে আলোচনায় বসবে তুমি। দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় প্রজেক্টে টাকা খাটায় যে লোক তারই নাম কার্ল হফার।' সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিল সে, মনে পড়ে গেছে রানা সিগারেট খায় না। 'জাহাজ ব্যবসা, তেল ব্যবসা, নির্মাণ, এয়ারক্রাফট—সব কিছুর মধ্যে আছে সে। সারা দুনিয়ায় ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে এই লোকের। আমাদের কাগজ ওর নাম দিয়েছে, মি. বিগ বিজনেস। আর কি জানতে চাও তুমি?'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। ঘাড়টা আবার ব্যথা করতে শুরু করেছে। 'এতই যদি বড় হবে, আমি ওর নাম শুনিনি কেন?'

মুচকি হাসল আর্নি। 'প্রচার পছন্দ করে না। খবরের কাগজের মালিক যে ক'জন আছে, সবাই তার বন্ধু। তাদেরকে সাহায্য করে, বিনিময়ে তার খবর এড়িয়ে যায় ওরা। ফাইন্যান্স জগতের রাসপুটিন এই লোক, সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ম্যাগনেট।'

'কত টাকার মানুষ, কোন ধারণা আছে?'

'আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবে ব্যববসার কোন ক্ষতি না করে এক কথায় দশ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড টেবিলে রাখতে পারবে, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। হি ইজ বিগ, রানা। রিয়েল মি. বিগ।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'হিলটনই কি ওর ঘর-বাড়ি?'

'বেশিদিন কোথাও থাকে না। লয়ার ডিস্ট্রিক্টে তার একটা শ্যাতো আছে। প্যারিসের বাড়িটা তো রাজপ্রাসাদকেও হার মানায়। দুনিয়ার সব বড় শহরে বাড়ি আছে, কিন্তু নিজের বাড়িতে খুব কমই থাকে সে। এর কারণ ঠিক বলতে পারব না, সম্ভবত ভাল হোটেলের খাতির যত্নের প্রতি দুর্বলতা। বছর দুই আগে মারা গেছে বউ, কাজেই নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায় বন্দী হয়ে থাকার দরকারই বা কি তার? তাছাড়া, ব্যবসার খাতিরে দুনিয়া চষে বেড়াতে হয় তাকে। এই তো অল্প ক'দিন আগে মস্কো থেকে ফিরেছে। যদি শুনি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো ক্রেমলিনে কাটিয়ে এসেছে, আশ্চর্য হব না। এই জাতের মানুষ সে।'

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'মস্কোয় কি করতে গিয়েছিল?'

'বলতে পারব না।' কাঁধ ঝাঁকাল আর্নি। 'হয়তো ক্রেমলিন থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, বড় কোন ব্যবসা দেবে। কিন্তু রানা, এত রাতে এসে এই লোক সম্পর্কে...'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কিছু না, রুটিন ওঅর্ক। ধন্যবাদ, আর্নি। একটু ব্যস্ত আছি, আবার দেখা হলে গল্প করা যাবে। বউ ভাল?'

'আমি কোন প্রশ্ন করছি না, রানা,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল আর্নি। 'তোমাকে উপদেশ দেবার যোগ্যতাও আমি রাখি না। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে সাবধান করে দেয়া আমার কর্তব্য। আমি শুধু বলতে চাই, সমাজের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বও ভয় পায় ওকে। হি ইজ ডেঞ্জারাস।'

'ধন্যবাদ, আর্নি,' মৃদু হেসে বলল রানা। হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে।

ট্যাক্সি নিয়ে নিজের ঘরে ফিরল রানা। দরজা বন্ধ করে টেলিফোনের সামনে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও, হাতঘড়ি দেখল, তারপর রিসিভার তুলে ডায়াল করল সিটি হাসপাতালে। নিজের পরিচয় না দিয়ে ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েটিং রূমে মি. আবেদ নামে কেউ আছেন কিনা দেখবেন একটু?'

রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট আবেদ, রানা আশা করছে আশরাফের লাশ নিয়ে ইতিমধ্যে মর্গে পৌঁছে গেছে সে। দু'মিনিট পর আবেদের গলা পেল ও। 'হ্যালো?'

'হাসপাতালের বাইরে কোথাও থেকে ফোন করো আমাকে,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

দশ মিনিট পর ফোন করল আবেদ। রানার প্রশ্নের উত্তরে জানাল সে, 'পুলিসকে খবর দিতে এইমাত্র ওরাই মর্গে লাশ নিয়ে এসেছে। পোস্ট-মর্টেম শেষ হতে সকাল হয়ে যাবে। আমরা কিছুই জানি না, পুলিসকে তা বিশ্বাস করানো গেছে।'

'লাশ ওরা ছাড়বে?' জানতে চাইল রানা। 'নাকি তদবির করতে হবে আমাকে?'

'আমরাই ছাড়িয়ে নিতে পারব, মাসুদ ভাই। কফিনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, জাহিদকে পাঠিয়েছি প্লেনের টিকেট কেনার জন্যে।'

আরও দু'একটা কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। থমথমে হয়ে আছে চেহারা। আশরাফের কথা মনে হলেই অনুভব করছে, অনেক কষ্টে অর্জন করা একটা সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে ওর কাছ থেকে। সারা শরীরে জ্বলে উঠতে চাইছে প্রতিশোধের আগুন।

বাথরূমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারের নিচে ভিজল ও। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুম এল না সহজে। আশরাফ বিয়ে করেনি, কথাটা মনে পড়তে একটু স্বস্তি বোধ করল। মা-বাবা কেউ নেই ওর, তিন ভাই ঢাকায় লেখাপড়া করছে। নিজেকে বলে রাখল, টাকা দিয়ে যেতে হবে, যতদিন না ওদের লেখাপড়া শেষ হয়। বীমার

টাকায় ঢাকায় একটা ছোটখাট বাড়িও কিনে দেয়া যেতে পারে, লাগলে অফিস থেকে কিছু ভরা হবে।

অন্ধকার বিছানায় ছটফট করতে লাগল ও। তারপর রহস্যময়ী মাদাম স্যানডোরার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল কার্ল হফার আর ওয়েন প্যাকারের কথা। কারণটা কি? প্যাকারকে খুন করার জন্যে এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছে কেন হফার? এত টাকার মানুষ, তার কি এসপিওনাজের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে? অসম্ভব কি, হয়তো এই পথেই এত টাকা কামিয়েছে।

সবশেষে মনে পড়ল লুনাকে। কি সুন্দর দেখতে ; কে ও?

তারপর ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সীন ওয়াটের। ডেস্কের ওপর হাত আর মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিল, কখন ঘুম এসে গেছে নিজেও জানে না। মাথা তুলে সতর্ক চোখে তাকাল চারদিকে, দেখল, সোফায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছে পাপিতাও। ওয়াল ক্লকের দিকে তাকাল সে। তিনটে বাজতে বিশ মিনিট।

রিসিভার তুলল সে। 'হ্যালো···ইয়েস। ওয়াট বলছি।'

'লেসলি টমাস। ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি,' ভারী, নিরস গলার স্বরই বলে দেয়, পুলিস অফিসার। মার্কিন সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের একজন ফিল্ড অফিসার সে। 'এখানে হাবুডুবু খাবার জোগাড় হয়েছে, মি. ওয়াট। গত এক হপ্তায় প্রায় একশো সেনেগালিজ ব্যারিয়ার ক্রস করেছে। মেয়েটা এদের একজন হতে পারে, কিন্তু সন্দেহ আছে আমার। সব ক'টা এমবারকেশন কার্ড চেক করেছি আমরা। প্রতিটি মেয়ের সাথে হয় স্বামী ছিল, নাহয় তারা বুড়ি। এই মেয়েটা সাথে একজন পুরুষকে নিয়ে ফ্রান্সে ঢুকেছে, এমন হতে পারে?'

'জানি না। হতে পারে।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে বিবাহিত দম্পতিদেরও চেক করার জন্যে লোক লাগাচ্ছি। লম্বা কাজ, কিন্তু পারা যাবে। মেয়েটা বোটে করেও আসতে পারে, স্যার। দু'দিন আগে এস.এস. রেডরোজ নোঙর ফেলেছে। মার্সেইর পুলিসকে সতর্ক করে দিয়েছি আমি। ডাকার থেকে একটা কার্গো বোটও এসে পৌঁচেছে, ভিড়েছে ডানকার্কে। ওতে করেও এসে থাকতে পারে।'

'কি রকম সময় লাগবে বলো দেখি?'

'কমপ্লিট চেকের জন্যে পাঁচদিনের কম তো নয়ই।'

গম্ভীর হলো ওয়াট। 'ততদিনে ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে পারে সে।'

'আমার তা মনে হয় না, স্যার। আমরা এখন সতর্ক, ফাঁকি দিতে পারবে না। এয়ারপোর্ট, স্টেশন, পোর্ট—সবখানে চেকিঙের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে আমাদের, কিন্তু সে যদি বেরোবার চেষ্টা করে, সাথে সাথে ধরা পড়ে যাবে।'

তার আগে মারাও যেতে পারে, ভাবল ওয়াট। 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন, তোমার সাধ্যমত করো। দিস ইজ আর্জেন্ট।'

সোফার ওপর নড়েচড়ে চোখ পিট পিট করে তাকাল পাপিতা। মুখের সামনে

একটা হাত এনে হাই তুলল।

'তোমার কথাই ঠিক, পাপিতা,' ঠোঁটে একটা সিগারেট তুলে বলল ওয়াট। 'আমরা দেরি করে ফেলেছি। টমাস জানিয়ে দিল, পাঁচদিনের আগে মেয়েটার খোঁজ দিতে পারবে না।' লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল সে। 'সেনেগাল থেকে এসেছে একটা মেয়ে···কিছু বেচতে চায়, কি সেই জিনিস যে কার্ল হফারকে মানুষ খুন করতে হয়?'

'রানা এজেন্সির অফিসে একজন লোক পাঠাচ্ছেন না কেন?'

'এত রাতে?'

'সার্চ করার জন্যে তো রাতই ভাল,' বলল পাপিতা। 'আশরাফের আন্ডারে যারা কাজ করে তাদের একটা তালিকা হয়তো পাওয়া যাবে ওখানে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ওয়াট বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, সকালে অফিস খুললে লোক পাঠাব।'

'রানা এজেন্সির সাথে এতদিন ধরে কাজ করছেন, অথচ ওদের কাজের ধারা সম্পর্কে দেখছি আপনার কোন ধারণাই নেই,' বলল পাপিতা। 'ওদের একজন এজেন্ট খুন হয়েছে, কাজেই নিজেদের মুখ ওরা সেলাই করে রাখবে। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও ওদের কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করতে পারবেন না আপনি। আশরাফ আপনার কাজ নিয়েছিল, সে মারা যাওয়ায়, গোটা ব্যাপারটাই হয়তো অস্বীকার করবে ওরা, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

'কেন?'

'কেন আবার? প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে,' বলল পাপিতা। 'আর তাই, শত্রুকে অন্ধকারে রাখবে, নিজেদের প্ল্যান সম্পর্কে বাতাসকেও জানতে দেবে না কিছু।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে গেল ওয়াট। তারপর বলল, 'কিন্তু কিছু চুরি করার জন্যে রানা এজেন্সির অফিসে লোক পাঠাব, ভাবতেও খারাপ লাগছে আমার···'

এমন সুরে হেসে উঠল পাপিতা, যেন খুব মজার একটা রসিকতা শুনেছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল ওয়াট, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। 'রবার্ট লুডলামকে লাগানো যায়।' ডায়াল করল সে। মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হলো। তারপর ঘুম জড়ানো একটা গলা পেল, 'কে?'

কি চায়, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ওয়াট। সবশেষে বলল, 'দিস ইজ টপ প্রায়োরিটি, লুডলাম। রানা এজেন্সির অপারেটর যারা প্যারিসে কাজ করছে তাদের তালিকা দরকার আমার। ওদের অফিসে একবার ঢুঁ মেরে এসো।'

অপরপ্রান্তে সজাগ হয়ে উঠল রবার্ট লুডলাম। 'পারা যায়···পারব,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

পাপিতার দিকে তাকাল ওয়াট। 'ও যাবে, দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'পেলেও কোন লাভ হবে কিনা কে জানে,' ঠোঁট উল্টে বলল পাপিতা। 'হয়তো এরই মধ্যে আশরাফ চৌধুরীর সেই লোকটাও মারা গেছে।'

'হিলটনে নজর রাখার জন্যে দু'জন লোক পাঠাব,' বলল ওয়াট। 'চ্যাপম্যানকে পেলে তুলে আনবে ওরা। আশরাফের সাথে যে ভাষায় কথা বলা

হয়েছে, তার সাথেও সেই একই ভাষায় কথা বলা হবে।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাপিতা। 'এইতো, আপনার চাকা ঘুরতে শুরু করেছে! আমি তাহলে গেলাম। ধরা না দেয়ায় নিদ্রাদেবী অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ওয়াট, তারপর একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'আবার এত দূর যাবে? ইচ্ছে করলে তুমি আমার খালি কামরাটা ব্যবহার করতে পারো।'

মাথা নাড়ার সময় মৃদু হাসল পাপিতা। 'নিজের বিছানায় শুতে না পারলে ঘুম আসে না। সকালবেলা দরকার নিজের টুথব্রাশ। গুড নাইট, মি. ওয়াট।'

'কোন খবর হলে তোমাকে ফোন করব,' বলল ওয়াট। পাপিতাকে বিদায় জানাবার জন্যে উঠল না সে। হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে।

'কিন্তু জরুরী কিছু না হলে সকাল দশটার আগে নয়,' দরজার কাছ থেকে বলল পাপিতা।

ডায়াল করে ফোনে কথা বলতে শুরু করল ওয়াট। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পাপিতা।

অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠল রানা। ঘাড়ের ব্যথাটা কমেনি, নড়াচড়া করলেই ব্যথা করে। অনেক কষ্টে নাস্তা তৈরি করল ও, খেতে বসেছে, এই সময় কলিংবেল বাজল। ধুস শালা বলে টেবিল ছাড়ল ও, তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে, হাতে পিস্তল। স্পাই হোলে চোখ রাখতেই দেখল, হাতে ব্রিফকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফচেট। পিস্তলটা পকেটে রেখে গেটের ট্র্যাপ-ডোর খুলে দিতেই নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকল সে, বলল, 'এই যে,' মোটা ঠোঁটে বন্ধুত্বের হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল, 'ঘাড়ের ব্যথাটা কেমন এখন?'

ট্র্যাপ-ডোর বন্ধ করে বারান্দার দিকে পা বাড়াল রানা; বলল, 'মেরে ফেলছে!'

সিঁড়িতে আর কোন কথা হলো না। রানার পিছু পিছু সোজা কিচেনে ঢুকল ফচেট। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল রানা, জানতে চাইল, 'নাস্তা চলবে?'

বিরাট পেটের ওপর একটা চাপড় দিল ফচেট। 'আর চর্বি জমাতে চাই না।'

প্রচণ্ড খিদে নিয়ে প্লেটগুলোর ওপর হামলা চালাল রানা। নিরুপদ্রবে খেতে দিল ফচেট, কথা বলে ওর মনোযোগ নষ্ট করল না। সবশেষে পট থেকে দু'কাপ কফি ঢালল রানা।

নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল ফচেট। 'ডেভিড কপারের কথা মনে আছে তোমার? সেরা লাইট ওয়েট ছিল ও, অন্তত আমার বিচারে। একটা মেয়ের খপ্পরে পড়ে ক্যারিয়ারটা নষ্ট করে ফেলে। এক সময় আমি তার ট্রেনার ছিলাম।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল রানা। চোখে প্রশ্ন।

'আমি যা বলতে চাইছি, তোমার ঘাড়টা যদি খুব বেশি বিরক্ত করছে বলে মনে করো, দশ মিনিটে আমি ওটাকে সিধে করে দিতে পারি।'

'করে দেখাও,' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল রানা।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা টিনের কৌটো বের করল ফচেট। 'বেডরূমে চলো, শুতে হবে,' বলল সে। হাতের কৌটোটা দেখাল। 'ভাল্লুকের চর্বি। বাজে গন্ধ, কিন্তু ব্যথা সারাতে এর জুড়ি নেই।'

বেডরূমে এল ওরা। দশ মিনিট পর বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়াল রানা, প্রথমে খুব সাবধানে মাথা নাড়ল, তারপর দ্রুত কয়েকবার ঝাঁকি দিল, ধুপধাপ বেধড়ক কয়েকটা লাফ দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! একদম সেরে গেছে! জাদু জানো নাকি তুমি, মিঞা?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল ফচেট, তারপর বাথরূম থেকে হাত ধুয়ে এল। বিছানায় বসে ব্রিফকেসের দিকে তাকাল সে, বলল, 'তোমার জন্যে টাকা নিয়ে এসেছি। আজ সকালে তোমাকে দেয়ার জন্যে বস্ আমাকে দিয়েছেন।'

বিছানার দিকে এগোল রানা, কিন্তু ওর পথরোধ করে দাঁড়াল ফচেট। 'ধীরে, বন্ধু, ধীরে!' এখনও হাসছে সে। 'ব্রিফকেস খোলার আগে কথা শেষ করতে দাও আমাকে। ওখানে এক লাখ ডলার নেই, আছে সত্তর হাজার।' লক্ষ্য করল, গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'মেয়েটাকে সব টাকা দেবার আগে তোমাকে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, ওয়েন প্যাকার কোথায় আছে সত্যি সে জানে কিনা।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। হফারের এই সাবধানতা অযৌক্তিক কিছু নয়, মেয়েটাকেই অবিশ্বাস করছে সে। বলল, 'ঠিক আছে।' ফচেটকে পাশ কাটিয়ে এসে বিছানার ওপর বসল ও, ব্রিফকেসটা খুলল। সব একশো ডলারের নোট। গুনে দেখল, ঠিক আছে। ব্রিফকেস বন্ধ করে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দিল আবার।

'দলে ভিড়েছ, সেজন্যে আমি খুশি,' সিগারেট ধরিয়ে বলল ফচেট। 'ওই চ্যাপম্যান, ওটার মেরুদণ্ড বলতে কিছু নেই। দু'একটা কাজ দেখিয়ে প্রথম দিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে সেগুলো ছিল ঝড়ে বক। পুঁচকে একটা ছোঁড়া, তার কথায় উঠতে বসতে হবে, এ আমার একদম ভাল লাগে না।'

দেয়ালে বালিশ ঠেকিয়ে তাতে হেলান দিল রানা, বলল, 'কিন্তু জ্যাসনের ব্যাপারটা আলাদা, তাই না? ওকে তোমার ভয় লাগে। ও কি অনেকদিন হলো আছে?'

'অনেক দিন,' গম্ভীর দেখাল ফচেটকে। 'একটা জানোয়ার দরকার ছিল আমাদের, অভাবটা খুব যত্নের সাথে পূরণ করছে ও।'

'তোমাদের মত লোককে হফারের দরকার হয় কেন?' সহজ সুরে জানতে চাইল রানা। 'তার কি কাজে লাগো তোমরা?'

'কাজ কি আর একটা!' এইটুকু বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল ফচেট। কষে টান দিল সিগারেটে, ভুশ্‌শ করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমাকে এবার যেতে হয়।' চোখ মটকে হাসল। 'রাতে ডিউটি করে, দিনে ঘুমায়, এই রকম একটা মেয়ের সাথে ডেট আছে। দেখো, টাকাটা পানিতে ফেলো না। গেলাম।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

খানিক পর নিচে গিয়ে ট্র্যাপ-ডোরটা বন্ধ করে এল রানা। ব্রিফকেস খুলে বিছানার ওপর পাশাপাশি রাখল নোটের তাড়াগুলো। পঞ্চাশ হাজার ডলার চেয়েছে

মেয়েটা, কিন্তু কত দেয়া যায়? পঞ্চাশ হাজার পুরো পেয়ে গেলে তার ওপর কোন কন্ট্রোল থাকবে না ওর। ঠিক করল, ত্রিশ হাজার ডলার দেবে ও। ওয়েন প্যাকার কোথায় আছে জানার পর বাকি টাকা হফারের কাছ থেকে আদায় করে তারপর দেবে। হাতে থাকল চল্লিশ হাজার, আশরাফের অ্যাকাউন্টে রেখে দেয়া যেতে পারে।

এরপর গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে বসল।

কাজটা সীন ওয়াটের, তার কাছ থেকে পেয়েছে রানা এজেন্সি। এরপর যা কিছু ঘটেছে, প্রতিটি বর্ণ সীন ওয়াটের জানার অধিকার আছে। কিন্তু তাকে ও কিছু জানাচ্ছে না, জানাবেও না। কারণ ওয়েন প্যাকার কোথায় আছে এই খবর পাবার সাথে সাথে তাকে খুন করার জন্যে লোক পাঠাতে পারে ওয়াট। ওয়েন প্যাকারকে বাঁচতে দিতে না চাওয়ার কারণ আছে তার, এই লোক তার দেশের সাথে বেঈমানী করেছে। সি.আই.এ.-র বহু গোপন তথ্য জানিয়ে দিয়েছে কে.জি.বি.-কে। কিন্তু সীন ওয়াট ওয়েন প্যাকারকে খুন করবে, কিংবা কোন বিপদে ফেলবে, এটা রানা জেনেশুনে ঘটতে দিতে পারে না। শুধু লোকটার ওপর শ্রদ্ধা আছে বলে নয়, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা রয়েছে সেটা ও বিশ্বাস করতে পারে না বলেও। অভিযোগ সত্যি কিনা নিশ্চিতভাবে না জেনে কিছু বিশ্বাস করতে রাজি নয় ও।

আশরাফ-হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। তা নিতে হলে হফারের সাথে হাত মেলাবার অভিনয়ও করতে হবে। এক সুযোগে ওদের দলে যখন ঢোকা গেছে, আরেক সুযোগে গোটা দলটাকে ফাঁদে ফেলাও সম্ভব হতে পারে। হফার সহজ লোক নয়, ওর ওপর নজর রাখছে সে। এখন যদি ওয়াটের সাথে যোগাযোগ করতে যায় ও, হফার সেটা জানবেই, এবং তাহলেই সর্বনাশ!

কাজেই, দুঃখিত, মি. ওয়াট!

আট

ফচেটের সামনে বসে রানা যখন ব্রেকফাস্ট সারছে, মার্কিন দূতাবাসে নিজের অফিস কামরায় বসে সীন ওয়াট তখন টেলিফোনে কথা বলছে রবার্ট লুডলামের সাথে। 'এক ঘণ্টার কাজ, তুমি আট ঘণ্টা পর রিপোর্ট করছ কেন?' একটু ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল সে।

'কি কি করতে হয়েছে শুনলেই বুঝতে পারবেন,' বলল লুডলাম। 'ভোর সাড়ে চারটেয় রানা এজেন্সির অফিসে ঢুকি আমি। বেরিয়ে আসি সাড়ে পাঁচটায়। প্যারিসে ওদের অপারেটর যারা কাজ করছে তাদের একটা তালিকা পেলাম বটে, কিন্তু সবগুলো কোড নেম, আসল নামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এই ফাইল আমাদের কোন কাজে লাগবে না বুঝতে পেরে দমে গেলাম আমি। তারপর মনে পড়ল, অপারেটরদের প্রত্যেকের লাইসেন্স আছে, আর লাইসেন্সগুলো ইস্যু করেছে পুলিস ডিপার্টমেন্ট। ন'টায় গেলাম ওখানে, আমাদের একজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে

জানলাম রানা এজেন্সির মোট ছ'জন লোকের নামে ছ'টা লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। তার মধ্যে দুটো বাদ দিতে পারি আমরা—মাসুদ রানা আর আশরাফ চৌধুরী।'

'বাকি চারজন কোথায়?'

'পুলিস ডিপার্টমেন্ট থেকে সোজা হাজির হলাম রানা এজেন্সিতে,' বলল লুডলাম। 'খোলা ছিল অফিস, ওদের মধ্যে যাকে একআধটু চিনি তাকেই পেলাম। কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে এমন কোন তথ্য আদায় করা গেল না। আশরাফ চৌধুরী কেন মারা গেছে, এ-সম্পর্কে ওরা নাকি বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না। বলল, ওদের দু'জন অপারেটর এয়ারপোর্টে গেছে, তাদের মধ্যে একজন আশরাফ চৌধুরীর লাশ নিয়ে ঢাকা পর্যন্ত যাবে। ওদের আরেকজন এজেন্ট প্যারিসের বাইরে কোথাও ছিল, আজ সকালে সেখান থেকে নিস-এ পৌঁচেছে সে। নিস-এ যাবার কথা ছিল আশরাফের, কিন্তু সে না থাকায় ওই লোককে হাতের কাজ ফেলে ওখানে যেতে বলা হয়েছে কাল রাতেই। কাজটা নাকি অত্যন্ত জরুরী। নিস এয়ারপোর্টে খবর নিয়ে এইমাত্র জানলাম সত্যি পৌঁচেছে ও।'

'তারমানে, ছ'জনের খবরই পাওয়া যাচ্ছে,' বলল ওয়াট। 'হফার তাহলে ধরল কাকে? কাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছিল আশরাফ চৌধুরী?'

'এরা কেউ প্যারিসে কাল ছিল না, আশরাফ অন্য প্রতিষ্ঠানের কারও সাহায্য নিয়ে থাকতে পারে।'

'কি জানি,' চিন্তিত সুরে বলল ওয়াট। 'ঠিক আছে, লুডলাম, ব্যাপারটা ভুলে যাও।' রানা এজেন্সি গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছে, এটুকু বুঝতে পেরেছে সে। নিজেকে মক্কেল হিসেবে দাবি করলেও ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা তথ্য পাওয়া যাবে না এখন। মক্কেলের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের এজেন্ট হত্যার ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে ওরা।

রিসিভার রেখে দিয়ে চোখ থেকে চশমা নামাল ওয়াট, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে তাকাল ট্রে-র ওপর জমে থাকা ফাইলের স্তূপে। মেজাজ বিগড়ে গেল তার। মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে কোন কাজে মন বসানো কঠিন। ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন জাগছে মনে—সেনেগালিজ মেয়েটা কী এমন বিক্রি করতে এসেছে যে খুন হয়ে গেল আশরাফ চৌধুরী?

ফাইল টেনে নিয়ে কাজে মন বসাবার চেষ্টা করল ওয়াট। ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলে বলল, 'ইয়েস?'

'লেসলি টমাস। আমাদের ভাগ্য বোধহয় একটু খুলতে যাচ্ছে, স্যার,' পুলিসী কণ্ঠস্বর ওয়াটের কানে গুঁতো লাগাল। 'আপনার দেয়া বর্ণনার সাথে মিলে যায় এই রকম একটা সেনেগালিজ মেয়ের খবর পাওয়া গেছে, একটা কার্গো মোটর ভেসেলে করে অ্যান্টওয়ার্পে পৌঁচেছে তিন দিন আগে।'

'ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলেছ?' দ্রুত জানতে চাইল ওয়াট।

'বলেছি। কিছু জানে না। জাহাজে যতক্ষণ ছিল, নিজের কেবিন থেকে বেরোয়নি মেয়েটা। আবহাওয়া খারাপ ছিল, সী-সিকনেসে ভোগা স্বাভাবিক। ডাকারে আমাদের লোকের কাছে টেলেক্স পাঠিয়েছি, এমবারকেশন কার্ডে লেখা

মেয়েটার ঠিকানা নিয়ে খোঁজ নিয়েছে সে। ঠিকানায় যে জায়গার কথা বলা হয়েছে তার কোন অস্তিত্বই নেই।'

'বন্দর থেকে প্যারিসে এল কিভাবে?'

'সম্ভবত ভাড়াটে গাড়ি করে,' বলল টমাস। 'আমি চেক করে দেখছি।'

সতর্ক হয়ে উঠেছে ওয়াট। 'বেলজিয়াম আর ফ্রেঞ্চ সীমান্ত পুলিসকে জিজ্ঞেস করে দেখো, এই চেহারার কোন মেয়ের কথা তাদের মনে পড়ে কিনা।'

'পাসপোর্টটা জাল হতে পারে,' বলল টমাস। 'ফ্রেঞ্চ পুলিসকে ব্যাপারটা চেক করে দেখতে বলেছি। প্যারিসের হোটেলগুলোয় খোঁজ নিচ্ছে ওরা।'

'বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, টমাস।'

'পাঁচদিন সময় নিয়েছি, স্যার। কাজ এগোচ্ছে। আমার বিশ্বাস, আপনি এই সাদিয়া জেসমিনকেই খুঁজছেন।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন,' বলল ওয়াট। 'লেগে থাকো।'

রিসিভার রেখে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল সে, তারপর ওমেগার ওপর চোখ বুলাল। বারোটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। রিসিভার তুলে পাপিতার নাম্বারে ডায়াল করল সে। খানিক দেরি করে লাইনে এল পাপিতা। মনে হলো চটে আছে।

'শাওয়ারের নিচে ছিলাম, মি. ওয়াট,' বলল সে। 'কি ব্যাপার?'

'একটার সময় আমার সাথে লাঞ্চ করো,' বলল ওয়াট। বিয়ের ইঙ্গিতে সাড়া না দেয়ায় সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছিল পাপিতা। অনেক পরে যখন আভাসে তাকে প্রস্তাব দিল ওয়াট, বোধহয় অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে পাপিতা। সেই থেকে ওদের সম্পর্কটা কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। ওরা পরস্পরের শত্রু নয়, আবার বন্ধুও নয়। 'খানিক এগিয়েছি আমরা। কোথায় খেতে চাও, ল্যাসায়ার-এ?'

'ঠিক আছে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল পাপিতা।

সন্ধে সাতটার কয়েক মিনিট আগে এভিনিউ মোজার্টের একটা ব্যস্ত কাফেতে ঢুকল রানা, বগলের নিচে ব্রিফকেস। সোজা বারের সামনে চলে এল ও, সাগ্রহে বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে করমর্দন করল বারম্যানের সাথে।

'ঠিক সাতটায় একটা টেলিফোন পাব বলে আশা করছি, পিয়েরে,' বলল রানা। 'ওই কোণে আছি আমি।'

বিশাল শরীর পিয়েরের, মস্ত টাকে হাত বুলিয়ে সবজান্তার মত হাসল সে, বলল, 'মেয়েটা যেই হোক, নতুন হলে খুব সাবধানে থাকবেন, মশিয়ে। প্যারিসে কিছু মেয়ে আছে, উপহার পাবার জন্যে একটা হাত পেতেই আছে সারাক্ষণ।'

'এই মেয়েটা দু'হাত পেতে আছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। বিয়ারের অর্ডার দিল ও। সেটা নিয়ে সরে এল কোণের টেবিলে। বিয়ার শেষ হয়নি, কাঁটায় কাঁটায় সাতটা, বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলে কিছু শুনল পিয়েরে, হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে। বারের সামনে চলে এল রানা, রিসিভার নিয়ে চোখ-ইশারায় সরে যেতে বলল পিয়েরেকে।

'আমি রানা।'

'উত্তর দিন—হ্যাঁ, অথবা না।' মাদাম স্যানডোরার গলা পরিষ্কার চিনতে পারল রানা।

বলল, 'হ্যাঁ।' শুনতে পেল, মাঝপথে দ্রুত আটকে গেল মাদাম স্যানডোরার নিঃশ্বাস।

'সাথে টাকা নিয়ে এসেছেন?' জানতে চাইল সে।

'প্রায় সবটাই।'

'তারমানে?'

'ভদ্রলোক কোথায় আছেন জানাও আমাকে, তারপর বাকিটা পাবে।'

'এখন কত দিচ্ছেন?'

'ত্রিশ হাজার।'

অপরপ্রান্তে অনেকক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা, মেয়েটা বিগড়ে গেল না তো আবার!

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল মাদাম স্যানডোরা। 'ল্যাজার স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে থাকব আমি, সাড়ে আটটায়।' রিসিভার রেখে দিল সে।

বারম্যানের উদ্দেশে হাত নেড়ে কাফে থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল রানা। ওখান থেকে ডিনার খেয়ে বেরুল ঠিক আটটায়। হাঁটা দায়, এত ভিড়। ট্যাক্সি পেতে একটু অসুবিধে হলো। স্টেশনে পৌঁছে হাতঘড়ি দেখল ও, আটটা উনত্রিশ।

দ্রুত হেঁটে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ঢোকার আগে কাঁচের দরজা দিয়ে দেখে নিল ভেতরটা। বেঞ্চের ওপর ছোট একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে এক মহিলা। বেঞ্চের আরেক প্রান্তে বয়স্ক এক লোক চোখ বুজে ঢুলছে, কোলের ওপর ব্রাউন রঙের প্যাকেট। কামরার উল্টোদিকে আরেকটা বেঞ্চ, তাতে বসে আছে কালো, কিন্তু সুন্দরী এক যুবতী, পরনে কালো কোট আর স্কার্ট। মেদহীন, লম্বা পা, একটার ওপর তুলে দিয়েছে আরেকটা। হাত দুটো কোলের ওপর। বসার ভঙ্গিতে এমন একটা অনড় ভাব রয়েছে, মনে হয় সদ্য তৈরি কালো মার্বেল পাথরের স্ট্যাচু বুঝি।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। ওয়েটিং রুমের পিছনে গুটি গুটি এগিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে থামল একটা ট্রেন। বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল মহিলা।

ইতস্তত করতে লাগল রানা। এদিকের বেঞ্চে বসতে যাবে, এই সময় ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল কালো মেয়েটা।

হতভম্ব হয়ে গেল রানা। মাদাম স্যানডোরা একজন আফ্রিকান, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ও। এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসল ও। 'মাদাম স্যানডোরা?' জানতে চাইল। মেয়েটার নিখুঁত সৌন্দর্য মুগ্ধ করে তুলল ওকে।

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা। গভীর কালো তরল লেকের মত চোখ ফিরিয়ে রানার হাতের ব্রিফকেসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'টাকা নিয়ে এসেছেন?'

'ত্রিশ হাজার ডলার।'

'দেখতে পারি?'

প্রৌঢ় লোকটার দিকে তাকাল রানা, এখনও ঢুলছে। স্ট্র্যাপ খুলে ব্রিফকেসের

ঢাকনি তুলল ও। রানার দিকে একটু ঝুঁকে নোটের তোড়াগুলো দেখল মাদাম স্যানডোরা।

জানতে চাইল, 'পুরো ত্রিশ হাজার? কম নেই তো?'

'যদি বলো, গুণে দেব।'

'বাকি টাকাও চাই আমার।'

'পাবে। পরে।' ব্রিফকেসের স্ট্র্যাপ আটকে দিল রানা। 'এখন বলো, কোথায় তিনি?'

'ডাকারের কাছাকাছি, দিউগবেল-এ।'

কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তুমি বলতে চাইছ প্যারিসে নেই তিনি?'

'প্যারিসে আছেন এ-কথা আমি একবারও বলেছি? দিউগবেলের বাইরে, মরু-ঝোপে আছেন তিনি, যেখানে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।'

কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'কিন্তু তোমার এসব কথা যে মিথ্যে নয় বুঝব কিভাবে? কিভাবে জানব তুমি ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে চাইছ না?'

'আপনাকে আমি নিয়ে যাব তার কাছে।'

নাকের একটা পাশ আঙুল দিয়ে ঘষল রানা, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। 'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? কে তুমি? এর সাথে জড়ালে কিভাবে?'

'ডাকারের একটা নাইটক্লাবে নাচি আমি। ওখানে…'

'আস্তে, আস্তে,' বলল রানা। 'নাইটক্লাবের নাম?'

'দি টাওয়ার। ওখানে ওটাই সবচেয়ে নামকরা।'

'বলে যাও।'

'আমার এক ভক্ত…প্রায়ই ক্লাবে আসেন তিনি। একদিন জানতে চাইলেন, সামান্য একটা কাজ করে দিয়ে কিছু মার্কিন ডলার কামাবার কোন ইচ্ছে আমার আছে কিনা।'

'নাম?'

'জানি না,' মৃদু-স্বরে কথা বলছে স্যানডোরা। 'পোলো বলে ডাকি আমি। একজন পর্তুগীজ।'

'দেখতে?'

'গোঁফ আছে। লম্বা-চওড়া। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে সোনার সিগনেট রিঙ পরেন। সৌখিন মানুষ।'

'তারপর?'

'তিনি আমাকে বললেন, প্যারিসে যেতে হবে আমাকে, প্যারিসে গিয়ে মি. সীন ওয়াটকে টেলিফোন করে একজন লোকের কথা বলতে হবে। তাহলেই তিনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবেন।'

'ও, তুমি তাহলে ওয়েন প্যাকারকে নিজের চোখে দেখোনি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। পোলো বললেন, প্যারিসে আসার সমস্ত খরচ তিনিই বহন করবেন। আমি দেখলাম, হারাবার কিছু নেই আমার। কাজেই আসতে রাজি হলাম। আফ্রিকান মরুভূমিতে ঝোপ জঙ্গল আছে, সে যে কি জিনিস না দেখলে

বুঝবেন না। পোলো আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। মি. ওয়েন প্যাকার এখনও আছেন ওখানে।' হ্যান্ডব্যাগ খুলে কোয়ার্টার সাইজের একটা ফটো বের করল স্যানডোরা।

'ফটোটা নিয়ে দেখল রানা। মাদাম স্যানডোরা আর ওয়েন প্যাকারের একটা ক্লোজ-আপ ছবি। ওয়েন প্যাকারকে দেখেই চিনতে পারল ও, তবে আগের চেয়ে বয়স্ক এবং একটু মোটা দেখাল। ক্যামেরাম্যান নিচু কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে ছবি তুলেছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধু আকাশ দেখা যাচ্ছে।

'আমার কাছে থাকুক এটা,' বলল রানা।

'থাকুক।'

ফটোটা পকেটে ভরে রাখল রানা। ভাবল, হফারকে অন্তত বুঝ দেয়া যাবে। জানতে চাইল, 'মি. প্যাকারের সাথে কি কথা হলো তোমার?'

'কি কথা হয়েছে তা তো আমি আপনাকে কাল রাতেই বললাম।'

'বললে, তিনি অসুস্থ। কি হয়েছে তাঁর?'

একটা কাঁধ সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে স্যানডোরা বলল, 'বলতে পারব না…খারাপ কিছু হবে। বেশিদিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না।'

'তাঁর সাথে তোমার কথা হবার সময় পোলো সেখানে ছিল?'

'অবশ্যই। ফটোটা তিনিই তো তুললেন, আমাকে বললেন, তোমার সাথে যে মি. প্যাকারের দেখা হয়েছে এটা তার একটা প্রমাণ।'

'পোলোর সাথে তাঁর সম্পর্ক কি রকম দেখলে?'

'ভাল বলেই তো মনে হলো। বেশিক্ষণ ছিলাম না আমরা। পোলো বললেন, জাহাজে করে রওনা হতে হবে আমাকে। আমার জন্যে একটা কার্গো ভেসেলের কেবিন বুক করেন তিনি। মি. প্যাকারের সাথে দেখা হবার ক'দিন পরই রওনা দিই আমি। এখানে আমার কাজ শেষ হয়েছে, কালই আমি প্লেনে করে ফিরে যাচ্ছি। আপনি যদি আমার সাথে আসেন, আপনাকে আমি মি. প্যাকারের কাছে নিয়ে যেতে পারব।'

'কাল? তা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'ভিসা পেতে হবে না? অপেক্ষা করো…'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল স্যানডোরা। 'দুঃখিত, মি. রানা। অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আমাকে কালই রওনা হতে হবে।'

'কাল কখন?'

'টোয়েনটি-ওয়ান ফিফটিতে আমার ফ্লাইট।'

'দেখি কি করা যায়। যদি ভিসা পাই, তোমার সাথে কোথায় যোগাযোগ করব?'

রানাকে একটা ওডিওঁ নম্বর দিয়ে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্যানডোরা। তারপর ঝুঁকে রানার কোল থেকে তুলে নিল ব্রিফকেসটা। রানাও দাঁড়াল। মেয়েটা ওর মতই লম্বা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ও।

'প্লেনে আপনি থাকবেন বলে আশা করব আমি,' বলল স্যানডোরা। 'ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা। বাকি বিশ হাজার পেলে তবেই আপনাকে আমি সাথে নিতে পারি। কাল এয়ারপোর্টে ওই টাকাটা আপনি আমাকে দেবেন।'

'কথা দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'তবে চেষ্টা করব।' এগিয়ে গিয়ে ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে ধরল ও, হাতে ব্রিফকেস নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত বেরিয়ে গেল স্যানডোরা। হাঁটার গতি শ্লথ না করে ডানে বাঁয়ে দেখে নিচ্ছে তীক্ষ্ণ চোখে। সোজা মেট্রোর দিকে হাঁটছে সে।

আরও দু'মিনিট পর ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'হিলটন।'

সুইং ডোর ঠেলে হোটেলের বারে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা, এত ভিড়, টেবিল খালি আছে কিনা সন্দেহ। উদ্ধার করল একজন ওয়েটার। সাথে করে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ার সহ একটা খালি টেবিলে বসাল ওকে। বিয়ারের অর্ডার দিল ও। তারপর তাকাল চারদিকে।

দু'জন লোককে নিয়ে কাছাকাছি একটা টেবিলে বসে আছে কার্ল হফার। তার সঙ্গীরা বয়স্ক, একজনের মাথায় চকচকে টাক, আরেকজনের মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। একজনের হাঁটুর ওপর একটা ব্রিফকেস। কথা যা বলার হফারই বলছে, মর্ম বুঝতে যাতে অসুবিধে না হয় মোটা আঙুল নেড়ে শব্দগুলো সে যেন অন্তরে গেঁথে দেবার প্রয়াস পাচ্ছে।

বিয়ার নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। এদিকে চোখ পড়েছে হফারের, কিন্তু এমন কোন ভাব দেখাল না যাতে মনে হতে পারে রানাকে চিনতে পেরেছে সে। খানিক পর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল তিনজনই, কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

বিয়ার শেষ করল রানা। ওর জায়গা থেকে দেখা গেল, লবিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। এক সময় করমর্দন করে বিদায় নিল ওরা, দু'জন বেরিয়ে গেল হোটেলের লবি থেকে, আর হফার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ডেস্কের সামনে। ডেস্ক ক্লার্কের সাথে কথা বলল সে, তারপর বারের দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল এলিভেটরে।

দু'মিনিট পর বিনীত ভঙ্গিতে একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল রানার টেবিলের সামনে। 'একশো সাতাশ নম্বর স্যুইটে মি. হফার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিল রানা। এলিভেটরে না চড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। করিডরে আর কেউ নেই দেখে নিয়ে নম্বর লাগানো কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল ও। একশো সাতাশ নম্বরের সামনে এসে আবার দু'দিকে তাকিয়ে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে নক করল দরজায়।

সাথে সাথে দরজা খুলে উঁকি দিল একজন জাপানী—পরনে সাদা কোট, কালো সিল্কের ট্রাউজার। তাকে পাশ কাটিয়ে ছোট একটা হলঘরে ঢুকল রানা। একটা দরজা খুলে ধরে বো করল জাপানী, বড়সড় একটা কামরায় ঢুকল রানা। দেখেই বোঝা যায়, এটা একটা বসার ঘর। তিন ধরনের অত্যন্ত আরামপ্রদ তিন সেট সোফা রয়েছে। ইজি চেয়ার, বিজি চেয়ার, শো-কেস ইত্যাদি দেখে মনে হতে পারে এটা বোধহয় কোন ফার্নিচারের দোকান। বড় একটা জানালার সামনে, দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল হফার, গভীর মনোযোগের সাথে

নিচের রাস্তায় যানবাহনের মিছিল দেখছে। রানার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'আসুন, মি. রানা,' পিছন না ফিরেই বলল হফার। 'বসুন।'

এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসল রানা।

'কি খাবেন বলুন,' রানার দিকে ফিরল হফার, কিন্তু ওর দিকে তাকাল না। এগিয়ে এসে বসল মুখোমুখি একটা সোফায়।

'হুইস্কি?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা।

নিচু টেবিলের দিকে তাকাল হফার, নানা ব্র্যান্ডের সিগারেট আর চুরুটের প্যাকেট রয়েছে ওখানে। 'আপনি ধূমপান করেন না?'

'না।'

খোলা প্যাকেট থেকে একটা চুরুট বেছে নিল হফার। লাইটার জ্বেলে ধরাল সেটা, ধোঁয়া ছাড়ল, সেই ধোঁয়ার দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'খবর ভাল তো, মি. রানা? মাদাম স্যানডোরার সাথে আপনি দেখা করেছেন?'

'করেছি,' বলল রানা। স্যানডোরার সাথে ওর সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল ও।

'সব শুনে সবজান্তার মত মাথা নাড়ল হফার, বলল, 'শুধু টাকা-টাকা করে, তাই না?'

'টাকার জন্যেই তো এত বড় ঝুঁকি নিয়ে প্যারিসে এসেছে বেচারি,' বলল রানা।

'ঝুঁকি?' ভুরু কুঁচকে উঠল হফারের। তারপর আপনমনে হাসল সে। 'হ্যাঁ, তা বটে। ঝুঁকি তো বটেই।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল, 'আপনার কি মনে হলো, সত্যি কথা বলছে ও?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ-ফটোগ্রাফটা বের করল রানা, নিচু টেবিলের ওপর রাখল সেটা। রানা কামরায় ঢোকার পর এই প্রথম ওর মুখের দিকে তাকাল হফার। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে ফটোটা তুলে পরীক্ষা করল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল সে, 'হ্যাঁ, সন্দেহ নেই—ওয়েন প্যাকারই।' টেবিলের ওপর ফটোটা নামিয়ে রাখল সে। 'আমি আপনার ওপর খুশি, মি. রানা। ভাল কাজ দেখিয়েছেন।'

কিছু বলল না রানা।

'তা, কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?' জিজ্ঞেস করল হফার।

'নির্ভর করে আপনার ওপর।'

ঠোঁটজোড়া একটু প্রসারিত হলো হফারের। 'ভেরি গুড। স্যানডোরার সাথে কাল আপনি যাচ্ছেন।'

'কিন্তু আমার ভিসা?'

ধোঁয়া ছাড়ার জন্যে একটু সময় নিল হফার, তারপর বলল, 'সে ব্যবস্থা আমি করব।'

চুপ করে থাকল রানা। এরপর হফারও কিছু বলল না। সিলিঙের দিকে চোখ রেখে একমনে চুরুট টানল কিছুক্ষণ, তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। 'এক

লাখ ডলার রোজগার করতে হলে খাটতে হবে আপনাকে, মি. রানা।'

এটা কোন প্রশ্ন নয়, কাজেই কথা বলার গরজ অনুভব করল না রানা।

'প্রথম যে কথাটা মনে রাখতে হবে,' আবার বলল হফার, 'প্যাকার যেন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে আপনি সীন ওয়াটের লোক, সে-ই পাঠিয়েছে আপনাকে।'

'ওয়াট কি করছে না করছে জানি না,' বলল রানা। 'সে যদি কাউকে পাঠায়…'

'তার হাতে কোন সূত্রই নেই,' বলল হফার, 'কোথায় লোক পাঠাবে সে? আমার বিশ্বাস, মেয়েটা কি বিক্রি করতে এসেছে তা-ই জানা নেই ওর। হয়তো ওয়েন প্যাকারের নামটা পর্যন্ত তার কানে যায়নি।'

'তাহলে তো ভালই।'

'প্যাকার। তার সাথে দেখা হলে প্রথম যে কথাটা জানার চেষ্টা করবেন, অফার করার মত কি আছে তার কাছে। কিছু আছে তো বটেই, সেটা গুরুত্বপূর্ণ না হয়েও পারে না, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

'রাশিয়া থেকে কি নিয়ে এসেছে সে, সে-ব্যাপারে আপনার কোন ধারণাই নেই?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা যাই হোক, সরাসরি আমার হাতে পৌঁছুতে হবে। সীন ওয়াট যেন ওর নাগাল না পায়। পরিষ্কার, মি. রানা?' হফারের চোখ দুটো হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ।'

'যখন বুঝবেন প্যাকারের আর কিছু বলার নেই,' বলল হফার, 'এবং যখন রাশিয়া থেকে কাগজ-পত্র যা নিয়ে এসেছে তার সবগুলো বুঝে পাবেন আপনি, তখন আর দেরি না করে তাকে আপনি শেষ করবেন। এ-প্রসঙ্গে আরও একটা নির্দেশ আছে আমার।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'তাকে আপনি খুন করবেন নিজের হাতে,' বলল হফার। 'কোন ভাড়াটে লোকের হাতে দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে পারবেন না। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মনে মনে বলল, শালা।

উঠল হফার, একটা ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দেরাজ খুলে বের করল ছোট একটা লাল সোনালি রঙের বাক্স। বাক্স খুলে ভেতর থেকে একটা আঙটি বের করল সে, এগিয়ে এসে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা, বলল, 'দেখুন তো, আপনার আঙুলে হয় কিনা।'

রানার ডান হাতের মধ্যমায় ঢুকল আঙটি। লক্ষ্য করে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হফার, হাত বাড়িয়ে ফেরত নিল সেটা।

'এটা সাধারণ কোন আঙটি নয়,' বলল সে। 'কিভাবে কাজ করে জানতে হলে আপনাকে একবার দাঁড়াতে হবে, মি. রানা।'

উঠে হফারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'এই যে ইনিশিয়াল খোদাই করা খুদে প্লেটটা দেখছেন, এটা এক পাশে সরানো যায়,' বলল হফার। 'এভাবে।' আঙটির একটা পাশে চাপ দিতেই ওপরের

সমতল মাথা সরে গেল এক পাশে। প্লেট সরে যাওয়ায় ভেতরে একটা ছোট্ট গর্ত দেখা গেল, সেটা থেকে প্লেটের লেভেল ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা জিনিস, দেখে মনে হলো, খাড়া একটা চুল। 'প্যাকারকে আপনার নিজের হাতে খুন করতে হলেও, কোন অসুবিধে হবে না। বিদায় নেবার সময় তার সাথে আপনি নিশ্চয়ই হ্যান্ডশেক করবেন, তাই না?'

'করলাম।'

'হ্যান্ডশেক করার সময় শুধু এই আঙটি আপনি উল্টো করে পরে থাকবেন,' বলল হফার। 'তারমানে, আঙটির মাথার দিকটা থাকবে আপনার আঙুলের সিধে দিকে। এই যে ছোট্ট কাঁটাটা দেখছেন, হ্যান্ডশেক করার সময় প্যাকারের আঙুল এটার স্পর্শ পাবে। ব্যস, আর কিছুর দরকার নেই।'

এক পা পিছিয়ে চেয়ারে বসল রানা। 'তাই?'

'হ্যান্ডশেক করার ঠিক একঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে ওয়েন প্যাকার,' নিষ্ঠুর চেহারায় অদ্ভুত এক বিজয়ীর হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল হফার। 'সে অসুস্থ হওয়ায় সুবিধেই হয়েছে, হঠাৎ করে তার মৃত্যু হলে কারও মনে কোন প্রশ্ন দেখা দেবে না।'

'কিন্তু যদি পোস্ট-মর্টেম হয়?'

মুচকি একটু হাসল হফার, যেন এই ধরনের একটা প্রশ্নই রানার কাছ থেকে আশা করছিল সে, বলল, 'পোস্ট-মর্টেম যদি হয়ও, মি. রানা, ওই ছোট্ট কাঁটাটিতে যে বিষ আছে তা এত দুষ্প্রাপ্য, ওই এলাকার কোন ডাক্তার সেটাকে চিনতে পারবে না।' প্লেটটা আঙটির মাথায় বসিয়ে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সেটা। খপ করে লুফে নিল রানা। 'আপনাকে স্বীকার করতে হবে, কাজটা একেবারে পানির মত সহজ করে দিচ্ছি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এরই মধ্যে মনে মনে উপায় খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে ও, ওই আঙটি পরে কিভাবে হ্যান্ডশেক করা যায় হফারের সাথে।

পাশের ঘর থেকে ঘুরে এসে চেয়ারে বসল হফার, জানতে চাইল, 'চেহারা বদলের ব্যাপারে আপনি একজন এক্সপার্ট, ধরে নিতে পারি?'

'এক্সপার্ট না হলেও, কাজ চালিয়ে নিতে পারি। কেন?'

'সীন ওয়াটকে ছোট করে দেখতে পারি না আমরা,' বলল হফার। অ্যাশট্রের আধপোড়া চুরুটের দিকে হাত না বাড়িয়ে প্যাকেট থেকে নতুন একটা বেছে নিল সে। 'সন্দেহ নেই, সেলার ক্লাবে গিয়েছিল সে। তারমানে, আপনার এবং মাদাম স্যানডোরার চেহারার বর্ণনা পেয়ে গেছে। ঠিক?'

'বোধহয়।'

'মাদাম স্যানডোরার ব্যাপারে করার কিছু নেই আমাদের। ওয়াটের লোকজন এয়ারপোর্টে নজর রাখলে ধরা পড়ে যাবে মেয়েটা।' লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরাল হফার। চুরুটের মাথাটা ভালভাবে ধরেছে কিনা দেখার জন্যে চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল, চেহারায় ফুটে উঠল তৃপ্তির ছাপ। 'এই ঝুঁকি কমাবার কোন উপায় নেই আমাদের। কিন্তু আপনার ধরা পড়া চলবে না। কাজেই আপনার ছদ্মবেশ হতে হবে নিখুঁত।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না, সব দিক ভেবে নিয়ে তারপর এগোচ্ছে হফার।

'প্যাসেঞ্জারদের তালিকায় মাত্র ছ'টা নাম রয়েছে,' বলল সে। 'পাঁচজন ব্যবসায়ী থাকছে প্লেনে, কারও সাথে সঙ্গী নেই। এদের একজন আমেরিকান, একজন ভারতীয়, একজন তুর্কী, একজন বার্মিজ, শেষজন গ্রীক। আপনি হবেন ছ'নম্বর ব্যবসায়ী, মেক্সিকান।'

'পাসপোর্ট?'

'কাল সকালে ফচেট পৌঁছে দেবে আপনার হাতে,' বলল হফার। 'হুয়ান ফার্নান্দেজ নামে ফ্লাই করবেন আপনি। সারা দুনিয়ায় নাম করেছে এই রকম একটা কোম্পানি ডাকারের বাইরে তাদের কারখানা খুলেছে, তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্যে ওখানে আরও একটা কারখানা খোলা যায় কিনা সেই সম্ভাবনা বিবেচনা করাই আপনার এই ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির নাম, বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিল্ডার্স।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল রানা।

'আপনার ভুললে চলবে না, রাশিয়ানরাও প্যাকারকে খুঁজছে,' বলল হফার, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে হাতের চুরুটের দিকে। 'ডাকারে তাদের এজেন্ট থাকবে। প্লেনে করে যারা পৌঁছবে, তাদের সাথে আপনাকেও সন্দেহ হবে তাদের। ওখানে পৌঁছে হোটেল ডি প্যালেসে দু'দিন থাকবেন আপনি। এই দু'দিন আপনি প্যাকারের সাথে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা করবেন না। আমি যেসব কাগজ-পত্র দেব আপনাকে, আপনি সেগুলো হোটেলে নিজের কামরায় রেখে বাইরে বেরুবেন, এতে করে তাদের কৌতূহল মেটাবার একটা ব্যবস্থা হবে। দু'দিন পর, তার আগে নয়, প্যাকারের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনি। কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে প্রশ্ন করুন, মি. রানা।'

'কিন্তু মাদাম স্যানডোরাকে যদি এখানে এয়ারপোর্টে আটকে দেয়া হয়?' প্রশ্ন করল রানা।

ভারি কাঁধ তুলে শ্রাগ করল হফার, তাকাল রানার দিকে। 'আপনার তাতে কিছু এসে যাবে না। তাকে ছাড়াই প্লেনে চড়বেন আপনি। মেয়েটার সাহায্য না পেলে প্যাকারকে খুঁজে বের করতে একটু হয়তো বেশি সময় লাগবে, কিন্তু আপনার হাতে ক্লু থাকায় কাজটা আপনি একাই সারতে পারবেন।' চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'অন্তত দুটো সূত্র রয়েছে আপনার হাতে। দি টাওয়ার হোটেল আর পর্তুগীজ লোকটা। প্যাকার কোথায় আছে, নিশ্চয়ই জানে সে। মাদাম স্যানডোরার সাহায্য না পেলে এই লোকের ওপর ভরসা করতে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু স্যানডোরা গ্রেফতার হলেই বুঝতে পারবে, আমি ওয়াটের লোক নই,' বলল রানা। 'তখন মুখ খুলবে সে।'

'তাতেও আপনার কিছু এসে যাবে না,' বলল হফার। 'ওসব দিক সামলানো হবে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তার গ্রেফতার না হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' রানার দিকে তাকাল। 'আপনি ডেরায় ফিরছেন না, মি. রানা। আশরাফ চৌধুরী কাজটা কাকে দিয়ে গেছে, এটা জানার জন্যে লোক লাগিয়েছে ওয়াট। হয়তো এরই মধ্যে

আপনার সম্পর্কে জেনে ফেলেছে সে। গার্ডেন হোটেলে আপনার জন্যে স্যুইট ভাড়া করা হয়েছে। আমার ব্যবসায়ী বন্ধুদের ওখানেই তুলি। ওরা আপনাকে পুলিস ফর্ম পূরণ করতে বলবে না। কাল সকাল দশটায় ফচেট না পৌছানো পর্যন্ত ওই স্যুইট থেকে বেরুবেন না আপনি। সেনেগালে যাবার জন্যে যা যা আপনার দরকার সব নিয়ে যাবে সে।'

চেয়ার ছেড়ে নড়ল না রানা। বলল, 'স্যানডোরা বলে দিয়েছে বাকি ত্রিশ হাজার না পেলে আমাকে সাথে নেবে না সে।'

কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল হফার। 'এখনও আপনি বাড়ছেন, মি. রানা?'

দেঁতো হাসি হেসে রানা বলল, 'সংসর্গের একটা গুণ আছে না?'

'ঠিক আছে,' বলল হফার। 'টাকা যাতে পান তার ব্যবস্থা করব আমি। গুড লাক, মি. রানা...'

'এ-তো গেল স্যানডোরার ব্যাপার,' বলল রানা, চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'এবার আমার ব্যাপারে কিছু শোনা যাক।'

'কাজ শেষ হওয়ার আগে টাকা কিসের?' কঠিন শোনাল হফারের কণ্ঠস্বর।

'কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন আবার টাকা কিসের—তখন যদি আপনি এই কথা বলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না, এই কথা বোঝাতে চাইছেন, মি. রানা?' চেহারা থমথমে হয়ে উঠল হফারের।

'বিশ্বাস আমি কাউকে করি না, এই ধরনের একটা কথা অতি সম্প্রতি কে যেন শুনিয়েছে আমাকে, মি. হফার,' বলল রানা। 'আমি শিখছি।'

ঝুঁকে পড়ে হাতের চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল হফার। সিধে হবার সময় তাকাল রানার চোখে। 'কত?'

'কাজের আগে অর্ধেক, কাজ শেষ হলে অর্ধেক,' বলল রানা। হাসিটা ফিরে এসেছে ঠোঁটে। 'আপনার কোন আপত্তি আছে কি?'

'নেই,' গম্ভীর সুরে বলল হফার। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'এই টাকাও যাতে পান তার ব্যবস্থা করব আমি। গুড লাক, মি. রানা। আবার যখন আমাদের দেখা হবে, প্যাকার মারা গেছে এই খবরটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইব আমি।'

উত্তরে কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, পা বাড়াল দরজার দিকে। গুড নাইট বা আর কিছু না বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও।

জানালার সামনে আরও মিনিটখানেক নিথর দাঁড়িয়ে থাকল হফার। জাপানী লোকটা ঘরে ঢুকে জানাল, মেহমান বিদায় নিয়েছেন।

'ফচেটের সাথে কথা বলতে চাই,' বলল হফার। 'কোথায় আছে দেখো।'

বো করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জাপানী।

নয়

দীর্ঘদেহী, নিষ্ঠুর চেহারার লোক ক্যাপ্টেন লেসলি টমাস। বয়স ত্রিশের কোঠায়, মুখটা টকটকে লাল। বক্সারের মত নাকটা থ্যাবড়া; চোখে সতর্ক, কঠিন দৃষ্টি। আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি, সীন ওয়াটের অফিস কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে, পীক ক্যাপটা মাথা থেকে নামাল, তারপর বসতে বলার অনুরোধের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল।

একটা খোলা ফাইল নিয়ে কাজ করছিল ওয়াট, সরিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাল সে, বলল, 'হ্যালো, ক্যাপ্টেন। এসো, বসো। কোন খবর পেলে?'

'আধ ঘণ্টা আগে আরেকটু হলে মেয়েটাকে আমরা ধরেই ফেলেছিলাম,' ডেস্কের দিকে মুখ করে একটা বিশাল লেদার চেয়ারে বসল টমাস।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওয়াটের। 'তাই?'

'মাদাম স্যানডোরা, ডাকার, এই পরিচয়ে ড্যাফোডিল হোটেলে তিন দিন আগে উঠেছিল সে। আজ ছ'টায় হোটেল ছেড়ে চলে যায়। চেহারার যে বর্ণনা রয়েছে আমার কাছে তার সাথে হোটেলের লোকদের দেয়া বিবরণ মিলিয়ে দেখেছি, একেই খুঁজছি আমরা। হোটেলে একাই ছিল, বেরিয়েও গেছে একা। সম্ভবত অন্য কোন হোটেলে উঠেছে আবার। চেকিঙের কাজ বন্ধ নেই, সব ক'টা হোটেলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।'

'নিগেল চ্যাপম্যানের কোন খবর?'

'হিলটনের আশপাশে যায়নি সে। ওখানে দু'জনকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, দেখা পেলেই খপ করে ধরবে। কিন্তু দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, গা ঢাকা দিয়েছে সে। অন্তত হিলটন এলাকা এড়িয়ে থাকছে।'

'কার্ল হফারের সাথে দেখা করেছে কেউ?' জানতে চাইল ওয়াট।

'অনেকেই। কিছু লোককে আমরা চিনি, কিছু লোককে চিনি না।'

ব্লটারের বাঁ দিক থেকে লেটার ওপেনারটা সরিয়ে ডান দিকে নিয়ে এল ওয়াট। 'একজন এশিয়ান লোককে খুঁজছি আমি,' খানিক চিন্তা-ভাবনা করার পর বলল সে। 'একজন বাংলাদেশী। এই ব্যাপারটার সাথে লোকটার সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার কাছে তার চেহারার বর্ণনা আছে।' দেরাজ খুলে একটা কাগজ বের করল সে, টমাসের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'এই লোককে কিভাবে খুঁজে বের করা যায়, কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

বর্ণনাটা পড়ল টমাস। তারপর মুখ তুলে হালকা নীল চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে জানতে চাইল, 'কেন মনে হচ্ছে এই লোক সাহায্য করতে পারবে?'

আঙুল ভাঁজ করে খাড়া নাকটা ঘষার ছুতোয় টমাসের পুলিসী দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করল ওয়াট। সেনেগালিজ মেয়েটার সাথে কথা বলার আগে টমাসকে খুব বেশি খুঁটিনাটি জানানো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বলল, 'লোকটাকে

আমাদের কেন দরকার, বা আমাদের কি কাজে আসবে সে, এসব তোমাকে এখুনি জানানো সম্ভব নয়, ক্যাপ্টেন। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরী।'

'তার এই চেহারার বর্ণনা কোত্থেকে পেয়েছেন আপনি, স্যার?'

'লোকটার নাম মিলটন,' বলল ওয়াট। 'সেলার ক্লাব সুইট প্যারিসের ম্যানেজার।'

টমাসের চেহারায় আগ্রহের ভাব দেখা গেল। 'ক্লাবটা চিনি। সাংঘাতিক নোংরা। ম্যানেজারের সাথে দু'একবার গোলমাল হয়েছে আমাদের। পুলিসের নাম শুনলে রক্ত নেমে যায় চেহারা থেকে। আপনি বললে ফ্রেঞ্চ হেডকোয়ার্টার থেকে কাউকে নিয়ে ওর সাথে দেখা করতে যেতে পারি আমি। ব্যাটা হয়তো অনেক কথা চেপে গেছে।'

'ফ্রেঞ্চ পুলিসকে এর মধ্যে টেনো না, ক্যাপ্টেন!' তীক্ষ্ণ সুরে বলল ওয়াট।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে চেহারা আরও যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল টমাসের। তাড়াতাড়ি বলল সে, 'ইয়েস, স্যার!'

'তুমি নিজে যা পারো, করো,' বলল ওয়াট। নিজেকে সামলে নিয়েছে সে।

'এই লোকটা, আপনি যাকে খুঁজছেন, সে কি প্যারিসে থাকে?'

'তাই তো থাকার কথা।'

'কোন বিদেশী এখানে ঘর-বাড়ি নিয়ে কিছুদিন থাকতে চাইলে পুলিস বিভাগের অনুমতি পেতে হবে তাকে,' বলল টমাস। 'যারা আবেদন করে তাদের ডোশিয়ে এবং ফটো থাকে ওখানে। আপনি বললে মিলটনকে নিয়ে যেতে পারি, ফটো দেখে সে চিনতে পারবে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল ওয়াট, ইচ্ছে হলো নিজের মাথার চুল ছেঁড়ে। এই সমস্যার এত সহজ সমাধান আছে, অথচ লোকটার চেহারার বর্ণনা পাওয়ার সাথে সাথে তার মাথায় বুদ্ধিটা আসেনি।

'আমি খুব খুশি হব, ক্যাপ্টেন,' বলল ওয়াট। 'কখন তুমি রওনা হতে পারবে?'

ঘড়ির দিকে তাকাল টমাস। 'এখনই নয় কেন?' তারপর মাথা নাড়ল সে, আবার বলল, 'না, ক্লাব খোলে দশটায়। ঠিক আছে, দশটার দিকে দু'জন লোককে পাঠাব ওখানে, তারাই মিলটনকে নিয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারে চলে আসবে। ওখানে থাকব আমি। লোকটা যদি প্যারিসে বসবাস করার অনুমতি পেয়ে থাকে, তার সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ পেয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু এই মেয়েটার ব্যাপারে ঢিল দিলে চলবে না, ক্যাপ্টেন!' মনে করিয়ে দিল ওয়াট।

'তার কথা আমার মনে আছে, স্যার।'

'বাংলাদেশী লোকটার পরিচয় যদি পাও, যত রাতই হোক আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন কোরো।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টমাস। 'ঠিক আছে,' বলে মাথা ঝাঁকাল সে, বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল ওয়াট, তারপর হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে।

'জাল ছোট হয়ে আসছে,' অপরপ্রান্তে পাপিতা আসতে তাকে বলল সে, 'এই খানিক আগে লেসলি টমাস একটুর জন্যে ধরতে পারেনি মেয়েটাকে। আশরাফ যাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছিল তার পরিচয় উদ্ধার করার জন্যে লাগিয়েছি ওকে। আমি আশা করছি মাঝরাতের আগেই জানা যাবে লোকটা কে।'

'কিংবা কে ছিল,' বলল পাপিতা। 'দেখুন, মি. ওয়াট, আমি খুব ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে নির্ঝঞ্ঝাট হতে হবে আমাকে।'

'হঠাৎ এত ব্যস্ততা কিসের?' জানতে চাইল ওয়াট।

'কাল রাতে ডাকার ফ্লাইট ধরছি আমি,' বলল পাপিতা।

এক পলকে শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে গেল ওয়াটের। 'কি বললে?'

'আমি ডাকার যাচ্ছি।'

'আমি তোমাকে সে অধিকার দেইনি। আমার অনুমতি না নিয়ে এ-ধরনের একটা সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারো না। বিরাট খরচের জার্নি, তাছাড়া ওখানে তোমার যাবার আমি কোন কারণও দেখি না।'

'নিজের খরচে যাচ্ছি আমি, মি. ওয়াট,' দৃঢ় সুরে বলল পাপিতা। 'এখানে আমি যতটুকু কাজে লাগছি তারচেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগব ওখানে। আপনি যাই বলুন, আমার বিশ্বাস, আশরাফ চৌধুরীর লোক বেঁচে নেই। আপনি বরং ডাকারের মার্কিন দূতাবাসকে ফোন করে জানিয়ে দিন, আমি আসছি। ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ওয়াট। ডিভিশনকে খরচের বোঝা বইতে হবে না জানতে পেরে ব্যাপারটা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল। স্পটে একজনকে রাখতে পারলে খুবই ভাল হয়, ভাবল সে। বলল, 'তুমি যখন চাইছ, ঠিক আছে। বলা যায় না, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে। ভিসা লাগবে, তাই না?'

'সে-ব্যবস্থা করেছি,' দ্রুত বলল পাপিতা। 'ভাল কোন কিছু জানতে পারলে ওখান থেকে ফোন করব আপনাকে। গুডবাই, মি. ওয়াট।' লাইন কেটে গেল।

দশটার খানিক পর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল ওয়াট। দূতাবাস থেকে নিয়ে আসা কাগজ-পত্র সাজিয়ে ডেস্কে বসল সে, কাজ শুরু করল। মাঝরাতের দিকে শেষ হলো কাজ, কাগজ-পত্র দেরাজে ঢুকিয়ে রেখে তালা দিল তাতে, তারপর ইজি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল সে। এত দেরি করছে কেন টমাস?

একটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে ফোন বাজল। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ওয়াট। 'ইয়েস?'

'আপনার লোককে আমরা পেয়েছি, স্যার,' লেসলি টমাসের পুলিসী কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় একটু কাঁপা কাঁপা শোনাল ওয়াটের কানে। 'নাম, মাসুদ রানা।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ওয়াট। তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি বললে?'

'রানা ইনভেস্টিগেশনের চীফ। মাত্র কয়েক দিন আগে প্যারিসে এসেছে,' ধীরে ধীরে বলছে টমাস, ওয়াটের যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয়। 'রানা ইনভেস্টিগেশনের ঠিকানায় থাকে, দোতলায়। ফোন করতে আমার দেরি হলো, কারণ, দু'জন লোককে সাথে নিয়ে ওখানে আমি গিয়েছিলাম। প্রথমে গিয়েছিলাম

ওদের অফিসে, কিন্তু ওরা আমাদেরকে কোন পাত্তাই দিল না। মাসুদ রানা প্যারিসে, স্বীকার না করে কোন উপায় ছিল না ওদের, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যাবে বা এই মুহূর্তে তার হাতে কোন কাজ আছে কিনা জানতে চাইলে পরিষ্কার রাস্তা মাপতে বলল।'

'তারপর?'

'ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সাইড রোডে ঢুকলাম, দেখলাম, দোতলায় আলো জ্বলছে না,' বলল টমাস। 'গেট টপকে ভেতরে ঢুকলাম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। সাথে মাস্টার কী ছিল, ঘরে ঢুকতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ঘরগুলো সার্চ করে এমন কিছু পাইনি আমরা...'

'কাজটা বোধহয় ভাল করোনি,' গম্ভীর সুরে বলল ওয়াট। 'এই লোক অত্যন্ত স্পর্শকাতর, জানতে পারলে...কি জানো, সে যদি চায় আমাদেরকে এড়িয়ে যাবে, পারবে। কিন্তু এড়িয়ে যাবার কারণটা আমি বুঝতে অক্ষম। আমরা তার মক্কে...' হঠাৎ মুখ সামলে চুপ মেরে গেল সে, বুঝতে পারল, বেশি কথা বলে ফেলেছে।

'আমরা এখন তাহলে কি করব, স্যার?' জানতে চাইল টমাস। 'রানার বাড়ির সামনে একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। সে ফিরলে আমরা কি তাকে...'

'জোর-জবরদস্তির প্রশ্নই ওঠে না,' তাড়াতাড়ি বলল ওয়াট। 'ফিরলে, সাথে সাথে খবর দিতে হবে আমাকে। আমি নিজে যাব তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'ঠিক আছে।'

'এক মিনিট,' বলে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল ওয়াট। তারপর বলল, 'মেয়েটার সাথে ডাকারে যাবার প্ল্যানও করে থাকতে পারে মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টে নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। সম্ভব?'

'এরই মধ্যে এয়ারপোর্টে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে, স্যার,' বলল টমাস। 'আর কিছু?'

'যদি দেখো প্লেনে চড়ে চলে যাচ্ছে, আমার কথা বলে ফ্লাইট বাতিল করার অনুরোধ করতে হবে তাকে,' বলল ওয়াট। 'অনুরোধ যদি না মানে...হ্যাঁ, আর যখন কোন উপায় নেই, তাকে বাধা দিতে হবে। কিন্তু সাবধান, তার যেন কোন অসম্মান না হয়। মনে রাখতে হবে, এই লোক আমাদের শত্রু নয়। আমার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও, জানি, অনেক সঙ্কট থেকে সি.আই.এ.-কে উদ্ধার করেছে এই লোকটা।'

'বুঝেছি, স্যার।'

পরদিন সকাল দশটার কিছু পর নক হলো রানার হোটেল রুমের দরজায়।

বেলা করে ঘুম থেকে উঠে এইমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরেছে রানা।

সামনে ধূমায়িত কফির কাপ দিয়ে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে চোখ বুলাচ্ছিল, ঝট করে মুখ তুলে তাকাল দরজার দিকে, হাত চলে গেল টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পয়েন্ট ফরটি ফাইভের দিকে। অটোমেটিকটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে উঠল ও, দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'কে?'

'আমরা বন্ধু।'

ফচেটের গলা পেয়ে খবরের কাগজের তলায় পিস্তলটা রেখে দিল রানা, তারপর দরজা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে। ভেতরে ঢুকল ফচেট, পিছু পিছু এল রোগা-পাতলা, বয়স্ক এক লোক। তার মাথার চুল ধবধবে সাদা। দরজা বন্ধ করে ফিরল রানা, দেখল গায়ের ওভারকোট খুলে একটা চেয়ারের হাতলে রাখছে সে।

'ও স্যাম,' আঙুল ঝাঁকিয়ে তাকে দেখিয়ে বলল ফচেট। 'তোমার চেহারার ওপর কেরামতি দেখাবে।' মুখভঙ্গি করে বোঝাতে চাইল, স্যামের গুণে মুগ্ধ সে। 'ওর হাতে ধরা দাও, খানিক পর নিজেকে চিনতে পারবে না।'

সাথে করে নিয়ে আসা সুটকেসটা খুলল স্যাম, নিঃশ্বাসের সাথে গুণগুণ করে জনপ্রিয় গানের কলি ভাঁজছে। সুটকেস থেকে ছোটবড় নানা আকৃতির বোতল, কৌটা, বাক্স, কাঁচি, তোয়ালে, স্পঞ্জ আর চিরুনি বের করল সে।

'এখন যদি, স্যার, আপনি, হে-হে, দয়া করে এখানে এসে বসেন,' একগাল হেসে বলল স্যাম, 'খুব ভাল হয়।'

একটা কাঠের চেয়ারে বসল রানা, মাথা আর মুখ বাদ রেখে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে ফেলা হলো ওকে। আরেকটা চেয়ারে বসে হেলান দিল ফচেট, সিগারেট ধরিয়ে পা দোলাতে লাগল। 'কাল রাতে ব্যাগ রেখে গিয়েছিলাম হোটেলে, পেয়েছ তো?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। পথ দেখিয়ে পোর্টার তাকে এই কামরায় নিয়ে আসে, ভেতরে ঢুকে অত্যন্ত দামী একটা এয়ার লাগেজ দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। পোর্টারকে বিদায় করে দিয়ে ব্যাগটা খোলে ও। ভেতরে পায় তিনটে ট্রপিক্যাল স্যুট, ছ'টা শার্ট, পাজামা। রুমাল, স্পোর্টস ড্রেস, একটা ড্রেসিং-গাউন, স্লিপার, ছ'টা টাই, টয়লেট সরঞ্জাম, একটা লাইট ওয়েট রেনকোট, সানগ্লাস এবং ব্যবহার করা একটা মানিব্যাগ, যার গায়ে ইংরেজী বর্ণমালার দুটো সোনালি অক্ষর লেখা রয়েছে—জে.এফ.। ভেতরে ঠাসা সেনেগালিজ টাকা। এই আয়োজন দেখে মনে মনে আরেকবার স্বীকার করল ও, খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে নজর রাখতে জানে কার্ল হফার। সত্যিই লোকটার তুলনা মেলা ভার।

'ওটা একটা ট্রিক ব্যাগ,' বলল ফচেট। 'ফলস বটম আছে। বিপদে পড়লে যা যা দরকার, সব তুমি পাবে ওতে। স্যামের কাজ শেষ হলে দেখিয়ে দেব কিভাবে খুলতে হয়।'

এই মুহূর্তে অত্যন্ত মনোযোগ আর ব্যস্ততার সাথে রানার লম্বা চুল ছেঁটে কেটে ভদ্র সাইজে নামিয়ে আনছে স্যাম। এরপর রানাকে নিয়ে বাথরুমে চলে এল সে, কড়া পেরক্সাইড দিয়ে ধুলো ওকে। সময় সম্পর্কে কোন ধারণা থাকল না রানার। মাঝে মধ্যে রানার দিকে তাকাল ফচেট, বিড়বিড় করে 'মাই গড!' বলে আবার মন দিল হাতের কাগজে। আড়াই ঘণ্টা পর পিছিয়ে গেল স্যাম, ঘোষণা করল সে সন্তুষ্ট।

এবার সুটকেস থেকে সুন্দর ভাবে কাটা একটা ভারী স্যুট বের করল সে। তারই সাথে বেরল সাদা শার্ট, পকেটে জে.এফ. এমব্রয়ডারি করা। এগুলো রানাকে পরতে বলে সুটকেস থেকে একজোড়া ব্রোগ জুতো বের করল।

কাপড়চোপড় পরা শেষ করে তার হাত থেকে কয়েকটা জিনিস নিল রানা। একটা সোনালি সিগারেট কেস, এতেও নামের আদ্যাক্ষর খোদাই করা রয়েছে। একটা সোনালি সিগারেট লাইটার, একটা মনোগ্রাম করা রুমাল, ফ্রেঞ্চ রেজকি, ইত্যাদি। বিভিন্ন পকেটে এগুলো ভরল ও। সবশেষে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল ফচেট, চেহারায় রহস্যময় হাসি ঝুলিয়ে রানার দিকে একটা ফোল্ডার বাড়িয়ে দিল সে। হাতে নিয়ে সেটার ভাঁজ খুলল রানা। দেখল, ডাইনার্স ক্লাবের কার্ড এটা। হুয়ান ফার্নান্দেজের নামে ইস্যু করা হয়েছে।

'প্লীজ, মি. ফার্নান্দেজ,' বলল ফচেট, 'এবার আপনি দয়া করে ওই আয়নার সামনে একটু দাঁড়ান, আমরা সবাই কৃতার্থ হই।' কামরার শেষ প্রান্তে ড্রেসিং টেবিল, ইঙ্গিতে সেদিকটা দেখাল সে।

এগিয়ে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল রানা। চুল কেটে ছোট করা হয়েছে পরচুলাটা যাতে ভালভাবে বসে। লম্বা এক লোকের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। লোকটার গায়ের রঙ লালচে-সাদা। অস্বাভাবিক চওড়া ঘন লালচে গোঁফ। জুলফি জোড়া প্রায় গোঁফের কিনারা পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথায় ফুলে আছে ঢেউ খেলান চুল। মেদহীন তীক্ষ্ণ মুখের চেহারা বদলে গিয়ে ফোলা-ফোলা একটা ভাব এসে গেছে। মুখের মধ্যে রাবারের ছোট সাকশন প্যাড লাগিয়ে গালের ছোট ছোট ভাঁজগুলো পর্যন্ত বদলে দেয়া হয়েছে। স্যামের কাজে কোন খুঁত নেই, মুখের সাথে হাত আর পায়ের রঙও বদলে দিয়েছে সে। পরিবর্তনটা এমনই বিস্ময়কর, হাত আর ঠোঁট নেড়ে যখন দেখল আয়নার ছায়াটাও তাই করছে তখন বিশ্বাস করল রানা, যে লোকটা আসলে ও-ই।

তাড়াতাড়ি সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল একবার স্যাম, অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'লোকটা জাদু জানে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ফচেট।

'গুণী লোক,' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু এসব টিকবে তো? এই গোঁফ, জুলফি, লালচে চুল?'

'ওগুলো রঙ বদলাতে প্রচুর সময় নেয়,' বলল ফচেট। 'তাছাড়া ইচ্ছে করলেই নতুন করে রঙ লাগানো যায়। ওয়াটারপ্রুফ চুল, পানি লাগলেও কিছু হবে না। এবার এসো, ব্যাগের ফলস বটম কিভাবে খুলতে হয় দেখিয়ে দিই।'

ফলস বটমে পাওয়া গেল একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট অটোমেটিক, একটা ছুরি, তরল পদার্থ ভরা একটা ছোট বোতল। ফচেট বলল, 'এই বোতলে নক-আউট ড্রপ আছে। এক গ্লাস পানিতে মাত্র এক ফোঁটা ফেলতে হবে, যে খাবে ছ'ঘণ্টা আর ঘুম থেকে জাগতে হবে না তাকে। দেখো, ভুল করে নিজে খেয়ে ফেলো না।' রানার চেহারায় বিরক্তি আর রাগের ভাব ফুটে উঠতে শুরু করায় তাড়াতাড়ি বলল সে, 'ঠাট্টা করলাম!'

ফলস বটমে একশো রাউন্ড অ্যামুনিশন ছাড়াও আরও দু'একটা জিনিস রয়েছে।

'এগুলো দেখে বলো, কিছু বাদ পড়ে গেছে কিনা,' বলল ফচেট। 'এখুনি ব্যবস্থা করতে পারব আমি। বস্ বলে দিয়েছেন, তোমাকে ভি.আই.পি-র মর্যাদা

দিতে হবে।'

'আর কিছু দরকার নেই,' বলল রানা।

সাথে করে নিয়ে আসা ব্রিফকেসটা বিছানার ওপর ফেলে পাশে বসল ফচেট। 'বাকি দিনটা এই সব কাগজ-পত্র ঘেঁটে কাটাও,' বলল সে। মেক্সিকোর, গুয়াডালাজার-এ পিক কর্পোরেশন নামে একটা কোম্পানি আছে, তার প্রতিনিধিত্ব করছ তুমি। তোমার কোম্পানি ডাকারে একটা কারখানা তৈরি করতে চায়, তুমি সম্ভাবনা যাচাই করতে যাচ্ছ। কোম্পানির সমস্ত ব্যাপার মুখস্থ রাখতে হবে—ডিরেক্টরদের নাম, সেলস-ম্যানেজারদের নাম, কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড।'

'নিশ্চয়ই হফারের খেলনা?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই,' মুচকি হেসে বলল ফচেট। 'কেউ যদি চেক করে, তোমাকে সমর্থন করা হবে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'লাঞ্চের সময় হয়ে এল। হোটেলের বিল মিটিয়ে দেব আমি, তারপর তোমার ব্যাগ নিয়ে যাব এয়ার টার্মিনালে।'

'আর আমি?'

'কেটে পড়ো,' বলল ফচেট। 'স্রেফ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাও। কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না।'

'টাকা?' জানতে চাইল রানা।

'বলিনি বুঝি?' হাসল ফচেট। 'ব্রিফকেসে আছে…আশি হাজার। এমন কোথাও যাও, নিরিবিলিতে বসে যাতে কাগজ-পত্রগুলো দেখতে পারো।'

বিছানা থেকে ভারী ব্রিফকেস তুলে নিল রানা।

'গুডলাক, রানা…থুড়ি, গুরু!' বলে হাসতে লাগল ফচেট।

পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়িতে কারও সাথে দেখা হলো না। নিচের করিডরে একজন পোর্টারের সামনে পড়ে গেল, কিন্তু একজন বোর্ডারকে নিয়ে আসছে সে, ওকে তেমন খেয়াল করে দেখল না। লবিতে অনেকেই দেখল ওকে, বিশেষভাবে নজর দিল না কেউ। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি না নিয়ে হাঁটতে লাগল ও। পাঁচশো গজ এগিয়ে ঢুকে পড়ল ব্যাংকে। কাগজ-পত্র সই করে একটা লকার ভাড়া করল ও। নির্জন বেসমেন্টে নেমে এসে টেবিলের ওপর ব্রিফকেস রেখে খুলল সেটা। ষাট হাজার ডলার লকারে রেখে তালা দিল তাতে, চাবিটা ফেলল কোটের পকেটে। ব্রিফকেসের বাকি টাকা গুণে দেখল, বিশ হাজার ঠিকই আছে।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে একটা কাফেতে ঢুকল রানা, স্যানডোরার দেয়া নাম্বারে ডায়াল করল। অপরপ্রান্তে এল সে, নিজের পরিচয় দিল ও, বলল, 'আজ রাতে তোমার প্লেনে আমি থাকছি।'

'আমি তো বলেই দিয়েছি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল স্যানডোরা, 'বাকি টাকা না পেলে আপনাকে আমি সাথে নেব না।'

'তোমাকে দেব বলে টাকা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি,' বলল রানা।

'তুমি কোথায়?' দ্রুত জানতে চাইল স্যানডোরা।

মুচকি হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। তারপর একটু গম্ভীর হলো চেহারা। বলল, 'তোমার ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানো ঠিক নয়, তবু জিজ্ঞেস করছি, এই

টাকার কি ব্যবস্থা করবে তুমি? যদি ভেবে থাকো কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে...'

'সাবধান করে দেবার জন্যে অনেক, অনেক ধন্যবাদ,' বলল স্যানডোরা। 'গ্রীন হোটেলে আছি আমি। টাকাটা হল পোর্টারের কাছে রেখে যেতে পারবেন?'

'পারব,' বলল রানা। 'আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। কিন্তু আবার বলছি, কাস্টমসের কথাটা ভুলো না।'

'ও আমি ম্যানেজ করে নেব,' ধৈর্য হারিয়ে দ্রুত বলল স্যানডোরা। 'আপনি শুধু দয়া করে হোটেলে পৌঁছে দিন টাকাটা।'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে এয়ার টার্মিন্যালে পৌঁছুল রানা। খানিকটা দূরে একটা বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, আরোহীদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। সেদিকে এগোল ও। ফচেটকে আগেই দেখতে পেয়েছে, একটা বেঞ্চে বসে খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে, পায়ের কাছে রানার সুটকেস।

হাঁটার গতি খানিকটা কমিয়ে আনল রানা, দেখল, বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফচেট, ধীর পায়ে নাক বরাবর এগোল। হাঁটার মন্থর গতি বজায় রেখে বেঞ্চের পাশ দিয়ে এগোল রানা, না থেমে তুলে নিল সুটকেসটা। এদিক ওদিক না তাকিয়ে সোজা উঠে পড়ল বাসে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে সুটকেসটা চেক করল রানা। বোর্ডিং টিকেট সংগ্রহ করল। তারপর পুলিস কন্ট্রোল পেরোবার জন্যে ছোট একটা লাইনের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াল। ওর ঠিক সামনেই সুন্দরী একটা মেয়ে, পরনে অত্যন্ত দামী জামাকাপড়, শ্যানেল ফাইভের মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাসপোর্ট হস্তান্তর করার সময় এক নজর দেখার সুযোগ পেল রানা। মেয়েটার নাম জেনি পাপিতা। সরু কোমর, লম্বা পা আর ক্ষীণ একটু বাঁকা হাসি—বেশ ভালই লাগল রানার। পাসপোর্ট ফিরিয়ে নিয়ে ব্যারিয়ার পেরিয়ে চলে গেল সে। এবার রানার পালা।

কন্ট্রোল অফিসারের পিছনে একজন দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ছোট করে ছাঁটা চুল আর নিঃশব্দে অবিরত চুইংগাম চিবানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা আমেরিকান। রানা ধারণা করল, সীন ওয়াটের সিকিউরিটি অফিসার হতে পারে।

কন্ট্রোল অফিসার এবং মার্কিন লোকটা, দু'জনেই কটমট করে তাকাল রানার দিকে। চেহারায় রাজ্যের নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে রেখে রানাও পালা করে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। ওর মুখের দিকে চোখ রেখেই হাত পাতল কন্ট্রোল অফিসার। পাসপোর্টটা ধরিয়ে দিল রানা। অনেকক্ষণ ধরে সেটা পরীক্ষা করল অফিসার, তারপর ধরিয়ে দিল মার্কিন লোকটার হাতে। সে-ও বেশ খানিক সময় নিয়ে দেখল ওটা।

'ডাকারে আপনি কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, মশিয়ে?' মার্কিন লোকটার কাছ থেকে পাসপোর্ট ফেরত নিয়ে জানতে চাইল কন্ট্রোল অফিসার।

'ব্যবসা।'

'কি ব্যবসা?'

ব্রিফকেস খুলে ভেতর থেকে একটা ছাপা কার্ড আর একটা চিঠি বের করল

রানা। কার্ডটা পরীক্ষা করল ওরা, চিঠিটা পড়ল। দুটোই পিক কর্পোরেশন থেকে দেয়া হয়েছে হুয়ান ফার্নান্দেজকে। হুয়ান ফার্নান্দেজ যে পিক কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, সেটা প্রমাণ করছে কার্ড। আর চিঠিতে হুয়ান ফার্নান্দেজকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ডাকারে গিয়ে সে যেন কারখানা খোলার সম্ভাবনা যাচাই করে রিপোর্ট পাঠায়।

কন্ট্রোল অফিসার কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে, মার্কিন লোকটার দিকে তাকাল। দেখল, একটা নোট বুকে পিক কর্পোরেশনের ঠিকানা লিখে নিচ্ছে সে। তারপর মুখ তুলে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। কন্ট্রোল অফিসার পাসপোর্টে সীল ঠুকে হাত নেড়ে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিল রানাকে।

খানিকটা হেঁটে এসে এনক্লোজারের ভেতর দাঁড়াল রানা, কাস্টমস অফিসাররা ব্যাগেজ চেক করছে এখানে। কয়েক সেকেন্ড পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে, পুলিস কন্ট্রোলের ওদিকটায় তাকাল ও।

লাইনের শেষ মাথায় মাদাম স্যানডোরাকে দেখা গেল। বড়সড় একটা হ্যান্ডব্যাগ রয়েছে তার বগলের তলায়, রানার দেয়া ব্রিফকেসটা রয়েছে হাতে।

স্যানডোরা কাস্টমসে ধরা পড়লে ওর কোনও কিছু এসে যায় না, তবু হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, অত টাকা নিয়ে কাস্টমস ব্যারিয়ার পেরোবার আশা করবে নিশ্চয়ই এমন বোকা ও নয়, স্যানডোরা টাকা নিয়ে আসেনি।

পাসপোর্ট কন্ট্রোল জানালার কাছ থেকে তখনও দশ গজ দূরে স্যানডোরা, ঘিরে ফেলা হলো তাকে। সাদা পোশাক পরা লোক দু'জনকে মার্কিনী বলে মনে হলো, তাদের সাথে রয়েছে একজন ফ্রেঞ্চ পুলিস ইন্সপেক্টর। স্যানডোরাকে মাঝখানে নিয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে এল তারা।

হাত দুটো নিজের অজান্তেই মুঠো পাকিয়ে গেল রানার। তালু ভিজে গেছে। দেখল প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে স্যানডোরা। তার তীক্ষ্ণ গলা শুনে লোকজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। তাকে নিয়ে সিকিউরিটি পুলিস অফিসের দিকে এগোল লোক তিনজন।

একা একটা বেঞ্চে বসে আছে জ্যাসন, কেউ তাকে লক্ষ করল না। পরনে ট্রেঞ্চ কোট, কোটের পকেটে কব্জির অনেকটা ওপর পর্যন্ত ঢুকে রয়েছে ডান হাত। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা ফিলটার টিপ সিগারেট। কাল রাতে কার্ল হফার তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, 'মেয়েটাকে যদি এয়ারপোর্টে গ্রেফতার করা হয়, তোমাকে দেখতে হবে সে যেন কথা বলতে না পারে। যে-কোন ঝুঁকি নেবে। তোমার বিপদ হলে আমি সামলাব। কিন্তু মেয়েটার মুখ খোলা চলবে না।'

জ্যাসন দেখল, স্যানডোরাকে নিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে পুলিসের দলটা। মেয়েটাকে মাঝখানে রেখে এক পাশে রয়েছে একজন মার্কিন লোক, আরেক পাশে ফ্রেঞ্চ পুলিস ইন্সপেক্টর। অপর লোকটা ওদের পিছু পিছু আসছে। মেয়েটার দিকে তাকাল সে। বড়বড় চোখে আতঙ্ক। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।

লুকানো রিভলভারের ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরল জ্যাসনের আঙুল। রিভলভারের সাথে ফিট করা সাইলেন্সারের ওপর বিশ্বাস আছে তার। কাছেই চালু রয়েছে জেট

এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন। গুলির আওয়াজ শুনতেই পাবে না কেউ।

পকেটের ভেতর রিভলভারটা তুলল জ্যাসন। কঠিন একটা কাজ অথচ প্রথমবারই লক্ষ্যভেদ করতে হবে। টার্গেট দেখা যাচ্ছে কিন্তু রিভলভার রয়েছে চোখের আড়ালে, সেজন্যেই কাজটা কঠিন। যদিও এ-ধরনের কঠিন কাজ এই প্রথম করছে না সে। ট্রিগারে চাপ দেয়ার সাথে সাথে হাতে ঝাঁকি খেলো সে। সাইলেন্সার থাকায় ঢুপ করে ভোতা একটা আওয়াজ হলো শুধু, তার নিজের কানে সেটা ঢুকলেও আর কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

স্যানডোরাকে ঝাঁকি খেতে দেখল রানা। হাত দুটো সামনে তুলে এক সেকেন্ড টলল। তারপর পড়ে যেতে শুরু করল সটান। ফ্রেঞ্চ ইন্সপেক্টর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, সংবিৎ ফিরতে স্যানডোরাকে ধরার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু নাগালের মধ্যে পেল না।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পকেট থেকে হাত বের করে কোলের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হাত ঝাপটাল জ্যাসন, ভাঁজ খুলে গেল কাগজের, পড়তে শুরু করেছে যেন এই সময় উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে তার চৈতন্য হলো, মুখ তুলে তাকাল সামনে। এরই মধ্যে কংক্রিটের ওপর পড়ে থাকা মেয়েটা আর তিনজন পুলিসকে ঘিরে একটা ভিড় জমে উঠেছে।

কাঁচের পর্দার এদিক থেকে দৃশ্যটা দেখল রানা। এই সময় কাস্টমস অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'ডিক্লেয়ার করতে চান এমন কিছু সাথে আছে নাকি?'

'নেই,' বলল রানা। শরীরের পাশে মুঠো পাকানো হাত দুটো কাঁপছে একটু একটু।

'আপনার ব্যাগটা একটু খুলবেন, প্লীজ?'

ব্যাগ খুলল রানা।

সন্দেহ এবং খুঁতখুঁতে মন নিয়ে ধীরেসুস্থে, ব্যাগের জিনিস-পত্র পরীক্ষা করতে শুরু করল অফিসার। কাঁচের ভেতর দিয়ে আরেকবার পিছন দিকে তাকাল রানা। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেল জ্যাসনকে, লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে স্যানডোরাকে দেখার চেষ্টা করছে। কি ঘটেছে সাথে সাথে বুঝতে পারল ও। হফারের নির্দেশে স্যানডোরাকে খুন করেছে জ্যাসন।

'ধন্যবাদ, স্যার,' ব্যাগের ওপর চক দিয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে বলল কাস্টমস অফিসার। 'ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যান, প্লীজ।'

ব্যাগ তুলে নিয়ে এমবারকেশন বে-র দিকে এগোল রানা, জনাত্রিশেক লোক অপেক্ষা করছে ওখানে।

কয়েকজন পুলিস অফিসার ভিড় কমাবার অনুরোধ করল, এই সুযোগে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল জ্যাসন। কেউ তাকে বাধা দিল না, নির্বিঘ্নে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল সে। কালো সিট্রন নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল ফচেট। ঘামে ভিজে গেছে মুখ।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসল জ্যাসন। কথা হলো না, স্টার্ট দিয়ে সিট্রন ছেড়ে দিল ফচেট। তাড়াহুড়ো না করে স্বাভাবিক গতিতে এগোল অটোরুটের দিকে। খানিক দূর এসে আড়চোখে জ্যাসনের দিকে তাকাল সে।

পাশের সীটে যেন একটা পাথরের মূর্তি, মানুষ নয়। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কাজ হয়েছে? —কিন্তু সাহস হলো না।

ওদিকে ধরাধরি করে পুলিস সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে আসা হলো স্যানডোরাকে। কামরার দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। একজন মার্কিন অফিসার ফোন করল লেসলি টমাসকে। অপরজন পরীক্ষা করল স্যানডোরাকে।

'গুলি খেয়ে মারা গেছে,' ফ্রেঞ্চ ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল সে। 'বাইরে ওখানে কোথাও আছে খুনী। আপনার লোকদের পাঠিয়ে চেক করান।' যদিও সে জানে, এখন আর চেক করে কোন লাভ নেই।

দশ

বিছানায় ওঠার তোড়জোড় করছিল সীন ওয়াট, তাকে চমকে দিয়ে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙল ডোরবেলের ঝন ঝন শব্দ। ওমেগায় চোখ বুলাল, বারোটা বাজতে বিশ মিনিট। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, স্পাই-হোলে চোখ রেখে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেসলি টমাস। দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। 'এসো, ক্যাপ্টেন।' তার গম্ভীর চেহারা দেখেই বুঝে নিল, খবর খারাপ।

হাতে ব্রিফকেস ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকল টমাস, দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার দিকে ফিরল ওয়াট। বলল, 'বসো।'

একটা কাঠের চেয়ারে বসল টমাস। 'সেনেগালিজ মেয়েটা মারা গেছে, স্যার।'

'মারা গেছে?' টমাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওয়াট।

'জ্বী।'

'কিভাবে? তোমরা তাকে...?'

'আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছিলাম,' বলল টমাস। 'এই সময় গুলি হয়।'

ওয়াটের ধারাল চেহারা আরও যেন সরু হয়ে উঠল, চোয়ালের হাড় উঁচু-নিচু হলো বারকয়েক। চশমার পিছনে চোখ জোড়া চকচক করছে। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে, ধীরে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসল ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে। 'কে গুলি করল?'

'পুলিস কন্ট্রোল পেরোবার চেষ্টা করছে, এই সময় প্রথম তাকে দেখতে পাই আমরা,' সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুরু করল টমাস। 'আমি ছিলাম না ওখানে, একজন ফ্রেঞ্চ পুলিস ইন্সপেক্টরের সাথে আমার দু'জন লোক ছিল। ওদের সাথে সিকিউরিটি অফিসে যাবার জন্যে মেয়েটাকে অনুরোধ করে ইন্সপেক্টর। খুব ঘাবড়ে যায় সে, কোথাও যেতে আপত্তি জানায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়।'

ওয়াট সিগারেট ধরাচ্ছে দেখে একটু থামল টমাস, তারপর আবার শুরু করল, 'ওখান থেকে সিকিউরিটি অফিস কাছেই, মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ টলে

উঠে পড়ে যায় মেয়েটা। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু ধরাধরি করে অফিসে এনে পরীক্ষা করতেই জানা গেল, মারা গেছে।'

'কোথায় লেগেছে গুলি?' জানতে চাইল ওয়াট।

'একটাই গুলি লেগেছে, সম্ভবত করাও হয়েছে ওই একটাই, লেগেছে হার্টে।'

'গুলির আওয়াজ···?'

'হয়নি,' বলল টমাস। 'নিশ্চয়ই সাইলেন্সার ফিট করা ছিল। তাছাড়া, কাছেই ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ছিল একটা জেট প্লেন। আশপাশে বেশ কিছু লোকজন ছিল, গুলিটা তাদের মধ্যে থেকেই কেউ করেছে, কিন্তু কারও চোখে ধরা পড়েনি।'

বাঁ হাতে সিগারেট, ডান হাতের আঙুল দিয়ে কপালের একটা পাশ ধরল ওয়াট।

ব্রিফকেসটা হাঁটুর ওপর রেখে খুলল টমাস। 'এটা ওই মেয়েটার। এখানে পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার আর সাদিয়া জেসমিনের নামে একটা পাসপোর্ট রয়েছে। ডাকার পুলিসের সাথে যোগাযোগ করে পাসপোর্টটা চেক করছি আমি।' খোলা ব্রিফকেসটা ডেস্কের ওপর রাখল সে।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্রিফকেসের টাকাগুলো দেখল ওয়াট। 'কার টাকা, কোত্থেকে এল, খোঁজ করে এসব বের করা যাবে?'

'না।'

'মাসুদ রানার কোন খবর আছে?'

'এখনও নেই। আজ রাতের ডাকার ফ্লাইটে নেই সে। প্রত্যেকটি আরোহীকে চেক করেছি আমরা।'

'পরের ফ্লাইটেও যেতে পারে সে,' বলল ওয়াট।

'সে-কথা ভেবেই এয়ারপোর্ট থেকে ওদেরকে ফিরিয়ে নিইনি, স্যার,' বলল টমাস। 'ডাকার যাবে এমন সব জাহাজকেও আমরা সতর্ক করে দিয়েছি।'

আজ রাতের ফ্লাইটে মাসুদ রানাকে পাওয়া যায়নি শুনে খুব একটা আশ্চর্য হলো না ওয়াট। পাপিতার ধারণা খানিকটা হলেও সংক্রমিত হয়েছে তার মধ্যে—কার্ল হফার খুব সম্ভব মাসুদ রানাকেও মেরে ফেলেছে। মুখে বিস্বাদ লাগল সিগারেট, অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল সেটা, চোখ তুলে তাকাল। 'ভাগ্য খারাপ, তাছাড়া কি বলব আর!' বলল সে। 'ঠিক আছে, আজ রাতের মত ইতি করব।' ইঙ্গিতে ব্রিফকেসটা দেখাল। 'থাক আমার কাছে। নিগেল চ্যাপম্যানেরও কোন খবর নেই, না? সে-ই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে, স্যার। হিল্টনের ওপর চোখ রেখেছি, দেখা যাক কি হয়।'

ক্যাপ্টেন টমাসকে বিদায় দিয়ে খাটের কিনারায় বসল ওয়াট। ভাবছে। বুদ্ধি করে ডাকারে গেছে পাপিতা, সেজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে। স্যানডোরা মারা গেছে এই খবরটা কোড করা মেসেজ পাঠিয়ে জানাতে হবে তাকে। মনে হচ্ছে, প্যারিসে যা ঘটার ঘটে গেছে, এরপর যা ঘটবে সব সেনেগালে। হঠাৎ করেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, রবার্ট লুডলামকে ডাকারে পাঠাতে হবে। বলা যায় না, পাপিতার সাহায্য দরকার হতে পারে।

অত্যন্ত যোগ্য লোক লুডলাম। অনেকটা গাফলতি করেই এতদিন তাকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে লাগানো হয়নি। লুডলাম কর্তাদের নির্দেশের চেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপর বেশি ভরসা করে, কেউ কেউ বলে এটাই নাকি তার বড় দোষ। তাদের কথায় কান দিয়ে এতদিন বোধহয় ভুলই করেছে সে।

বিছানা ছেড়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ওয়াট। ডায়াল করল। কিন্তু সাথে সাথে রিসিভার তুলল না কেউ। তারপর ঘুম জড়ানো গলায় জানতে চাইল লুডলাম, 'হ্যালো?'

'ওয়াট। এখানে তোমাকে আমার দরকার। আর্জেন্ট। এখুনি আসতে পারবে?'

'পারা যায়…পারব,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

খানিক আগে লেসলি টমাস যে কাঠের চেয়ারটায় বসেছিল, বিশ মিনিট পর সেটা দখল করে বসল রবার্ট লুডলাম। দ্রুত পা নাচাচ্ছে সে, ওয়াটের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছে কথাগুলো।

ছিপছিপে গড়ন লুডলামের, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। কপালের ওপর এলোমেলো এক মাথা চুল, সতর্ক চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। ছোট একটা গ্যারেজের মালিক সে, প্রয়োজনে ওয়াট ডাকলে কাজ করে দিয়ে রোমাঞ্চ এবং আনন্দ, দুটোই পায়। যন্ত্রপাতি আর মেশিন-পত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা প্রচুর, এসপিওনাজ সম্পর্কে পড়াশোনা বিস্তর।

কিছু বাদ না দিয়ে কি ঘটেছে সব বলে গেল ওয়াট। সবশেষে বলল, 'গোটা ব্যাপারটাই বিচ্ছিরি একটা চেহারা নিচ্ছে, লুডলাম। তোমাকে বলতে অসুবিধে নেই, টমাসের রিপোর্ট মি. জেমস ক্লিফের হাতে তুলে দেয়াই উচিত ছিল আমার। কিন্তু তা আমি দিইনি, দেবোও না।'

'আপনি যখন সব কথা বলছেন আমাকে, একটা প্রশ্ন করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লুডলাম।

'করো।'

'এই কেসে আপনি হালে পানি পাচ্ছেন না,' বলল লুডলাম। 'তবু আঁকড়ে ধরে আছেন কেন?'

'এরজন্যে দায়ী আমার অহম,' রাগ করল না ওয়াট, শান্ত সুরে বলল সে। 'তুমি তো জানো, কার্ল হফার সম্পর্কে আমার ধারণা কি। আমার প্রফেশন্যাল জীবনে একটাই সাধ অপূর্ণ রয়ে গেছে, তা হলো হফারকে শায়েস্তা করা। চেষ্টা তো কম লোক করেনি, কিন্তু হফার সবার নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। আমার কেন যেন বিশ্বাস হয়, কেউ যদি পারে তো আমিই পারব। এই ব্যাপারটার সাথে হফার জড়িত, এ-কথা জানার পর মি. ক্লিফকে রিপোর্ট না করার সিদ্ধান্ত নিই আমি। এটা বলতে গেলে আমার সাথে হফারের যুদ্ধ, আর কাউকে অংশগ্রহণ করতে দিতে চাই না।'

'আপনার সব কথা বুঝলাম, এ-কথা বলতে পারি না, মি. ওয়াট,' বলল লুডলাম। 'কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি আমাকে ডেকেছেন, আমি এসেছি। আপনি আমাকে কাজ দেবেন, আমি করব। রাইট?'

'ঠিক আছে,' বলল ওয়াট, একটু বেশি বক বক করা হয়ে গেছে বুঝতে পেরে লজ্জা পেল সে। 'জেনি পাপিতা এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে ডাকার। চালাক মেয়ে, ওখানে পৌঁছে দু'একটা সূত্র পেয়ে যেতে পারে সে। আমি চাই কালকের ফ্লাইট ধরে ওখানে গিয়ে ওর সাথে যোগ দাও তুমি।'

'ওখানে আমাদের কি কাজ হবে?' জানতে চাইল লুডলাম।

'মেয়েটা কি বেচতে চেয়েছিল তা-ই আমাদের জানা হয়নি,' বলল ওয়াট। 'সেটা জানার চেষ্টা করবে তোমরা। জানার চেষ্টা করবে, এর সাথে হফারের জড়িয়ে পড়ার কারণ কি।'

'এসব করতে গেলে মেলা খরচ হবে,' বলল লুডলাম। 'ব্যাপারটা যদি আনঅফিশিয়াল রাখতে চান, খরচটা যোগাবে কে?'

ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা ব্রিফকেসটা দেখাল ওয়াট। মুচকি একটু হাসল সে। 'টাকার কোন অভাব নেই আমাদের। এখানে ক্যাশ পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়েছে। এটা স্যানডোরার ব্রিফকেস।'

'আপনার ধারণা টাকাটা স্যানডোরা হফারের কাছ থেকে পেয়েছিল?'

'অবশ্যই! বাজি ধরে বলতে পারি। হফারকে ঘায়েল করার জন্যে হফারের টাকা খরচ করলে সেটা হবে পোয়েটিক জাস্টিস। যা লাগে নিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার ভিসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। পাসপোর্ট নিয়ে কাল সকাল ন'টায় আমার অফিসে চলে এসো, ততক্ষণে তোমার জন্যে সব রেডি রাখব আমি।'

'বেশ, ঠিক আছে,' বলল লুডলাম। 'মি. ক্লিফকে তাহলে কিছু জানাচ্ছেন না, নাকি আরেকবার ভেবে দেখবেন, মি. ওয়াট?'

'মি. ক্লিফের ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওয়াটের কণ্ঠস্বর। 'তোমাকে যা করতে বলছি তুমি তাই করবে।'

'এবার মাসুদ রানা সম্পর্কে,' বলল লুডলাম। 'ওর কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আপনি কি মনে করেন, ডাকারে যাবার চেষ্টা করবে সে?'

'মাসুদ রানা সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির চীফ। বাজারে গুজব, কাপু উ সেন নাকি তার হাতেই...'

'রানা এজেন্সি আমাদের শত্রু নয়,' বলল ওয়াট। 'কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টে তারা আমার সাথে ন্যায্য ব্যবহার করেনি। হয়তো সঙ্গত কোন কারণ আছে, জানি না।' লুডলাম তাকে একটা প্রশ্ন করেছে, হঠাৎ মনে পড়ল সেটা। 'আমার ধারণা, মাসুদ রানাকে হফারের লোকেরা মেরে ফেলেছে।'

'দূর, এ আমি বিশ্বাস করি না।' শোনার সাথে সাথে বলে উঠল লুডলাম। 'তার সম্পর্কে যতটুকু জানি, এত সহজে পটল তুলবার বান্দা সে নয়।'

'তার সম্পর্কে শেষ যা শুনেছি, হফারের লোক ধরে নিয়ে গেছে,' বলল ওয়াট। 'আশরাফ চৌধুরীকে খুন করতে পারলে মাসুদ রানাকে পারবে না কেন?'

মাথা নিচু করে নিজের হাতের আঙুল দেখতে দেখতে বলল লুডলাম, 'হফারের প্রস্তাব মেনে নিতে পারে রানা, সে কথা ভেবে দেখেছেন?'

হতচকিত দেখাল ওয়াটকে। 'কি বললে?'

'কাজের লোকের কাছ থেকেই কাজ আদায় করার চেষ্টা করে মানুষ,' বলল লুডলাম। 'হফার এত বোকা নয় যে রানার যোগ্যতা বুঝবে না। হয়তো কোন প্রস্তাব দিয়েছে সে, রানাও মেনে নিয়েছে সেটা।'

হঠাৎ মৃদু হাসল ওয়াট। বলল, 'রানা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, লুডলাম। এরকম কিছু করার লোক সে নয়। পেরেকের চেয়েও শক্ত। লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করা স্রেফ অসম্ভব।'

'লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে রাজি করেছে হফার, এ-কথা কিন্তু একবারও বলিনি আমি, মি. ওয়াট। এমনও তো হতে পারে যে হফারের প্রস্তাব অন্যায় জেনেও, নিজের নিরাপত্তার বিনিময়ে রাজি হয়েছে রানা; তারপর, সুযোগমত, ঠিকই কোপ মারবে?'

'কিন্তু হফার কেন প্রস্তাব দিতে যাবে রানাকে? তার নিজেরই তো লোকজন আছে।'

'তা আছে,' বলল লুডলাম। উঠে দাঁড়াল সে। 'কিন্তু হফারের মত লোক বুঝবে, রানা একাই একশো।'

খানিক চিন্তা করে দেখল ওয়াট, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'হতে পারে, কি জানি।'

'কাল তাহলে ন'টায় মি. ওয়াট,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লুডলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে সিট্রন নিয়ে সোজা নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল ফচেট। সারাটা পথ সে বা জ্যাসন একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামল ওরা। এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলায় উঠে এল দু'জন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালা খোলার সময় আড়চোখে একবার জ্যাসনের দিকে তাকাল ফচেট। এই লোকের চোখের মণি, পাতা, নাকের ফুটো, ভুরু, ঠোঁট, কিছুই একচুল নড়ে না। ঠাণ্ডা, ভাবলেশহীন চেহারা। তালা খুলল ফচেট, তাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকল জ্যাসন।

রোদ ঝলমলে একটা ঘর। দুটো কাঠের চেয়ার, দুটো ইজি চেয়ার, ফায়ারপ্লেসের ধারে বড় একটা আয়না, দেয়ালে সাঁটা বিবস্ত্র মেয়েদের পোস্টার।

একটা কাঠের চেয়ারে পিঠ খাড়া করে বসে আছে নিগেল চ্যাপম্যান, ব্যস্ত হাতে একটা সেক্স ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। দু'দিন হলো ফচেটের সাথে এখানেই গা ঢাকা দিয়ে আছে সে। হফারের কড়া নির্দেশ, রাস্তা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। জ্যাসন ঘরে ঢুকতেই ঝট করে মুখ তুলল সে। জ্যাসনের চেহারা দেখে খবর আন্দাজ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটল?'

ঠোঁট বাঁকা করে হিংস্র একটা ভঙ্গি করল জ্যাসন, ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে বাঁ বুকে রেনকোটের পকেটে ছোট একটা বৃত্ত আঁকল সে।

'ওখানে গুলি খেলেও অনেকে মরে না,' চ্যাপম্যানের নার্ভাস চেহারার সাথে গলার কঠিন সুর ঠিক মানাল না। 'আমি জানতে চাই, মেয়েটা মারা গেছে কিনা!'

একটা ইজি চেয়ারের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে পা দুটো চ্যাপম্যানের দিকে

ব্যাখ্যা করে দিল জ্যাসন। 'শুধু জেনে রাখো, জ্যাসন কখনও ভুল করে না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'আমি রিপোর্ট করব মি. হফারকে, গরজ থাকলে খুঁটিনাটি সব তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো।' চোখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল সে, তার সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি দেখে মনে হলো চ্যাপম্যানের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই মুহূর্তে তার যেন কোন ধারণাই নেই।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ফচেট, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল কিচেনে। রিফ্রিজারেটর থেকে দুটো বিয়ারের ক্যান নিয়ে এল সে। গ্লাসে ঢেলে একটা দিল জ্যাসনকে, আরেকটা নিল নিজে। দৃষ্টি দিয়ে ওদের দু'জনের প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করল চ্যাপম্যান, কিন্তু কোন কথা বলল না। কেউ তার দিকে তাকাল না বা কথা বলল না দেখে অগত্যা আবার সেক্স ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইলেও চেষ্টা করে চেপে রাখল সেটাকে।

ক্লিক করে লাইটার জ্বালল জ্যাসন, সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজল। তার গ্লাসটা আবার ভরে দিল ফচেট, তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। সময় কাটাতে হলে নিচের গাড়ি দেখা ছাড়া উপায় কি।

এইভাবে কেটে গেল দশ মিনিট। তারপর ডোরবেল বাজল। দ্রুত এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল ফচেট। সরে দাঁড়াল একপাশে। ঘরে ঢুকে দু'পা এগোল কার্ল হফার। দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের দস্তানা খুলছে। দরজা বন্ধ করে একটু ঘুরে এগোল ফচেট, দাঁড়াল জানালার পাশে। জ্যাসন আর চ্যাপম্যান যে-যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দস্তানা খুলে কোটের পকেটে ভরল হফার, মুখ তুলে তাকাল ওদের দিকে। প্রথমে তাকাল চ্যাপম্যানের দিকে, কিন্তু তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। তারপর তাকাল ফচেটের দিকে। ফচেটের ওপর দু'সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল চোখ। সবশেষে তাকাল জ্যাসনের দিকে। 'মেয়েটাকে তাহলে মারতেই হলো?'

'পুলিস ধরে ফেলেছিল,' শান্ত গলায় বলল জ্যাসন। 'ব্যারিয়ারের কাছে আসতেই ঘিরে ফেলা হয় তাকে। দেখে মনে হলো সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে, গড় গড় করে বলে দেবে সব—তাই গুলি করতে হলো। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে, আমি জানি।'

'রানা তখন কোথায় ছিল?' জানতে চাইল হফার।

'কাঁচঘরে।'

'দেখেছে?'

শ্রাগ করল জ্যাসন। 'বলতে পারব না।'

এতক্ষণে জ্যাসনের ওপর থেকে চোখ ফেরাল হফার। মাথা নিচু করে পায়চারি শুরু করল। ওদের তিনজোড়া চোখ সতর্কতার সাথে অনুসরণ করছে তাকে। একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, পকেট থেকে দস্তানা বের করে পরতে শুরু করল আবার। কারও দিকে না তাকিয়ে বলল, 'তিনদিনের মধ্যে রানা যদি ভাল কোন খবর না দিতে পারে, তোমরা ডাকারে যাবে। তুমি, জ্যাসন—আর তুমি, ফচেট। রানার সাথে কাজ করতে হবে তোমাদের। ওকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না।

বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন।

'আর আমি, স্যার?' ব্যাকুল সুরে জানতে চাইল চ্যাপম্যান। 'আমি যাব না?'

'আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে ওদের সাথে ডাকারে পাঠাব তোমাকে?' হফারের চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল। 'লন্ডনে যাচ্ছ তুমি। হাতের কাছে রেজার না থাকলে ওই দাড়িটুকু টেনে ছিঁড়ে ফেল! ওয়াটের লোকেরা পাগলা কুকুরের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে। অন্তত এই মুহূর্তে এখানে তুমি আমার কোন কাজেই লাগবে না। লন্ডন অফিসে রিপোর্ট করো গিয়ে। ওরা হয়তো তোমাকে কোন কাজ দিলেও দিতে পারে।'

চ্যাপম্যানের চেহারা লাল, তারপর সাদা হয়ে উঠল। 'ইয়েস, স্যার।'

'দেখো, এই ঘর থেকে বেরিয়েই আবার ধরা পড়ে যেয়ো না,' বলল হফার। চেহারায় রাজ্যের অসন্তোষ। 'খুলির ভেতর মগজ শুধু থাকলেই হয় না, সেটা ব্যবহার করতে জানতে হয়।'

মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকাল চ্যাপম্যান।

কোটের পকেটে হাত ভরে এক তাড়া কড়কড়ে নোট বের করল হফার, ছুড়ে টেবিলের ওপর ফেলল সেটা। 'নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও,' বলল সে। 'তুমি, জ্যাসন, অর্ধেক নেবে। খুব ভাল দেখিয়েছ তুমি। আমি তোমার ওপর খুশি।' কথাটা বলেই চ্যাপম্যানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

এয়ার হোস্টেসের হাতে এমবারকেশন কার্ড ধরিয়ে দিয়ে আরোহীদের মন্থরগতি লাইনের পিছনে দাঁড়াল রানা। সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে উঠল ও, ট্যুরিস্ট সেকশনে ঢুকে আইল (Aisle) ধরে এগোল খালি একটা সীটের দিকে। বসার পর ওর খেয়াল হলো, ওর পাশে, জানালার ধারের সীটে বসে রয়েছে সেই সুন্দরী মেয়েটা, জেনি পাপিতা।

সেফটি বেল্ট বাঁধার সময় আরেকবার মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ঘাড় ফেরাল মেয়েটা, মিষ্টি করে একটু হাসল। যেন রানাকে দেখেই সেফটি বেল্ট বাঁধার কথা মনে পড়ে গেছে, হাত দুটো হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল তার। ঊরুর ওপর থেকে ব্রিফকেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল রানা, ব্রিফকেসের একটা কোণ মেয়েটার পায়ে ঘষা খেল একটু। 'দুঃখিত,' বলল ও।

আবার ঘাড় ফেরাল মেয়েটা। এবার হাসল না। বলল, 'কালো মেয়েটা কিভাবে পড়ে গেল, দেখলে? পুলিস বোধহয় গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে, তাই না? আমার জায়গা থেকে ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। তোমাকে আমি তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। মেয়েটা কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল?' সুন্দর চেহারার মেয়েলি কৌতূহল উপচে পড়ছে।

উত্তরে কিছু বলার আগে মেয়েটার বড় বড় গভীর মায়ামাখা চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। মনে হলো, এমন সুন্দরী মেয়ে অনেকদিন চোখে পড়েনি তার। 'আমিও দেখলাম পড়ে গেল,' বলল ও। 'আসলে ব্যাপারটা কি নিয়ে, বলা মুশকিল। হয়তো কিছু স্মাগল করার চেষ্টা করেছিল, আগে থেকে খবর পেয়ে

অপেক্ষা করছিল পুলিস।'

'হ্যাঁ, তাই হবে, তাছাড়া আর কিই-বা হতে পারে,' বলল পাপিতা।

পরস্পরের সাথে কথা হলেও, আনুষ্ঠানিক পরিচয় হলো না। হঠাৎ করে চালু হয়ে গেল জেটের ইঞ্জিন। সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা। সেটা কিভাবে যেন টের পেয়ে পাপিতা ভাবল, এখন লোকটার দিকে তাকালে ধরা পড়ার ভয় নেই। ঘাড় ফেরাল সে। হুম! প্রথম দৃষ্টিতে মনে যে ছাপ ফেলেছে লোকটা, সেটা মিথ্যে কিছু নয়। সত্যি পৌরুষ-দীপ্ত চেহারা। ফ্রেঞ্চ বলল, একেবারে যেন মায়ের ভাষা। অথচ বিদেশী। দক্ষিণ আমেরিকান বলে মনে হচ্ছে। ওর চোয়ালের রেখা আর হাত দুটো কি সুন্দর, ভাল লাগছে। হ্যাঁ…একেই বলে পুরুষ!

পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল পাপিতার বুক। চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে লোকটা। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লজ্জায় লাল হতে থাকল সে। অনেক পর আবার যখন তাকাল, দেখল, চোখ বুজে ফেলেছে আবার।

রানওয়ে ধরে খানিকটা ছুটে আকাশে উঠল প্লেন। সেফটি বেল্ট খুলে নড়েচড়ে বসল রানা। চোখ বন্ধ রেখে ভাবছে। স্যানডোরা খুন হওয়ায় সুতোর মুখটাই হারিয়ে গেল। এখন ওর একমাত্র ভরসা পর্তুগীজ লোকটা, পোলো। সেই তাকে ওয়েন প্যাকারের কাছে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার আগে পোলোকে খুঁজে বের করতে হবে। তাকে না পেলে প্যাকারকে পাবার আশা করা বৃথা।

চোখ মেলে তাকাল রানা, যেন এই অপেক্ষাতেই ছিল পাপিতা, সাথে সাথে খোলা একটা সিগারেট কেস রানার মুখের সামনে ধরে জানতে চাইল, 'লাইটার আছে?'

কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল রানা। পকেট থেকে লাইটার বের করে পাপিতার সিগারেট ধরিয়ে তারপর নিজেরটা ধরাল। অনেকদিন পর খাচ্ছে, বিস্বাদ লাগল মুখে। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ও। হুয়ান ফার্ণান্দেজ সিগারেট খায়, কি আর করা। মেয়েটার দিকে ফিরল ও। 'আমি হুয়ান ফার্ণান্দেজ। ডাকারে কি এই প্রথম যাচ্ছ তুমি?'

'জেনি পাপিতা। হ্যাঁ, ডাকারে এই আমার প্রথম,' বলল সে। 'হপ্তা দু'য়েক থাকব। স্রেফ রোদ পোহাব আর কি।'

'মাদাম পাপিতা?' জানতে চাইল রানা, ঠোঁটে হাসি হাসি ভাব।

হেসে উঠল পাপিতা। রানার কানে জলতরঙ্গের মত শোনাল। 'না। একাকী জীবন অনেক মজার। তুমি?' আগ্রহের আতিশয্যে রানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল সে। 'তুমি বিবাহিত?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওই একই কারণে।'

দু'জনেই হেসে উঠল। তারপর পাপিতা বলল, 'চমৎকার ফ্রেঞ্চ বলো তুমি, অথচ বিদেশী। বোধহয় দক্ষিণ আমেরিকান, তাই না?'

'মেক্সিকান,' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চদের সাথে অনেক দিনের ওঠাবসা, শিখে ফেলেছি। শুনলাম ডাকারে নাকি সাংঘাতিক গরম, শুধু হোটেল ডি-প্যালেসের সেকশনেই একটু যা আরাম পাওয়া যাবে।'

'আমিও তাই শুনেছি,' বলল পাপিতা। 'তুমি কি ছুটিতে?'

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'কপাল মন্দ। কাজ নিয়ে যাচ্ছি।'

সীটের পিছনটা একটু নিচু করল পাপিতা, হাত বাড়িয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল সিগারেট। 'আমরা বোধহয় তিনটের দিকে পৌঁছুব, তাই না?'

'বোধহয়।'

'তাহলে, তুমি যদি কিছু মনে না করো,' মিষ্টি হেসে বলল পাপিতা, 'আমি একটু চোখ বুজতে চাই।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল রানা। সিগারেট নিভিয়ে সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে-ও।

কিন্তু আরও প্রায় ঘন্টাখানেক জেগে থাকল রানা। বন্ধ চোখের সামনে ভেসে থাকল আশরাফ আর স্যানডোরা। হফারের নিষ্ঠুরতা মনে পড়লেই আগুন ধরে যেতে চায় শরীরে। মনের পর্দায় স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলল হফারের ছবি, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল—বাঘের লেজে পা দিয়েছ, তোমাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ব, হফার!

চট করে চোখ মেলে পাপিতার দিকে তাকাল ও। ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। আবার চোখ বুজে পেশী ঢিল করার চেষ্টা করল ও। খানিক চেষ্টার পর ঘুম এল।

ঘুম ভাঙাল এয়ার হোস্টেস মেয়েটা। 'সীট বেল্ট বেঁধে নিন, প্লীজ,' রানার একটা কাঁধে হাত রেখে বলল সে। 'তিন মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করছি আমরা।'

সিধে হয়ে বসে মুখের সামনে হাত এনে হাই তুলল রানা। তারপর সীট বেল্ট বাঁধল। দেখল, ছোট একটা আয়না সামনে ধরে চেহারা ঠিক করছে পাপিতা।

'হুট করে পৌঁছে গেলাম, তাই না?' আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'নিটোল একটা ঘুম দিয়েছি। তুমি?'

'উপরি পাওনা হিসেবে একটা স্বপ্নও জুটেছে আমার কপালে,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'তাই?' হঠাৎ কৌতূহলী, উত্তেজিত হয়ে উঠল পাপিতা। 'কি স্বপ্ন দেখলে? নাকি ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে?'

'দেখলাম, হঠাৎ কি কারণে জানি না, পাগল হয়ে গেছি আমি,' বলল রানা। 'প্লেনের জানালা গলে লাফ দিয়ে পড়তে চাইছি নিচে, কিন্তু তুমি আমাকে টেনে ধরে বাধা দিচ্ছ।'

'যাহ্, এই রকম বাজে স্বপ্ন কেউ দেখে নাকি!' হেসে অস্থির হলো পাপিতা।

পাপিতার দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, ওর দেখাদেখি পাপিতাও তাকাল। এয়ারপোর্টের আলো দেখতে পেল ওরা। এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে প্লেন।

'আফ্রিকা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল পাপিতা। 'দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি। তুমি?'

'এখন আর আফ্রিকা মানেই গভীর জঙ্গল নয়,' বলল রানা।

'হলে কিন্তু ভাল হত,' সাথে সাথে মন্তব্য করল পাপিতা। 'হারিয়ে যেতে পারতাম।'

'কিন্তু মানুষখেকোরা যখন ঘিরে ধরত, ভয় করত না তোমার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'একটু কল্পনাশক্তি খাটাও,' কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলল পাপিতা। 'আমি কি একা হারিয়ে যেতাম? আমার সাথে থাকত একজন বন্ধু, রাইফেল হাতে...'

'আমি রাইফেল চালাতে জানি না,' বলল রানা, 'কাজেই তোমার সেই বন্ধুটি নিশ্চয়ই আমি হব না। বেঁচে গেলাম, বাবা!'

'কেন? বাঁচা-মরার প্রশ্ন উঠছে কেন?' চোখ তুলে তাকাল পাপিতা।

'রাইফেলে আর ক'টা গুলি থাকে,' বলল রানা। 'কিন্তু মানুষখেকোরা যে সংখ্যায় অনেক!'

খিলখিল করে হেসে উঠল পাপিতা। তার হাসির শব্দ শুনে আশপাশের সীট থেকে দু'একজন আরোহী মাথা তুলে তাকাল।

'আমি বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি খুব বেশি সহজ হয়ে উঠেছি তোমার সাথে,' চেহারা একটু ম্লান করে বলল পাপিতা। 'জানি না কি ভাবছ! আসলে, আমি এই রকমই! কথা না বলে থাকতে পারি না। বিশেষ করে... বিশেষ করে...' কথাটা শেষ করল না, বা করতে পারল না।

'আরে, ভাবব আবার কি!' অবাক দেখাল রানাকে। 'শুধু শুধু সংকোচে ভুগছ তুমি। আমিও অনেকটা তোমারই মত, পাশে কাউকে পেলে কথা না বলে থাকতে পারি না। বিশেষ করে... বিশেষ করে...' থেমে গেল রানা।

আবার একচোট হাসল ওরা।

রানওয়েতে নামল প্লেন। দরজা খোলা হতেই চুলোর আঁচের মত বাতাস লাগল মুখে। পাপিতা শিউরে উঠে বলল, 'রোদ পোহাতে এসে সেদ্ধ হয়ে ফিরতে হবে দেখছি!'

টারমাক ধরে এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে এগোবার সময় পাপিতার পাশেই থাকল রানা। কয়েকটা চেকিং পয়েন্টে থামতে হলো ওদেরকে, কিন্তু কোথাও বেশি সময় নষ্ট হলো না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, হোটেল ডি-প্যালেসের বাস অপেক্ষা করছে।

তালগাছের মত লম্বা এক পোর্টার, টকটকে লাল ইউনিফর্ম পরে আছে, ওদের ব্যাগ চেয়ে নিয়ে বাসে তুলল। ভারতীয়, তুর্কী, এবং আমেরিকান ব্যবসায়ীকে বাসে দেখা গেল। এরাও হোটেল ডি-প্যালেসে উঠছে। গ্রীক ব্যবসায়ী বোধহয় ট্যাক্সি নিয়ে অন্য কোন দিকে চলে গেছে।

সাগর ঘেঁষা রাস্তা, শূন্য খাঁ-খাঁ করছে সৈকত। মন উদাস করা বাতাসে খেজুর গাছের ডালপালা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। রানার পাশের সীটেই বসেছে পাপিতা।

'কি সুন্দর, তাই না?'

জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে, এলোমেলো চুলগুলোকে শায়েস্তা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। 'হ্যাঁ, সুন্দর, যদি ভাল লাগার মন থাকে।'

অল্প পথ, তাড়াতাড়ি হোটেলে পৌঁছে গেল বাস। খাতায় নাম লেখাতে একটু দেরি হলো। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় লক্ষ করল রানা, ওর পাশের কামরাটাই পাপিতার।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে খাতার দিকে তাকাল পাপিতা, তারপর মুখ তুলে

তাকাল ওর দিকে। 'হ্যাঁ, আমরা প্রতিবেশী,' বলল সে। 'কি, ভয় পেলে?'

'কেন, ভয় পাবার কি হলো?'

'সময় অসময়ে যদি বিরক্ত করি, এই ভেবে?' মধুর কটাক্ষ হানল পাপিতা।

'কাজে ব্যস্ত থাকব আমি,' বলল রানা। এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল। 'কিন্তু যখন কাজ থাকবে না, কেউ বিরক্ত করলে খুশিই হব। বিশেষ করে··· বিশেষ করে···'

মুখে হাত তুলে হাসি চাপল পাপিতা। এলিভেটরে উঠে বলল, 'গুড। আবার তাহলে আমাদের দেখা হবে।'

সাততলায় উঠে এল ওরা। লম্বা করিডর ধরে পোর্টারের পিছু পিছু এগোল। এরপর মাত্র কয়েকটা ধাপের একপ্রস্থ সিঁড়ি। নিচে নেমে লবিতে ঢুকল ওরা। ডান আর বাঁ দিকে একটা করে দরজা, পোর্টার একটা দরজা খুলে পাপিতার লাগেজ নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'গুডনাইট, হুয়ান,' একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল পাপিতা। 'প্লেনে চমৎকার সঙ্গ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক মুহূর্ত বেশি পাপিতার হাতটা ধরে থাকল রানা, কিন্তু পাপিতা ভুরু তুলতে শুরু করেছে দেখে ছেড়ে দিল। বলল, 'গুডনাইট। কাল তাহলে দেখা হবে আবার।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পোর্টারের পিছু পিছু নিজের কামরায় ঢুকল রানা। দরজা বন্ধ করতে যাবে, দেখল, নিজের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাপিতা।

দু'জনেই নিঃশব্দে হাসল ওরা, তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল দরজা।

এগারো

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা। তারপর টেলিফোনে হল পোর্টারকে বলল, তিনদিনের জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করতে চায় ও। হল পোর্টার উত্তরে জানাল, এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলের সামনে পৌঁছে যাবে গাড়ি।

ব্রেকফাস্ট সেরে সুটকেস খুলল রানা, একটা ট্রপিক্যাল স্যুট পরে ক্লজিটের ভেতর তালা দিয়ে রেখে দিল সুটকেসটা। পেটমোটা ব্রিফকেস পড়ে থাকল চেয়ারের ওপর।

এলিভেটরে চড়ে রিসেপশন হলে নেমে এল ও। আঁধার রাতের মত চেহারা হল পোর্টারের, ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে জানাল, গাড়ি তৈরি। বকশিশ দিয়ে লম্বা একপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে শেডে নেমে এল রানা। এখানেই অপেক্ষা করছে ভাড়া করা ডি. এস. সিট্রন।

চওড়া অটোরুট ধরে ডাকারের দিকে চলল রানা। 'প্লেস দো ওয়ান' ইন্ডিপেন্ডেন্স-এ গাড়ি পার্ক করে পায়ে হেঁটে শহর দেখতে বেরুল ও। রঙচঙে

কাপড় পরা আফ্রিকানরা গিজগিজ করছে রাস্তায়। বেশ কয়েকবারই ঘেরাও-এর কবলে পড়ে গেল রানা, দুনিয়ার এমন কোন ছোটখাট জিনিস নেই যা ওরা বিক্রি করছে না। চেহারায় সবিনয় হাসি ঝুলিয়ে রেখে আকার-ইঙ্গিতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে নিষ্কৃতি পেল ও। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর শহরের মতিগতি সম্পর্কে আবছা একটা ধারণা হলো ওর। ট্রাফিক আইন খুব কড়াভাবে মেনে চলা হয় না এখানে। দুটো ছোট দুর্ঘটনা দেখল ও, কেউ আহত হয়নি। ড্রাইভারদের মধ্যে আপস হয়ে যাওয়ায় পুলিস উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নাক গলাল না। রাস্তা-ঘাট বেশ পরিষ্কার। প্রচুর মেয়ে দেখা গেল, কিন্তু তাদের কাউকে সন্ত্রস্ত বলে মনে হলো না, যারা এদেরকে উত্যক্ত করতে পারত সেই বখাটেদের একজনকেও কোথাও দেখল না রানা। শহরের লোকেরা আপনভোলা, হাসিখুশি টাইপের, যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত।

একটা বুকস্টলে ঢুকল রানা। দুটো ম্যাপ আর একটা গাইড বুক কিনল ও। একটা ম্যাপ শহরের, আরেকটা শহরকে ঘিরে থাকা ডিস্ট্রিক্টের। সেলস-গার্লের বয়স হবে পঁচিশ-ছাব্বিশ, তার হাত থেকে প্যাকেট নিয়ে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল ও, 'আচ্ছা, এখানে 'দি টাওয়ার' নাইটক্লাবটা কোন্‌দিকে হবে বলতে পারো?'

'রু কারনেট-এর শেষ মাথায়,' বলল মেয়েটা। 'প্লেস দো ওয়ান' ইন্ডিপেন্ডেন্স ছাড়িয়ে বাঁদিকের দু'নম্বর রাস্তায়।'

একটা কাফেতে বসে কফি খেল রানা। ট্যুরিস্টদের হরদম আনাগোনা আছে এই শহরে, তাই বিদেশী দেখলেই চারপাশে ভিড় জমায় না এরা। কফি শেষ করে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এল ও। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল নিজের গাড়ির কাছে।

রু কারনেট খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। ক্লাবটা রাস্তার শেষ দিকে, একেবারে শেষ মাথায় নয়। ক্লাবের সামনে না থেমে সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সিট্রন, সামনে রাস্তাটা যেখানে চওড়া হয়ে গেছে সেখানে গাড়ি থামিয়ে পায়ে হেঁটে ফিরে এল রানা।

বাইরে থেকে মলিন লাগল ক্লাবটাকে। ঢোকার মুখেই লোহার একটা গ্রিল, মরচে ধরা লোহায় ধুলো জমেছে। সেটার পাশে ছোট একটা নোটিসবোর্ডে লেখা রয়েছে, ক্লাব সোয়া ন'টায় খুলবে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। বারোটার কিছু বেশি হয়েছে। তারমানে অনেক দেরি। ইতিমধ্যে দোকান-পাট বন্ধ হতে শুরু করেছে, করার মত হাতে কোন কাজও নেই, অগত্যা গাড়ি নিয়ে হোটেলের পথ ধরল ও।

রানা ডাকারের উদ্দেশে হোটেল ছাড়ার কয়েক মিনিট পর টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পাপিতার। বিছানার ওপর উঠে বসে চোখ রগড়াল সে, হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে ঠেকাল কানে। 'হ্যালো?'

'আপনার কেবল, ম্যাডাম,' ক্লার্ক জানাল তাকে। 'আপনি বললে ওপরে পাঠিয়ে দিই।'

'ইয়েস, প্লীজ,' বলল পাপিতা। 'সেই সাথে কফি আর অরেঞ্জ জুস।'

'ইয়েস, ম্যাডাম।'

রিসিভার রেখে দিয়ে বিছানা থেকে নামল পাপিতা। ড্রেসিং টেবিলের পাশেই

ওয়ার্ডরোব, একটা চাদর নেবার জন্যে সেদিকে যাবার পথে আয়নায় চোখ পড়ে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে দেখতে দেখতে ক্ষীণ একটু গর্বের হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। তারপর কেন যেন, প্লেনে ওর পাশের সীটে বসা আরোহীর কথা মনে পড়ে গেল। 'হু-য়া-ন।' মিষ্টি করে নামটা উচ্চারণের সময় মুখের ভেতর জিবের উত্থান-পতন লক্ষ করল সে।

চাদরে শরীর জড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল পাপিতা।

কয়েক মিনিট পর মিশমিশে কালো একজন ওয়েটার ঢুকল কামরায়। অল্প-বয়স, আঠারো কি উনিশ। টেবিলের ওপর একটা ট্রে নামিয়ে রাখল সে, কেবলটা ধরিয়ে দিল পাপিতার হাতে। রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল পাপিতা, যেন কালো ছেলে এই প্রথম দেখছে সে। তার কৌতূহল লক্ষ্য করে ধবধবে সাদা দাঁতে ঝিলিক তুলে স্যালুট করল ছোকরা, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে ঠেলে দিল দরজা।

সাবধানের মার নেই, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল পাপিতা। তারপর কেবল খুলল। চোখ বুলিয়েই বুঝল, ওয়াট পাঠিয়েছে। কোড ভাঙতে হবে। তাড়াহুড়ো না করে অরেঞ্জ জুস খেলো সে, সিগারেট ধরাল, তারপর কাপে কফি ঢেলে কাগজ কলম নিয়ে বসল মেসেজের কোড ভাঙতে।

কোড ভাঙার পর মেসেজটা দু'বার পড়ল পাপিতা।

'এয়ারপোর্টে মেয়েলোক খুন হয়েছে। লুডলামকে পাঠাচ্ছি, তোমার সাথে কাজ করার জন্যে ১৫.৫০-এর প্লেনে পৌঁছুবে। তোমার ওপর ভরসা রাখছি। ওয়াট।'

লাইটার জ্বেলে কেবলটা পুড়িয়ে ফেলল পাপিতা, মোজাইক করা মেঝেতে ছাই ফেলে স্যান্ডেল পরা পা দিয়ে ঘষল একটু, তারপর কফির কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল ঝুল-বারান্দায়। একটা চেয়ারে বসে চুমুক দিল কাপে, মাথার ভেতর চিন্তা-ভাবনা চলছে।

এগারোটার একটু পর একটা সুইম-স্যুট পরল পাপিতা, তার ওপর একটা আলোয়ান জড়িয়ে নেমে এল সৈকতে। এরই মধ্যে বেশ কিছু মেয়ে-পুরুষ পৌঁচেছে, কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ ছাতার নিচে শুয়ে-বসে আছে। একজন আফ্রিকান ওর জন্যে একটা ছাতা টাঙাল, ছায়ায় পেতে দিল রঙিন শতরঞ্চি।

ছায়ায় বসে সাঁচ ব্যাগ খুলল পাপিতা, উইলবার স্মিথের শেষ বইটা বের করে প্রথমে ব্যাক-কাভার পড়ল। তারপর শুরু করল প্রথম পাতা থেকে। কয়েক পাতা পড়ে বইয়ের মাঝখানে চলে এল সে। কয়েক লাইন পড়ে, পাতা ওল্টায়, আবার কয়েক লাইন পড়ে, এইভাবে চলল। মন বসাতে পারল না কিছুতেই।

বই রেখে দিয়ে সিগারেট ধরাল পাপিতা। লাইটার খুঁজছে, এই সময় তার সামনে একটা ছায়া পড়ল। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল সে।

শুধু সংক্ষিপ্ত একটা সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে আছে লোকটা। দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল শরীর। রোদে পুড়ে সোনালি-খয়েরীর মাঝখানে দাঁড়িয়েছে গায়ের রঙ। ছোট করে কাটা সোনালি চুল মাথায়। প্রায় চৌকো মুখ, চোয়ালের হাড় অস্বাভাবিক চওড়া। মুখের তুলনায় ছোট, ভোঁতা নাক। আটাশ কি উনত্রিশ বছর বয়স হবে।

চোখজোড়া সবুজ দুটো জানালা যেন, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে পৈশাচিক উল্লাস এবং নির্দয়তার সাথে আরও ভয়ঙ্কর কি যেন। লোকটার দিকে চোখ পড়তেই পাপিতার ভেতরটা কুঁকড়ে গেল।

একাগ্রদৃষ্টিতে পাপিতার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সে, ক্লিক করে লাইটার জ্বেলে বাড়িয়ে দিল হাতটা। মুখের সামনে আগুনের শিখা, চোখে আতঙ্ক নিয়ে সেটার দিকে এক সেকেন্ড তাকাল পাপিতা, তারপর সিগারেট ধরাল।

জোর করা হাসি দিয়ে ধন্যবাদ জানাল সে।

'চার আর দুই আর ছয় হলো বারো,' ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল সে। 'আমি বুলিন।'

শিউরে উঠল পাপিতা, দৃষ্টি যেন লোকটার মুখের ওপর আটকে গেছে। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ।

'ঠিক দুপুর তিনটেয় হোটেলের সামনে তোমার জন্যে গাড়ি থাকবে,' বলল বুলিন। 'তৈরি থেকো।' ঝট্ করে ঘুরল সে, পেশীতে ঢেউ তুলে, দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল সাগরের দিকে।

লোকটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে আরেকবার শিউরে উঠল পাপিতা। সৈকতের প্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে সাগরে পড়ল সে। সাবলীল নৈপুণ্যের সাথে সাঁতার কেটে দূরে সরে যাচ্ছে।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঠোঁটে সিগারেট তুলল পাপিতা। বুলিন! ওর কথা শুনেছে সে। এ-ই তাহলে বুলিন! কাকে যেন একবার বলতে শুনেছিল, বুলিন আর একটা গোখরার মধ্যে পার্থক্য হলো, গোখরার একটা নীতি আছে, ওর নেই।

বুলিনের কথা তখনও মাথা থেকে সরাতে পারেনি, সুইমিং ট্রাঙ্ক পরা হুয়ান ফার্নান্দেজকে দেখতে পেল। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রের দিকে যাবার সময় ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হ্যালো,' বলল রানা। ওর চোখের দৃষ্টি অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে পাপিতার শরীরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। 'ঝাঁপ দেবে না?'

কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে পাপিতা। জোর করে হাসল একটু। ভাবছে, বুলিন উদয় হওয়ায় এই সুদর্শন মেক্সিকানের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো কি বুদ্ধিমতীর কাজ হবে?

ঘুরে রানার দিকে মুখ করে বসল পাপিতা। 'হ্যাঁ, নামব পানিতে,' বলল সে। 'কিন্তু এখুনি নয়...'

'এখুনি,' বলল রানা। হাতটা বাড়িয়ে দিল পাপিতার দিকে। 'তারপর আমরা লাঞ্চ খাব, কেমন?'

একটু যা সংযম বা শাসন ছিল নিজের ওপর, রানা হাত বাড়িয়ে দিতে সেটুকুও আর থাকল না। খপ্ করে রানার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল পাপিতা। ছুটল রানা, পাপিতাকেও ছুটতে হলো।

দু'জন একসাথে পানিতে নামল ওরা। পাপিতা আবিষ্কার করল, বুলিনের মতই, হুয়ান ফার্নান্দেজও ওস্তাদ সাঁতারু।

মিনিট দশেক সাঁতার কেটে তীরে উঠল ওরা। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে গায়ে

আলোয়ান জড়াল। শামিয়ানা টাঙানো রেস্তোরাঁটা কাছেই, পাপিতার হাত ধরে সেখানে ঢুকল রানা। দু'জনের একটা টেবিলে বসে বলল, 'ঠাণ্ডা কিছু দরকার, কি বলো?'

একজন আফ্রিকান ওয়েটার এগিয়ে এল। অর্ডার দিল পাপিতা। রানার জন্যে কোল্ড ড্রিঙ্ক, নিজের জন্যে ভোদকা মার্টিনি। মেনুর ওপর চোখ বুলিয়ে বলল রানা, 'সাইজড প্রন, কোল্ড চিকেন, গ্রীন সালাড। চলবে?'

'চমৎকার,' বলল পাপিতা। রানার অর্ডার দেয়া শেষ হতে জানতে চাইল সে, 'সকালটা তোমার মাঠে মারা যায়নি তো?'

'শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'এখানে আমার কাজ, কোম্পানির জন্যে ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করা, কারখানা তৈরি হবে।' ড্রিঙ্ক নিয়ে এল ওয়েটার। লোকটা চলে যেতে জিজ্ঞেস করল ও, 'আজ বিকেলে কি করছ তুমি?' পাপিতা সাথে সাথে কোন জবাব দিল না দেখে গ্লাসে চুমুক দিল ও, তারপর আবার বলল, 'একটা গাড়ি ভাড়া করেছি।'

অন্যদিকে ফিরে নিজের গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকাল পাপিতা। চুমুক দিল। তারপর বলল, 'তাই?'

'গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরুব,' বলল রানা। 'আমার সাথে থাকবে তুমি? শহর ছাড়িয়ে ভেতর দিকে যাব—সেইসাথে কারখানার জন্যে জায়গা দেখাও হয়ে যাবে।'

'আজ বিকেলে?' মাথা নাড়ল পাপিতা। 'দুঃখিত। এক বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা ঠিক হয়ে আছে।'

অবাক হলো রানা। 'এখানে? এখানে তোমার বন্ধু আছে?'

'বন্ধু মানে, বান্ধবী।'

গ্লাসের দিকে মন দিল ওরা। কেউ মুখ ভার করে নেই।

'প্যারিসের চেয়ে এই জায়গা ভাল, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল পাপিতা।

'কি জানি! এই জায়গা কেমন তাই তো জানা হলো না।'

'তুমি নিশ্চয়ই প্যারিসে থাকো না, নাকি থাকো?'

'না,' বলল রানা। 'একটানা অনেকদিন কোথাও আমি থাকি না। তবে বছরের বেশির ভাগ সময় মেক্সিকোয় কাটাতে হয়। তুমি...' হঠাৎ থেমে গেল ও, চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল পাপিতা। দেখল, রেস্তোরাঁর দিকে হেঁটে আসছে বুলিন।

'দারুণ!' আন্তরিক প্রশংসা ঝরে পড়ল রানার কণ্ঠ থেকে। 'কি শরীর একখানা! হিংসে হয়, সত্যিই!'

বারে ঢুকে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল বুলিন। তার চওড়া পিঠের পেশী দেখতে দেখতে মাথা ঝাঁকাল পাপিতা। 'তা যা বলেছ, হিংসে হবারই কথা। একালের হারকিউলিস।'

'লোকটা রাশিয়ান,' বলল রানা। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, চিন্তায় পড়ে গেছে। 'রাশিয়ান লোক এখানে কি করছে?'

কথাটা শুনে হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল পাপিতার চোখ, চেহারায় ফুটে উঠল

কাঠিন্য, কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ করল না রানা।

'সে-ও হয়তো তোমার সম্পর্কে ঠিক এই কথাই ভাবছে,' বলল পাপিতা।

এই সময় ওদের লাঞ্চ নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। ড্রিঙ্ক শেষ করে বারের দিকে পিছন ফিরল বুলিন। আশ্চর্য সাবলীল, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘ ছন্দে পা ফেলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হোটেলের পথ ধরল সে।

বুলিনের চলে যাওয়াটা গভীর দৃষ্টিতে দেখল রানা। কার্ল হফারের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল, রাশিয়ানরাও খুঁজছে ওয়েন প্যাকারকে। সোনালি চুলের এই রাশিয়ান লোকটা কি তাহলে কে. জি. বি-র?

'খেতে বসে এত চিন্তা করলে বদহজম হবে,' বলল পাপিতা। 'হঠাৎ কি এমন ঘটল যে এত চিন্তায় পড়ে গেলে?'

'জানার জন্যে জেদ ধরো না, বললে লজ্জায় পড়ে যাবে।'

'তারমানে আমার কথা ভাবছ?'

'কাছেপিঠে আর তো কোন সুন্দরী দেখছি না।'

মৃদু হাসল পাপিতা। 'জানি। আমি জানি। আমি কাছে থাকলে পুরুষেরা কি ভাবে সে আমার ভালই জানা আছে।'

'কিন্তু সেজন্যে আমি অন্তত তাদের দোষ দেব না। দায়ী তুমিই।'

ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ বদল করল পাপিতা, বলল, 'তুমি আমাকে মেক্সিকোর কথা শোনাও।'

মেক্সিকোয় অনেকদিন যায়নি রানা, তবু অতীত স্মৃতি ঘেঁটে যা পাওয়া গেল তাতে পাপিতার মনে ধারণা দেয়া সম্ভব হলো, দেশটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে সে। সবশেষে বলল রানা, 'আমার জন্ম মেক্সিকো সিটিতে, কিন্তু কাজ করি গুয়াডালাজারে। তুমি তো যাওনি, বুঝবে না, ভারি সুন্দর শহর…' গুয়াডালাজার সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে, সব বলে গেল ও। ওর প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনল পাপিতা।

লাঞ্চের পর কফি এল। কফি শেষ হওয়ার আগেই বিল মিটিয়ে দিল রানা।

'তোমাকে একা রেখে চলে যেতে হচ্ছে,' বসে চেয়ার ছাড়ল পাপিতা। 'এখুনি না গেলে দেরি হয়ে যাবে আমার।'

তাড়াতাড়ি কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'আমিও আসছি। তুমি চাইলে আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিতে পারি।'

'না, আমার জন্যে গাড়ি পাঠানো হবে—ধন্যবাদ।'

হোটেলে ফেরার পথে ওদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না। এলিভেটরে করে উঠে এল ওরা। লবিতে পৌঁছে নিঃশব্দে হাত নেড়ে বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে। যে যার ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সারল রানা, কাপড় পরল, তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসল জানালার সামনে। এখান থেকে হোটেলে ঢোকার মুখটা পরিষ্কার দেখা যায়। কয়েক মিনিট পরই পাপিতাকে দেখতে পেল ও।

একটা স্লীভলেস এমারেল্ড গ্রীন ফ্রক পরেছে পাপিতা। কালো একটা ক্যাডিলাক অপেক্ষা করছিল, তাতে চড়ল সে। লাল ফেজ পরা একজন আফ্রিকান

চালিয়ে নিয়ে গেল গাড়ি।

কোথায় ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে-সম্পর্কে পাপিতার কোন ধারণাই নেই। শোফারের কালো ঘাড়ের ওপর চোখ রেখে একবার ভাবল, জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা। কিন্তু মন সায় দিল না।

অটোরুট ধরে বেশ খানিকদূর এগিয়ে এসে গতি মন্থর করল শোফার, বাঁক নিল বাঁদিকে। একটা সাইনপোস্ট দেখল পাপিতা। লেখা রয়েছে, রুফিসক্। শব্দটার কোন অর্থ করতে পারল না সে। বিকেলের রোদ এতটা কড়া হবে বলে ধারণা করেনি, তাকানো যায় না।

আরও কয়েক মাইল এগোবার পর মেইন রাস্তা ছেড়ে এল ক্যাডিলাক। এদিকের রাস্তা উঁচু-নিচু, বালি ছড়ানো। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে পিছনে তাকিয়ে মিহি বালির পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখল না পাপিতা। পথে একটা চৌরাস্তা পড়ল, গাছ দিয়ে ঘেরা। আরও খানিক এগিয়ে গাছের ফাঁকে প্রায়-লুকানো অবস্থায় দেখা গেল একটা পথ, সেটা ধরে বড়সড় একটা বাংলো টাইপ বাড়ির সামনে এসে থামল গাড়ি। বাড়ির প্রতিটি জানালা সান-শাটার দিয়ে ঢাকা।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ওর জন্যে দরজা খুলে ধরল শোফার। চোখ ধাঁধানো রোদে বেরিয়ে এল পাপিতা। শোফারের পিছু পিছু টেরেসে চলে এল ও, দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা খুলে এক পাশে সরে গেল শোফার, ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল তাকে।

ঠাণ্ডা, স্বল্পালোকিত লবিতে ঢুকল পাপিতা। শব্দ শুনে বুঝল, পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এক মুহূর্ত পর ওর সামনে একটা দরজা খুলে লবিতে বেরিয়ে এল বুলিন। সাদা শর্টস, সাদা স্পোর্টস শার্ট আর স্যান্ডেল পরে আছে সে। পাপিতাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। তাকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল পাপিতা।

বেশ বড় ঘর। বরফের মত ঠাণ্ডা। একসেট সোফা আর খানকয়েক কাঠের চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একদিকের দেয়ালে পিন দিয়ে আটকানো সেনেগালের মস্ত একটা ম্যাপ।

ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখিয়ে টেবিলের ওপর বসল বুলিন। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলাল, কিন্তু সাথে সাথে ধরাল না। 'এখানে তোমাকে আসতে বলার কারণ হলো,' বলল সে, 'প্যারিসে ঠিক কি ঘটছে জানতে চাই আমরা। জানতে চাই, সীন ওয়াট কতটুকু কি জানে বা আন্দাজ করতে পেরেছে।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'এখানকার পরিস্থিতি সুবিধের নয়।'

কোন কিছু বাদ না দিয়ে, মাদাম স্যানডোরা প্রথমবার ওয়াটকে টেলিফোন করার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব এক এক করে বলে গেল পাপিতা।

গভীর মনোযোগের সাথে শুনল বুলিন। পাপিতা থামতে বলল সে, 'বুদ্ধুটার তাহলে কোন ধারণাই নেই স্যানডোরা কি বেচতে চেয়েছিল?'

'কোন ধারণাই নেই।'

অশুভ সবুজ চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল পাপিতার মুখ। জিজ্ঞেস করল, 'তোমারও কোন ধারণা নেই?'

'না।'

'তারমানে এখন পর্যন্ত কার্ল হফার আর এই মাসুদ রানা, শুধু এরা দু'জন জানে।'

কিছু বলল না পাপিতা।

'ওয়াটের ধারণা, রানা মারা গেছে?' লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল বুলিন।

'হ্যাঁ।'

'না।'

বিস্ময় ফুটে উঠল পাপিতার চোখে।

'রানা মারা যায়নি,' আবার বলল বুলিন। 'মরা মানুষ হেঁটে বেড়ায় না। ও এখানে।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পাপিতা। 'তা কি করে হয়! ওয়াট আমাকে বলল, যদি বেঁচেও থাকে রানা, প্যারিস থেকে বেরুনো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'ওয়াট তো একটা বুদ্ধু। রানা এখানে। আজ দুপুরে তোমার সাথে লাঞ্চ খেয়েছে সে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল পাপিতার। কিন্তু পরমুহূর্তে রেগে উঠল সে। 'তা সম্ভব নয়! আমি যে লোকের সাথে লাঞ্চ খেয়েছি সে একজন মেক্সিকান ব্যবসায়ী। মাসুদ রানার চেহারার বর্ণনা আছে আমার কাছে। তার সাথে এই লোকের চেহারার কোন মিলই নেই। নিশ্চয়ই তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।'

'ভুল?' ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, কঠোর হয়ে উঠল বুলিনের চেহারা। 'ভুল আমি করি না। তোমরা যখন লাঞ্চ খাচ্ছ, ওর হোটেলরুম সার্চ করেছি আমি। রিভলভার, ছুরি, ড্রাগ পিল—একজন ব্যবসায়ীর সাথে এসব থাকবে কেন? মেক্সিকোর একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে ও, কিন্তু জানো, ওটা কার প্রতিষ্ঠান?'

'কার?'

'কার্ল হফারের,' বলল বুলিন। 'ও যে মাসুদ রানা, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হ্যাঁ, ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে। তবে, বোঝাই যাচ্ছে, সীন ওয়াটের লোক সে নয়। অন্তত এখন নেই। যেভাবেই হোক, হফার ওকে হাত করেছে।'

পাপিতার সরু ঠোঁট জোড়া টান টান হয়ে উঠল। 'তোমার কি মনে হয়, আমার সম্পর্কে জানে ও?' হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল, আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে উঠল।

'কিভাবে জানবে?'

'কিন্তু…তাহলে আমার সাথে ও…'

'কিছু সন্দেহ করে তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, ব্যাপারটা তা নয়,' বলল বুলিন। মুচকি একটু হাসল। 'সুন্দরের পুজারী ও।'

হ্যান্ডব্যাগ হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল পাপিতা।

'যখনই শুনলাম পিক কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি হোটেল ডি-প্যালেসে

উঠতে যাচ্ছে,' আবার বলল বুলিন, 'সাথে সাথে বুঝে নিলাম লোকটা হফারের লোক হবে। তোমার পাশের কামরাটা তার পাবার ব্যবস্থা আমিই করেছি।' পাপিতার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'তোমাকে সেনেগালে ডেকে আনার সেটাও একটা কারণ। রানাকে তোমার পোষ মানাতে হবে। আমি কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল পাপিতা।

'পোষ মানাতে হবে মানে, একেবারে ভেড়া বানিয়ে ছাড়তে হবে,' বলল বুলিন। 'আর, খুব তাড়াতাড়ি। এমন ব্যবস্থা করো, কাল রাতেই যেন ওর সাথে শুতে পারো।'

'সাথে না শুয়েও একজন লোককে বশ করা যায়!' রাগে লাল হয়ে উঠল পাপিতার চেহারা। 'এই ধরনের অভদ্র নির্দেশ যার কাছ থেকেই আসুক, আমি মানি না!'

'না মেনে কিন্তু তোমার কোন উপায় নেই,' নির্লিপ্ত সুরে বলল বুলিন।

'মানে?'

'হয় তোমাকে ওর সাথে কাল রাতে শুতে হবে,' বলল বুলিন, 'তা না হলে মস্ত একটা ঝুঁকি নিতে হবে।'

'ঝুঁকি?'

'তুমি চাও, রানা জানুক, তুমি আসলে একজন ডাবল-এজেন্ট? মার্কিন দূতাবাস থেকে তথ্য নিয়ে রাশিয়ান দূতাবাসে পাচার করছ?'

শিউরে উঠল পাপিতা। 'কিন্তু এই তো তুমি বললে রানা এখন হফারের হয়ে কাজ করছে। আমার কথা জানলেও ফাঁস করবে কেন?'

'স্যানডোরা কি বিক্রি করতে প্যারিসে গিয়েছিল তা তুমি জানো না বলেই এই প্রশ্ন করলে। শোনো, বলছি। ওয়েন প্যাকারকে মনে আছে তোমার?'

'ওয়েন প্যাকার···হ্যাঁ, মনে আছে। এসবের সাথে তার কি সম্পর্ক?'

'গোটা ব্যাপারটাই তাকে নিয়ে। সে এখন সেনেগালে। রানা এখানে এসেছে তার সাথে কথা বলার জন্যে। স্যানডোরা ওয়াটকে না বললেও, প্যাকারকে কোথায় পাওয়া যাবে সে-কথা রানাকে বলে গেছে। রানার কাছ থেকে জেনেছে হফার।'

'ওয়েন প্যাকার সেনেগালে?' আকাশ থেকে পড়ল পাপিতা। 'কি বলছ তুমি? সে কি তাহলে···'

'হ্যাঁ, রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছে,' বলল বুলিন। 'পালাবার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বিপজ্জনক ইনফরমেশন বাগিয়ে নেয় সে। যেমন, তোমার রাশিয়ান ডোশিয়েটিও সাথে রয়েছে তার। মাইক্রোফিল্মে করে হফারের বিরুদ্ধে যে-সব তথ্য-প্রমাণ নিয়ে এসেছে, হফারকে দশবার মৃত্যুদণ্ড আর পাঁচশো বছর জেল দেয়া যাবে তার সাহায্যে। রানা যে তোমার ডোশিয়ে ওয়াটের হাতে তুলে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু···'

'কারণ, হফারের হয়ে কাজ করতে রাজি হলেও, রানা আসলে রানাই—কেউ

তাকে ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে পারবে না। এখন যদিও প্যাঁচে পড়ে হফারের কথায় নাচছে, কিন্তু যেই সুযোগ পাবে অমনি কাউকে তোয়াক্কা না করে নিজের পথে চলবে সে। এত কথা বলে আমি বোঝাতে চাইছি, শেষ পর্যন্ত হফারের সাথে বেঈমানী করবে রানা। করবেই। তুমি দেখে নিয়ো। ভুলে যেয়ো না, ওয়াট তার মক্কেল। মক্কেলের সাথে বেঈমানী করবে না সে, কিছুতেই না। তোমার ডোশিয়ে তার হাতে তুলে দেবেই।'

চেহারা সাদা হয়ে গেল পাপিতার।

'তবে, এক কাজ করতে পারলে তোমার এই ধরা পড়ার ঝুঁকি থাকবে না,' বলল বুলিন।

'কি কাজ?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল পাপিতা।

'কাজটা তুমি পারবে কিনা জানি না,' বলল বুলিন। 'রানাকে খুন করতে পারলে…'

শিউরে উঠল পাপিতা।

'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই,' মুচকি হাসল বুলিন। 'ওকে সত্যি সত্যি খুন করার হুকুম কেউ তোমাকে দিচ্ছে না। অন্তত এখুনি নয়।'

'প্যাকার এখানে আছে তা যদি তুমি জানোই, দ্রুত জিজ্ঞেস করল পাপিতা, সরে একেবারে সোফার কিনারায় চলে এল, 'এখনও তাকে ধরছ না কেন? আমাকে তোমরা প্রোটেকশন দেবে না? আমি তো তোমাদেরই কাজ করছি!'

'ধরব কিভাবে? সেনেগালে আছে জানি, কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে জানি না। এই দেশটা তো আর ছোট একটা জায়গা নয়। সেজন্যেই রানাকে সরাবার কথা এই মুহূর্তে ভাবছি না আমি। সে-ই আমাদেরকে পথ দেখিয়ে প্যাকারের কাছে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে রানাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কথা আদায় করো!'

'বোকা নাকি! প্যাকার ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে রানা তা জানতে পারে না। প্যাকার নিশ্চয়ই একজন লোককে বিশ্বাস করেছে, সেই লোকটাই স্যানডোরাকে প্যারিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। রানা প্যাকারের এই লোকটার সাথে যোগাযোগ করবে, সে-ই রানাকে নিয়ে যাবে প্যাকারের কাছে। আমাদেরকেও। এবার বুঝেছ?'

ম্লান চেহারা নিয়ে বুলিনের দিকে তাকিয়ে থাকল পাপিতা, তারপর অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলাল।

টেবিল থেকে নেমে ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বুলিন। 'এদিকে এসো!'

সোফা ছেড়ে বুলিনের পাশে এসে দাঁড়াল পাপিতা। ম্যাপের গায়ে আঙুল রেখে বিরাট একটা ফাঁকা এলাকা দেখাল তাকে বুলিন। 'ইংরেজীতে একে বলে বুশ। অচষা বনভূমি, ঝোপ ইত্যাদি বলে তোমাকে আমি এর সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারি, আফ্রিকান বুশ কেউ না দেখলে স্রেফ বর্ণনা দিয়ে কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়। এলাকাটা সমতল। দু'মাইল হাঁটো, পাঁচ মাইল হাঁটো, কিন্তু তোমার মনে হবে, এক চুলও নড়োনি, যেখানে ছিলে সেখানেই আছ। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঘাসের চাপড়া, প্রতিটি ঝোপঝাড় হুবহু একই রকম দেখতে। দুনিয়ার

এই একটা জায়গায় তুমি এক সেকেন্ডের মধ্যে, কোন চেষ্টা ছাড়াই, হারিয়ে যেতে পারো। আর, এই মরু-ঝোপে একবার যদি হারিয়ে যাও, কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

অবাক বিস্ময়ে বুলিনের কথা শুনছিল পাপিতা, মৃদু স্বরে জানতে চাইল, 'কিন্তু এর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?'

ম্যাপের গায়ে টোকা দিল বুলিন। 'এই বিশাল নিঃসীম ফাঁকার মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে ওয়েন প্যাকার।'

'ওখানে লোকজন নেই?'

'কয়েকশো গ্রাম আছে। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। কোথাও হয়তো দু'তিনটে কুঁড়েঘর নিয়ে একটা গ্রাম। গ্রামে যে সব আফ্রিকানরা থাকে, এখনও তারা ততটা সভ্যতার আলো পায়নি। যুবক বয়সে সেনেগালে কাজ করত প্যাকার, নেটিভ আফ্রিকানদের সাথে কিভাবে চলাফেরা করতে হয় জানে। ওদের ভাষা অনর্গল বলতে পারে। আমার বিশ্বাস, ছোট কোন গ্রামে লুকিয়ে আছে সে। ইচ্ছে করলে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারে ওখানে, কেউ তার খবর জানবে না।'

'তুমি জানলে কিভাবে এই মরু-ঝোপে লুকিয়ে আছে সে?' জিজ্ঞেস করল পাপিতা। হঠাৎ আবিষ্কার করল, বুলিনের একে বারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। নিজের অজান্তেই একটু সরে এল।

'তাকে আমরা সেই মস্কো থেকে ধাওয়া করছি,' বলল বুলিন। 'এক সময় তার সামনে চলে আসি আমরা, ইউরোপের দিকে যাবার পথ বন্ধ করে দিই, অগত্যা বাধ্য হয়ে মিশরে ঢুকে পড়ে সে। কায়রোয় একটুর জন্যে তাকে আমরা ধরতে পারলাম না। পালিয়ে এল সেনেগালে। চার্টার করা প্লেন নিয়ে আবার আমাদেরকে পিছনে ফেলল সে।'

টেবিলের কাছে ফিরে এসে হ্যান্ডব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল পাপিতা। 'বলে যাও, আমি শুনছি।'

ম্যাপের সামনে থেকে সরে এসে আবার টেবিলের ওপর বসল বুলিন। 'ডাকারে আসার জন্যে একটা এয়ারট্যাক্সি ভাড়া করে প্যাকার। কিছু একটা গোলমাল দেখা দেয়, সম্ভবত যান্ত্রিক গোলযোগ। দিউগবেল-এর দশ মাইল বাইরে বিধ্বস্ত হয় প্লেনটা। আমরা জানতাম, ডাকারে পৌঁছুতে চাইছে সে, কাজেই ওত পেতে ছিলাম দিউগবেলে। দুর্ঘটনার জায়গায় এলাম আমরা। পাইলটকে পাওয়া গেল, মারা গেছে। কিন্তু প্যাকারকে কোথাও পাওয়া গেল না, সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'নাহয় ধরে নিলাম অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে সে,' জিজ্ঞেস করল পাপিতা। 'কিন্তু পালাল কিভাবে?'

'তার সামনে পালাবার রাস্তা একটাই খোলা ছিল,' বলল বুলিন। 'ওই মরু-ঝোপ ছাড়া আর কোথাও যায়নি সে। এখনও সেখানেই আছে। লিনগুয়েরে, বাকেল, মাতাম আর ক্যাডলাকে লোকজন আছে আমার। আমাদের ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে আছে সে।'

'তা কিভাবে সম্ভব?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইল পাপিতা। 'ওই

বিশাল একটা এলাকা ঘেরাও করতে যে অনেক লোক দরকার!'

'ত্রিশজন আফ্রিকানকে ভাড়া করেছি আমি, মরু-ঝোপের প্রতিটি গজ তারা সার্চ করে দেখছে। ভাগ্য এদেরকে সহায়তা না করলে, আবার সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে প্যাকার। এই ধরনের সার্চে রেজাল্ট পেতে হলে কয়েকমাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু বেশি সময় পেলে পালিয়ে যাবার একটা উপায় বের করে ফেলবে প্যাকার। তাকে আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। মাসুদ রানাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় আশা।' বিরতি নিয়ে পাপিতার চোখে চোখ রাখল বুলিন, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন বুঝতে পারছ, রানার সাথে কেন তোমার খাতির জমানো দরকার? প্যাকারের লোকটা কে, কোথায় থাকে, রানার কাছ থেকে এই তথ্যগুলো আদায় করতে হবে তোমাকে।'

মাথা নিচু করে নিল পাপিতা, কার্পেটের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমার সাধ্যমত করব আমি।'

সিগারেট ধরাল বুলিন। সিলিঙের দিকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ করে জানতে চাইল, 'লুডলাম কে?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পাপিতা। 'তার কথা তুমি জানলে কিভাবে?'

'এই ধরনের ব্যাপার জানাই আমার পেশা। তোমার হাতে পৌঁছুবার আগে ওয়াটের কেবল আমার হাত ঘুরে গেছে। ওয়াট যেমন, তার কোডও তেমনি। ভাঙতে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি আমার। কে এই লুডলাম?'

'ওয়াটের একজন স্পেশাল এজেন্ট।'

'হোটেল ডি প্যালেসে তাকে আমরা চাই না। রানার সাথে তোমার ঘনিষ্ঠ হবার পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে সে। পৌঁছুলে তুমি তাকে ডাকারে থাকতে বলবে। তার সাথে যত কম দেখা হয় তোমার ততই ভাল।'

'ব্যাপারটা অত সহজ হবে না,' উদ্বিগ্ন দেখাল পাপিতাকে। 'কারও নির্দেশ বা পরামর্শের চেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপর বেশি ভরসা রাখে লোকটা। আমার কথা ও কানেই তুলবে না।'

একমুহূর্ত চিন্তা করল বুলিন। তারপর বলল, 'চেষ্টা করে দেখো সে যেন ডাকারে থাকে। যদি না থাকে, তার ব্যাপারে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। আমিই কিছু একটা ব্যবস্থা করব। তোমার ওই একটাই কাজ—রানা।'

'তোমাকে দেখেছে ও,' বলল পাপিতা। 'রাশিয়ান বলে চিনতে পেরেছে। এখানে তুমি কি করছ, তাই নিয়ে ভাবতেও দেখেছি তাকে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল বুলিন। তার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে না পেরে অস্বস্তিবোধ করল পাপিতা।

'ঠিক আছে, হোটেলের দিকে যাব না আমি,' বলল বুলিন। 'এখানে থাকব। আমাকে দরকার হলে টেলিফোন করবে তুমি।' নম্বরটা লিখে নিল পাপিতা। 'যে-ই ফোন ধরুক, শুধু বলবে আমার সাথে দেখা করতে চাও, গাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে।' টেবিল থেকে কার্পেটে নামল সে। 'মনে রেখো, তোমার-আমার দু'জনের জন্যেই এই অ্যাসাইনমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি কুইক রেজাল্ট চাই।'

বুলিনকে অনুসরণ করে টেরেসে বেরিয়ে এল পাপিতা। একটা গাছের ছায়ায়

দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডিলাক। পাপিতাকে আসতে দেখে গাড়ির দরজা খুলে ধরল শোফার।

গাড়িতে ওঠার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল পাপিতা। কিন্তু বুলিনকে দেখা গেল না কোথাও।

বারো

ছ'টার খানিক পর হোটেল ড়ি-প্যালেসে ফিরে এল রানা। বিকেলটা দিউগবেলে কাটিয়েছে ও। রোদে সেদ্ধ হয়ে টোটো করে ঘুরে বেড়ানোই সার হয়েছে। তবে শহরটা ছোট, পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর। স্যানডোরা বলেছিল, দিউগবেলের বাইরে, মরু-ঝোপে কোথাও আছে ওয়েন প্যাকার। মেইনরোড আর শাখা পেরিয়ে এসে মরু-ঝোপের ভেতর ঢুকেই বুঝতে পারে ও, সম্পূর্ণ আলাদা একটা জগৎ এটা, অভিজ্ঞতা না থাকলে চোখের পলকে এবং অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে। আরও আবিষ্কার করল, সরু যে গলিগুলো মরু-ঝোপের দিকে চলে গেছে সেগুলোয় সিট্রনের মত গাড়ি নিয়ে যাওয়া স্রেফ বোকামি। কয়েকবারই বালির ভেতর চাকা ডেবে গিয়েছিল, তুলতে গিয়ে প্রতিবার গলদঘর্ম হতে হয়েছে ওকে। দেড়-দুই কিলোমিটারের বেশি এগোতে সাহস হয়নি, মেইন রোডে ফিরে এসে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে ও।

হোটেল কামরায় ঢুকে কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলল রানা, শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানির নিচে দাঁড়িয়ে ইচ্ছেমত ভিজল। ঘরে ফিরে হালকা একটা স্যুট পরল, এলিভেটরে করে নেমে এল নিচে। এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে বারে নামার সময় ভাবল, বিকেলটা একেবারে মাঠে মারা গেছে তা বলা যায় না। দিউগবেল শহরটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে ওর। মরু-ঝোপের ওপর চোখ বুলানো গেছে এক নজর। এবং জানতে পেরেছে ওয়েন প্যাকারকে পেতে হলে কি ধরনের বাধা টপকাতে হবে ওকে। ঠিক করল, আজ সন্ধেয় দি টাওয়ার নাইটক্লাবে যেতে হবে। পোলোকে পাওয়া যাবে ওখানে···অন্তত আশা করতে দোষ কি!

বারে ঢুকে একটা খালি টেবিলের দিকে এগোল রানা, চোখ পড়ল পাপিতার ওপর। বড়সড় কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে একা একটা টেবিলে বসে আছে সে। সাধারণ একটা সাদা ফ্রকে প্রশান্ত, পবিত্র, আর সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। তাকাতেই একটা হাত তুলে নাড়ল।

সেদিকে এগোল রানা। কাছাকাছি এসে মনে হলো, কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে পাপিতার মধ্যে। তার মুখের হাসিটা আগের চেয়ে যেন একটু বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হলো। অথচ চোখ দুটো সমান তালে হাসছে না।

'বসো,' সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল পাপিতা। বসল রানা। পাপিতা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হলো বেড়ানোটা?'

'মন্দ নয়,' বলল রানা। 'গরমটা আরেকটু কম হলে আরও ভাল লাগত।'

পাশে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। নিজের জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিল ও। দেখল, দুপুরের মতই ভোদকা মার্টিনি নিয়েছে পাপিতা। 'তুমি?' জানতে চাইল ও। 'বিকেলটা কেমন কাটালে?'

'খুব মজায়, ধন্যবাদ,' বলল পাপিতা। রানার দৃষ্টি এড়াবার জন্যে ঠোঁটে সিগারেট তুলে ধরাতে শুরু করল সে। হাসিখুশি ভাবটা ম্লান হয়ে গিয়ে তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে উঠতে চাইছে। আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। ভাবতে অবাক লাগল এই বলিষ্ঠ চেহারার সুদর্শন মেক্সিকান লোকটা আসলে মেক্সিকান নয়, বাংলাদেশী—মাসুদ রানা।

পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেবার ফাঁকে হালকা আলাপ চলল ওদের মধ্যে।

'ডিনারে তোমার সঙ্গ পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল রানা। 'সাড়ে আটটায় আমার একটা বিজনেস ডেট আছে, কিন্তু তুমি যদি তার আগে ডিনার খেতে আপত্তি না করো, খুশি হব আমি।'

'দ্যাটস লাভলি,' সানন্দে রাজি হলো পাপিতা। 'একা একা খেতে ভাল্লাগে না আমার।' পিছন দিকে হেলান দিল সে, সামনের দিকে এগিয়ে এল উন্নত বুক। 'এখানে আসার পর বুঝতে পারছি, একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কি ভুল?'

'একা আসাটা,' ম্লান হেসে বলল পাপিতা। 'কে এখানে সঙ্গ দেবে আমাকে? এখানেও সেই যদি একঘেয়েমির শিকার হই...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'আমি কাছে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই,' মুচকি একটু হাসল রানা।

'আজ রাতে ডাকারে যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ। লিফট চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল পাপিতা। 'একা একা ডাকারে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগবে না আমার। উঁহুঁ, তারচেয়ে এখানেই পচব। আশার কথা, ভাল কিছু বই আছে সাথে।'

পাপিতাকে নাইটক্লাবে নিয়ে গেলে কেমন হয়? যাবে কিনা জিজ্ঞেস করার একটা ঝোঁক চাপল রানার মধ্যে, কিন্তু সময়মত সামলে নিল সেটা। ভাগ্য ভাল হলে পোলোর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে, তখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে মেয়েটা।

'তোমার কি ফিরতে দেরি হবে?' সহজভাবে জানতে চাইল পাপিতা। 'শেষবার গলা ভেজাবার সময় আবার আমাদের দেখা হতে পারে।'

'কখন ফিরতে পারব জানি না,' বলল রানা। 'ব্যবসায়ীরা কেমন হয়, জানো না তো! বাক-বাকুম, বাক-বাকুম! তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে এখানে তোমাকে খুঁজব আমি, ঠিক আছে?' হাতঘড়ি দেখল ও। 'এবার খেতে যাওয়া যাক, কি বলো?'

'মিনিট তিনেক সময় দাও আমাকে,' চেয়ার ছেড়ে বলল পাপিতা। 'কোথাও যেয়ো না, এই যাব আর আসব আমি।' ত্রস্তপায়ে লেডিস রুমের দিকে চলে গেল সে।

টেবিল ছেড়ে চলে গিয়ে কি করল পাপিতা তা যদি জানত রানা, নির্ঘাত মাথা ঘুরে যেত ওর। লেডিস রুমের দিকেই এগোল, কিন্তু রানার চোখের আড়ালে এসে

ধাক নিয়ে ঢুকল পাপিতা টেলিফোন বুদে। বুলিনের নম্বরে ডায়াল করল সে। অপরপ্রান্তে সাথে সাথে রিসিভার তুলল বুলিন।

'আমার মেক্সিকান ব্যবসায়ী বন্ধু সাড়ে আটটায় হোটেল ছেড়ে-ডাকার যাচ্ছে,' বলল পাপিতা। 'বলছে, ফিরতে দেরি হতে পারে।' রিসিভার রেখে দিল সে।

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে লেডিস রূমে ঢুকল পাপিতা, মুখে আরেকবার মেকআপের প্রলেপ বুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল বার-এ। তাকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এল রানা।

দু'জন একসাথে রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। ডিনারের অর্ডার দেবার সময় শূয়োরের মাংসের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা গেল পাপিতার, কিন্তু রানা বলল, 'ডিনার আমি খাওয়াচ্ছি, অর্ডার তুমি দেবে না। আমি চাই না তোমার শরীরে চর্বি জমুক, কাজেই ও জিনিস বাদ।'

হেসে অস্থির হলো পাপিতা। বলল, 'আমাকে নিয়ে এত ভাব তুমি?'

'আরও কত কি ভাবি জানলে লজ্জা পাবে।'

ডিনার সাজিয়ে দিয়ে গেল ওয়েটার। খাবার সময় বেশিরভাগ কথা রানাই বলল। পাপিতার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর মনে। কিন্তু কারণটা কি, জানা নেই ওর। মেয়েটা ওকে কৌতূহলী করে তুলছে।

'প্যারিসে তুমি একা থাকো?' লেবুতে চাপ দিয়ে সালাদে রস ঝরাতে শুরু করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মুখ তুলে তাকাল পাপিতা। কি যে খুঁজল রানার চেহারায়। 'প্রচুর টাকা রেখে গেছেন বাবা। সেই সাথে একটা অ্যাপার্টমেন্ট।' মৃদু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'বলতে পারো, বখে গেছি আমি। ফূর্তি করা ছাড়া আমার কোন কাজ নেই। বেড়াই, কাপড় কিনি, ভাল খাই—কেটে যায় সময়।'

'বিরক্তি ধরে না?'

'খুব,' বলল পাপিতা। 'তখন আরও বেশি করে ওই একই কাজ করি। অনেক দূরে বেড়াতে চলে যাই, সারাদিন মার্কেটিং করি, দামী রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিই। তারপর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে একা একা চোখের পানি চাপি।'

'সেটা কেন?' জানতে চাইল রানা। 'মানে, কান্না আসে কেন?'

'কি জানি! সম্ভবত নিজের প্রতি করুণা থেকে আসে। আমি হয়তো নিজেকে ঘৃণা করি—সেই দুঃখেও কান্না আসতে পারে। জানি না।'

প্রথম একটু গম্ভীর, তারপর বিষণ্ন হয়ে উঠল রানা। মনে হলো, মেয়েটার জন্যে দুঃখ পেয়েছে ও। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না।

সাড়ে আটটার কয়েক মিনিট আগে, কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'যেতে ইচ্ছে না করলে কি হবে, কাজটা আগে,' বলল ও। 'ফিরে এসে তুমি এখানে আছ কিনা দেখার জন্যে ঢুঁ মারব একবার।'

'এগারোটা পর্যন্ত আছি আমি,' ম্লান হেসে বলল পাপিতা। 'হ্যাভ আ গুড টাইম।'

বার থেকে বেরিয়ে এসে রিসেপশন লবিতে ঢুকল রানা। ক্লার্কের হাতে ঘরের

চাবি দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরের গরম বাতাসে। শেড থেকে গাড়ি নিয়ে ডাকারের উদ্দেশে রওনা হলো ও। মনের অনেকটাই দখল করে থাকল পাপিতা।

সময় কাটাবার জন্যে ইচ্ছে করেই ঘুরপথ ধরে এল রানা, নাইটক্লাবের সামনে এসে গাড়ি থামাল রাত সাড়ে ন'টায়। ঢিলেঢালা মেজাজে রয়েছে, মাথায় ছিল পাপিতা, একটা কালো ডফিন গাড়ি যে হোটেল থেকে পিছু নিয়ে এখানে এসে পৌঁছুল সেটা ধরতেই পারল না।

সিট্রন পার্ক করছে রানা, ডফিনের যুবক আফ্রিকান ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল ওকে। খানিক দূর এগিয়ে থামল সে। দেখল, পার্কিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে ক্লাবে ঢুকল রানা।

ডফিন থেকে নেমে ক্লাবের দিকে ফিরে এল ড্রাইভার। লোকটা রোগা এবং লম্বা, পরনে একটু পুরানো হয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান স্যুট। সাধারণ চেহারা, এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা দেখে তার দিকে দু'বার তাকাবার দরকার হয়। ক্লাবের সামনে এসে থামল সে। খানিক ইতস্তত করল। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ক্লাবে ঢুকে সোজা বারে চলে এল ড্রাইভার। উঁচু টুলে বসে টনিক ওয়াটারের অর্ডার দিল সে।

একটা খিলানের নিচে একা একটা টেবিল দখল করে বসেছে রানা। কামরাটা বেশ বড়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। কামরার এক প্রান্তে ছোট একটা ডায়াস, পাঁচজন আফ্রিকান গিটার নিয়ে কোরাস গাইছে। কামরার চারদিকে টেবিল চেয়ার পাতা, যদিও বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে ডান্স ফ্লোর। রানার উল্টো দিকে বড় একটা অ্যালকোভে টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে কয়েকটা আফ্রিকান মেয়ে, অনর্গল কিচির-মিচির করছে তারা।

ওয়েটার এসে বিয়ার দিয়ে গেল ওকে। সিগারেট ধরাল রানা। অপেক্ষা করা ছাড়া এখানে আর কোন কাজ নেই ওর।

ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগল। বেশিরভাগই নিখুঁত ইউরোপিয়ান পোশাক পরা আফ্রিকান। এদের কেউ কেউ নাচল, বাকি সবাই টেবিলে বসে চুমুক দিল হালকা ড্রিঙ্কে। গানের প্রতি এদের আকর্ষণ দেখে খুশি এবং অবাক হলো রানা, প্রায় সবাই মন দিয়ে শুনছে।

প্রতিবার দরজা খোলার সময় চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার। কিন্তু যারা ঢুকল তাদের একজনকেও পর্তুগীজ বলে মনে হলো না।

মেয়েটা এল হঠাৎ করেই। উল্টোদিকের অ্যালকোভ থেকে কখন এসে পড়েছে, টেরও পায়নি রানা। মেয়েটা কালো, কিন্তু তার হরিণচোখ দূর থেকে আগেই লক্ষ করেছে ও। কাছে এসে অকারণে হাসতে লাগল সে। হাসলেও, চেহারায় একটু নার্ভাস ভাব লেগে আছে। রানার টেবিলের একেবারে সামনে এসে থামল সে।

'আমার সাথে নাচতে আপত্তি করবে তুমি?' একটু তির্যক দৃষ্টি হেনে আবার অকারণ হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠল মেয়েটা।

লাল-সাদা সিল্কের কাপড়ে ঘাঘরা ধরনের পোশাক পরেছে মেয়েটা, কোমরের ওপর সবুজ ব্লাউজটা শরীর আঁকড়ে আছে। মাথায় সবুজ পট্টি, অনেকটা চ্যাপ্টা

পাগড়ির মত দেখতে। হাতের চওড়া হাড়ের ওপর সোনালি ব্রেসলেট, কানে লম্বা ঝুমকো।

'আপত্তি কিসের?' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বরং খুবই খুশি হব।'

দলের অন্যান্য মেয়েরা হেসে উঠল খিল খিল করে। একজন আরেকজনের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে, যেন এর চেয়ে মজার দৃশ্য জীবনে দেখেনি তারা।

ডান্স ফ্লোরে নেমে এসে মেয়েটা রানার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'পরদেশী, কোত্থেকে এসেছ তুমি?' ভাঙাভাঙা মিষ্টি গলা, ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করল সে।

'মেক্সিকো থেকে,' বলল রানা। এক মুহূর্ত পর আবিষ্কার করল ও, চমৎকার নাচতে জানে মেয়েটা। দু'একটা কথা বলে বুঝল, এ মেয়ে ছল-চাতুরী তেমন বোঝে না। সহজ সরল স্বভাব। হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়তে জানে। যা মনে আসে তাই জিজ্ঞেস করে বসে। তার হাসির মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই।

'আমি আদমা। ওই যে, ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছে, আমার বোন। ওর নাম অ্যাওয়া। আমরা যমজ। আমাদের দেশে এটা একটা রীতি—যমজ হলে তাদের নাম অ্যাওয়া আর আদমা হবে। তোমার নাম কি, পরদেশী?'

'হুয়ান,' বলল রানা।

বাজনার তালে তালে পা ফেলে নাচল ওরা। অফুরন্ত দম মেয়েটার, একটু হাঁপাল না। বাজনা থামতে নাচও থামল। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে হাসল ওরা।

'এসো, আমার সাথে ড্রিঙ্ক করবে,' আমন্ত্রণ জানাল রানা। 'তোমার সঙ্গ ভাল লাগবে আমার।'

হেসে উঠল আদমা, বান্ধবীদের দিকে বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকাল একবার। বলল, 'আমি খুশি।'

টেবিলে ফিরে এসে আদমাকে বসাল রানা, তারপর নিজে বসল। হাত-ইশারায় ওয়েটারকে ডেকে আদমার দিকে ফিরল, 'বলো।'

'অরেঞ্জ জুস,' অর্ডার দিল আদমা। আরেকটা বিয়ার চাইল রানা।

কিন্তু দ্বিতীয়বার নাচার পর অরেঞ্জ জুস নয়, বিয়ার অর্ডার দিল আদমা। এবং তৃতীয় দফা নেচে ফিরে এসে বলল, 'ক্লান্তি লাগছে, একটু হুইস্কি খাব।'

হুইস্কির অর্ডার দিল রানা। তারপর স্বাভাবিক সুরে বলল, 'জানো, এখানে একটা মেয়ে ছিল। খুব লম্বা, প্রায় আমারই মত। দেখতেও ভাল।' এদিক ওদিক তাকাল ও। 'কিন্তু আজ তাকে দেখছি না।'

'দেখবে না কেন? জেসমিন ছাড়া বাকি আমরা সবাই-ই তো আছি এখানে।' হঠাৎ বিস্ময় ফুটে উঠল আদমার চেহারায়। 'এই মেয়ের কথা তুমি জানলে কিভাবে? এর আগেও এখানে এসেছ নাকি?'

'না, পরিচয় হয়েছিল। বলল, এখানে নাকি কাজ করে। কোথায় থাকে, জানো?'

'বাপের সাথে মেডিনায়।'

'অনেক দূর?'

'না। ডাকারের বাইরেই।'

'ওর পুরো নামটা জানা হয়নি আমার,' বলল রানা।
'সাদিয়া জেসমিন।'
'বাবার নাম?'
'সাদেক মোজাম্মেল,' বলল আদমা। 'জেসমিনের বাবা ব্যবসায়ী, ফলের দোকান আছে।'
'জেসমিনের একজন বয় ফ্রেন্ড আছে, তুমি জানো? পোলো না কি যেন নাম।'
আগ্রহের সাথে মাথা দোলাল আদমা। 'হ্যা-হ্যাঁ। পোলোই তো। খুব ধনী লোক। জেসমিনকে অনেক জিনিস উপহার দেয়। এই ক্লাবে রোজ রাতেই আসত, কিন্তু জেসমিন চলে যাবার পর থেকে তাকে আর দেখি না।'
'জেসমিনের এই বয়-ফ্রেন্ড কোথায় থাকে বলতে পারো?'
মাথা নাড়ল আদমা। রানা লক্ষ্য করল, মেয়েটার চোখে অস্বস্তি দানা বেঁধে উঠছে। এতগুলো প্রশ্ন শুনে মন খুঁত-খুঁত করতে শুরু করেছে তার।
'জেসমিন কিছু টাকা পাবে আমার কাছে,' বলল রানা, অনুভব করল মোটামুটি একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা আর না দিলেই নয়। 'ওকে যদি না পাই, ভাবছি ওর বয়-ফ্রেন্ডকে টাকাটা দিয়ে গেলে কেমন হয়।'
চেহারা থেকে অস্বস্তির ভাবটা দূর হয়ে গেল, আবার সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আদমার মুখ। 'কিন্তু পোলো কোথায় থাকে আমি যে জানি না! জেসমিন কোনদিন বলেনি আমাকে।'
'পোলোর পুরো নাম কি, বলতে পারবে?'
'কি জানি! জেসমিন তো তাকে শুধু পোলো বলেই ডাকত। লোকটা কোথায় থাকে, জেসমিন তা জানে বলে আমার মনে হয় না। জানলে আমাকে বলত।'
হতাশ বোধ করল রানা। আশা ছিল পর্তুগীজ লোকটাকে টাওয়ার নাইটক্লাবে পাওয়া যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে লোকটাকে পাওয়ার একমাত্র সূত্র হতে পারে স্যানডোরা ওরফে জেসমিনের বাবা সাদেক মোজাম্মেল। কিন্তু আদমার কথা যদি সত্য হয়, জেসমিন না জানলে জেসমিনের বাবা কিভাবে ওর ঠিকানা জানবে?
'শোনো, আদমা,' গলায় আবেদনের সুর ফুটিয়ে তুলে ফিসফিস করে বলল রানা, 'পোলো কোথায় থাকে তা যদি খোঁজ নিয়ে জানাতে পারো আমাকে, তোমাকে আমি অনেক টাকা দিয়ে খুশি করব।' পকেট থেকে টাকার তাড়া বের করে তা থেকে দশটা এক হাজার ফ্রাঙ্কের নোট আলাদা করল ও। আস্তে করে টেবিলের ওপর রেখে আদমার দিকে ঠেলে দিল সেগুলো। 'আরও পাবে। তুমি শুধু আমাকে এই পোলোর ঠিকানা জোগাড় করে দাও।'
আদমার সরু, কালো লম্বা আঙুল এত দ্রুত সরিয়ে ফেলল টাকাগুলো, বারে বসা ডফিনের ড্রাইভার আয়নায় চোখ রেখে ওদের ওপর নজর রাখলেও, হস্তান্তরটা দেখতেই পেল না।
'আমার নাম হুয়ান ফার্নান্দেজ,' বলল রানা। 'লোকটাকে পাওয়া গেলে হোটেল ডি-প্যালেসে তুমি ফোন করবে আমাকে?'
চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল আদমা। 'আপনি চিন্তা করবেন না। লোকটার খোঁজ আমি বের করে ফেলব। বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞেস করলেই

হবে। কেউ জানবে না, তা হয় কি করে!'

'আরেকটা কথা, আদমা,' বলল রানা। 'আমার নামটা কেউ যেন না জানে। কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলবে না। পোলোর সাথে দেখা করতে চাই আমি, কাউকে বলো না। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' গ্লাসে শেষ একটা চুমুক দিয়ে সেটা খালি করল রানা। 'আমি তাহলে এখন যাই। তুমি কাজ শুরু করে দাও, লোকটাকে খুব তাড়াতাড়ি দরকার আমার।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসতেই চোখেমুখে গরম বাতাসের আঁচ পেল রানা। হাতঘড়ি দেখার জন্যে একবার থামল ও। এগারোটা পাঁচ। তারপর ধীর পায়ে গাড়ির দিকে এগোল।

কয়েক মুহূর্ত আগে যা ঘটে গেল, ধাক্কাটা এখনও সামলাতে পারেনি আদমা। দশ হাজার ফ্রাঙ্ক, এক কথায় দিয়ে দিল লোকটা। বলল, আরও দেবে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, স্বপ্নের মত লাগছে। হঠাৎ কি মনে হতে মুখ তুলে তাকাল সে। সাথে সাথে কুঁচকে উঠল ভুরু।

লম্বা একটা লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। চেনে আদমা। ওর নাম জাহের। মেয়েলোকদের দিয়ে ব্যবসা করায়, সেই টাকায় এত বাবুগিরি। মাতলামি, ছিনতাই এসবের জন্যে বেশ ক'বার জেল খেটেছে জাহের।

সোজা এগিয়ে এসে রানার খালি করে যাওয়া চেয়ারটায় বসল সে। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল আদমা। 'তোমাকে আমি ডেকেছি? ওখানে বসলে কি মনে করে?'

'বিদেশী লোকটা কে?' কঠিন চোখে আদমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল জাহের।

'তা জেনে তোমার কি দরকার?' ফোঁস করে উঠল আদমা।

'আমি ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, আদমা!' হুমকির সুরে বলল জাহের। 'যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও। তোমার সাথে আমি গোলমাল চাই না। কিন্তু যদি বাধ্য করো…' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কে লোকটা?'

'কে তা আমি কিভাবে জানব।' ঝাঁঝের সাথে বলল আদমা। 'বিদেশী লোক, দেখে ভাল লাগল, তাই নাচতে চাইলাম…নাচল। ব্যস এখানেই শেষ।'

'দেখলাম, অনেকক্ষণ ধরে কথা বললে তোমরা,' বলল জাহের। 'এত কি কথা হলো?'

'কি আবার কথা হবে! বিদেশী লোকেরা কোন্ বিষয়ে কথা বলে জানো না? মেয়ে চরাও, তোমার তো জানার কথা।'

'জেসমিনের কথা জিজ্ঞেস করেনি?'

উঠে দাঁড়াল আদমা। 'জেসমিন? জেসমিনের কথা জিজ্ঞেস করবে কেন?' চোখে ঘৃণা নিয়ে জাহেরের দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত এগোল অ্যালকোভের দিকে। ওকে আসতে দেখে আবার এক দফা খিলখিল করে হেসে উঠল বান্ধবীরা।

*

রানা হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতেই নিজের কামরায় ফিরে এল পাপিতা। সাদা ফ্রক বদলে পরল সাদা ব্লাউজ আর কালো স্কার্ট, তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ফোন করল হল পোর্টারকে।

'ট্যাক্সি দরকার,' হল পোর্টারকে বলল সে। 'এয়ারপোর্টে যাব, ওখান থেকে ডাকার, তারপর এখানে ফিরব। প্যারিস ফ্লাইট এসে পড়ার আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে আমাকে।'

হল পোর্টার জানাল, হোটেলের সামনে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ট্যাক্সি।

এলিভেটর থেকে নিচের লবিতে নেমে এল পাপিতা, সোফায় বসে সময় কাটাবার জন্যে পুরানো এককপি ফ্রাঁসে সোয়া তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। একটু পর পোর্টারদের একজন এসে জানাল, ট্যাক্সি পৌঁচেছে।

মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল এয়ারপোর্টে আসতে। ট্যাক্সি থেকে নেমে আফ্রিকান ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল সে।

ইনফরমেশন ডেস্কের মেয়েটা জানাল, প্যারিস ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ই পৌঁছুবে, তারমানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করবে প্লেন। নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে সোফায় বসল পাপিতা, সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত ন'টার কয়েক মিনিট পর একটা প্লেন ল্যান্ড করার আওয়াজ পেয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল সে, ত্রস্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল অ্যারাইভাল গেটের সামনে।

বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। তারপর সদ্য আগত আরোহীদের প্রথম দলটাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল অ্যারাইভাল গেটের দিকে। রবার্ট লুডলামকে এদের মধ্যেই পেয়ে গেল পাপিতা।

ভাঁজ খাওয়া একটা স্যুট পরে রয়েছে লুডলাম, হাতে পুরানো একটা হোল্ড-অল। পাপিতাকে দেখে একটা হাত নাড়ল সে। 'আরে সর্বনাশ! একি গরমরে বাবা! চলো, বারে বসে গলা ভেজাই, তারপর কথা!' পাপিতার কব্জির ওপরটা চেপে ধরল সে।

পথ দেখিয়ে তাকে বারে নিয়ে এল পাপিতা।

লুডলাম আসছে, এই খবর পাবার পর থেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সে। এখন তাকে দেখে রীতিমত নার্ভাস বোধ করল। লুডলাম সম্পর্কে তার এই ভীতি নতুন নয়, বেশ পুরানো। লুডলাম যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এটা আর কেউ তেমন ভাল করে না বুঝলেও, সে বোঝে। সেটাই তার ভয়ের কারণ। সে জানে, এই লোকের অদ্ভুত এক অন্তর্দৃষ্টি আছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় নেই অথচ আছে এই রকম জিনিস পরিষ্কার দেখতে পায় ও। মনে মনে নিজেকে বার বার সাবধান করে দিল সে, এই লোকের সাথে খুব বুঝেশুনে চলতে হবে। এমন কোন আচরণ করা চলবে না যাতে ওর মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

ওয়াটের খবর জানতে চাইল সে।

'ছটফট করছেন,' বলল লুডলাম। বারের সামনে উঁচু টুলের ওপর বসল সে। 'কি নেবে?'

'জিন আর টনিক।'

নিজের জন্যে বিয়ার অর্ডার দিল লুডলাম। রাতের এই সময় বার প্রায় খালি, ওদেরকে পানীয় দিয়ে দূর প্রান্তে সরে গেল বারম্যান, খবরের কাগজ খুলে মন দিল তাতে।

'কেন, ছটফট করছেন কেন?' জানতে চাইল পাপিতা, হাতে জিন আর টনিকের গ্লাস।

'সম্ভবত নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন, তাই,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল লুডলাম। তারপর জানতে চাইল, 'কেবল পেয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল পাপিতা।

'মেয়েটা খুন হয়ে গেল, এর জন্যে তাকে দায়ী করা চলে,' বলল লুডলাম। 'যে শুনবে সেই বলবে এটা তার একটা বোকামি হয়েছে।' গ্লাসে চুমুক দিয়ে দু'ঢোক বিয়ার খেলো সে। 'বোঝাই যায়, মেয়েটার কাছে ভাইটাল ইনফরমেশন ছিল।' কাঁধ ঝাঁকাল আবার। 'মরেই যখন গেছে, আমাদের কোন সাহায্যে আসবে না।' হঠাৎ করে পাপিতার দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি হানল সে। 'তুমি কি মনে করে এখানে চলে এলে বলো দেখি?'

'আমি ভাবলাম মেয়েটা যদি আমাদের জাল এড়িয়ে বেরিয়ে আসে, এখানে আমি থাকলে আবার তাকে ধরতে পারব,' বলল পাপিতা।

'তারমানে, বোঝাই যাচ্ছে, লেসলি টমাসের ওপর তেমন আস্থা নেই তোমার,' বলল লুডলাম। 'মেয়েটা প্যারিস থেকে আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসতে পারে, আগেভাগেই এ-কথা ভেবেছিলে তুমি, সত্যি? তা যদি ভেবে থাকো, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।'

'অত কথা ভেবে এখানে আসিনি,' বলল পাপিতা। 'ভেবেছি, ও যদি পালাতে পারে, তাহলে এখানে আমি থাকলে সুবিধে হবে।'

'মেয়েটার দুর্ভাগ্য, পালাতে পারেনি,' বলল লুডলাম। 'কিন্তু তুমি এখানে আছ। কোন সূত্র পেয়েছ?' প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সে।

'এখনও পাইনি।'

কাউন্টারে কনুই রেখে পাপিতার দিকে ভাল করে তাকাল লুডলাম। 'কি খুঁজছ তুমি, কোন ধারণা আছে?'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল পাপিতা। ওয়াটকে মনে মনে অভিশাপ দিল সে। এত থাকতে এই লোকটাকে পাঠাল! এত কথা বলাচ্ছে তাকে, নিজের কথায় নিজেই ফেঁসে না গেলে হয় এখন। 'পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। আমার আশা ছিল এই মেয়েটা হয়তো...'

'সত্যি কথাটা বলছ না কেন?' দেঁতো হেসে জিজ্ঞেস করল লুডলাম। 'কেন স্বীকার করছ না ওয়াট সাহেব তোমাকে হতাশ করে তুলেছেন, আর একঘেয়েমি দূর করার জন্যে তোমার একটা ছুটি দরকার ছিল?'

হাসল বটে পাপিতা, কিন্তু চেষ্টাকৃত হাসি হলো সেটা। 'এসব আমি স্বীকার করব, এটা তুমি আশা করতে পারো না, লুডলাম। তবে, এখানে এসে ভালই লাগছে।'

'রানা তোমার প্লেনে ছিল না?'

এমনই অপ্রত্যাশিত একটা প্রশ্ন, চমকে ওঠায় হাতের গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা জিন। লুডলামের দিকে তাকাতে ভয় করল পাপিতার, জানে, তার দিকে চেয়ে আছে সে।

'রানা?' অবশেষে বলল পাপিতা। 'বুঝলাম না! সে তো মারা গেছে।'

'রানা মারা গেছে, এটা ওয়াট সাহেবের ধারণা,' বলল লুডলাম। 'তার কথামত, শেষবার রানাকে দেখা গেছে সুইট প্যারিস ক্লাবে—কার্ল হফারের দু'জন চেলার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার কি ধারণা জানো?'

কিছু একটা বলা দরকার তাই বলা, পাপিতা জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'আমার ধারণা,' বলল লুডলাম, 'আশরাফ-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে হফারের দলে ঢুকেছে রানা। হফার তাকে নিয়েছে কাজ আদায় হবে ভেবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস রানা তাকে সময়মত ঠিকই একটা ল্যাং মারবে। রানাকে দিয়ে কাজ করাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের কবর খুঁড়েছে হফার। কিন্তু প্রসঙ্গ এটা নয়। আমি বলতে চাইছি, রানা যদি হফারের দলে যোগ দিয়ে থাকে, তার মরার প্রশ্ন ওঠে না, ওঠে কি?'

চুপ করে থাকল পাপিতা।

'আমার বিশ্বাস, হয় রানা এখানে আছে, নয়তো এখানে আসছে।'

নিচের ঠোঁট মুখের ভেতর খানিকটা পুরে ভিজিয়ে নিল পাপিতা। 'তোমার ধারণাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না,' গ্লাসের ভেতর তাকিয়ে থেকে বলল সে। 'রানার চেহারার বর্ণনা আছে আমার কাছে। এখানে আমি নজর রাখব।'

'তোমার আজ হয়েছে কি?'

মুখ তুলে তাকাল পাপিতা। 'মানে?'

'বোকার মত কথা বলছ কেন?' ধৈর্য হারাবার সুরে বলল লুডলাম। 'তুমি কি মনে করো নিজের চেহারা নিয়ে এখানে আসবে রানা? তাকে তুমি দেখলেও চিনতে পারবে না। এই সহজ ব্যাপারটা বুঝছ না!'

গ্লাসে চুমুক দিল পাপিতা। বুকের ভেতর দ্রুত ধুকধুক করছে হৃৎপিণ্ড। প্রতি মুহূর্তে সত্যের আরও কাছে চলে আসছে লুডলাম।

'তুমি তাহলে কি করতে বলো?' অনেকটা জোর করেই নিজেকে লুডলামের চোখে তাকাতে বাধ্য করল পাপিতা।

'তোমার হোটেলে নিঃসঙ্গ কোন ব্যবসায়ী উঠেছে?'

'বেশ কয়েকজনই তো উঠেছে।'

'তাদের মধ্যে তোমার সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে কেউ?'

ঢোক গিলল পাপিতা, কথা বলার আগে গলা পরিষ্কার করে নিল। 'কই, না···এখনও তো সে-চেষ্টা কেউ করেনি।'

'সতর্ক থাকো। রানার এই একটা দুর্বলতা আছে বলে শুনেছি··· সুন্দরী মেয়ে!'

'ঠিক আছে।'

বিয়ার শেষ করল লুডলাম, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল, মুখ মুছল রুমাল দিয়ে।

'আরেকটা কথা··· তোমার হোটেলে কোন রাশিয়ান আছে?'

পাপিতার বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। 'রাশিয়ান? কই, চোখে পড়েনি। কেন, কি ভাবছ?'

'এই সেট-আপ সম্পর্কে খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করছিলাম,' বলল লুডলাম। 'গোটা ব্যাপারটা মাথার ভেতর নাড়াচাড়া করে কয়েকটা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি আমি।'

'যেমন?'

'মেয়েটার কাছে ভাইটাল কিছু সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল, তা না হলে হফার তাকে খুন করত না। কি সেই ইনফরমেশন? এখানে মনে রাখতে হবে, মাত্র কিছুদিন হলো মস্কো থেকে ফিরেছে হফার। আমার সিদ্ধান্ত, আমরা যা জানি রাশিয়ানরা তারচেয়ে বেশি জানে। কাজেই ওদের কথা ভুলে থাকলে চলবে না। আমার মন বলছে, ওরা এখানে আছে। সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'

'ও,' বলল পাপিতা। বলেই বুঝল, লুডলামের এত কথার পর এই ছোট্ট মন্তব্য যথেষ্ট নয়। 'ঠিক আছে, চোখ খোলা রাখব আমি।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে পাপিতাকে দেখল লুডলাম, মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'হ্যাঁ, চোখ খোলা রাখো। চলো তাহলে, হোটেলে যাই। ঘুমুতে হবে আমাকে।'

'তুমি নিশ্চয়ই হোটেল ডি-প্যালেসে উঠছ না?'

'নয় কেন?'

'সবকিছুর মাঝখানে থাকতে চাইবে ভেবে আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার স্টেশন হবে ডাকার,' বলল পাপিতা। 'এদিকের ব্যাপার আমি সব সামলাতে পারব। হোটেল ডি-প্যালেস তো আর কাছে নয়, ডাকার থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে। কিছু যদি ঘটে, ঘটবে ওই ডাকারেই।'

ঝট করে ঘুরে পাপিতার দিকে মুখ করে বসল লুডলাম। 'তোমার এ-কথা মনে হবার কারণ?'

এই প্রথম লুডলামের ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখল পাপিতা। তাড়াতাড়ি বলল, 'হোটেল আর সী-বীচ, এছাড়া ওখানে আছেটা কি? কিই-বা ঘটতে পারে ওখানে?'

'নেই বোলো না। আর কিছু না হোক, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তো আছে,' বলল লুডলাম। একমুহূর্ত চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'ঠিক আছে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তাহলে ডাকারই আমার হেডকোয়ার্টার হোক। তোমার কাজ হোক এয়ারপোর্টের ওপর নজর রাখা। এখানে ট্যাক্সি পাব কি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল পাপিতা। লুডলামের সাথে ডাকারে যাবে না সে, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এরপরও যদি এই লোকের সান্নিধ্যে থাকতে হয়, পাগল হয়ে যাবে।

'কাল কোন একসময় তোমার সাথে যোগাযোগ করব আমি,' বাইরে বেরিয়ে এসে বলল লুডলাম। একটা ট্যাক্সির সামনে থামল ওরা। 'ফোন করে তোমাকে জানাব কোথায় উঠেছি। এখন তাহলে আসি।' বলে, আরেকবার পাপিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে। স্টার্ট দেয়াই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল পাপিতা, তারপর ফিরে এল এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে। ফোন বুদে ঢুকে বুলিনের নাম্বারে ডায়াল করল সে।

তেরো

হোটেলে ফিরে এসে লবি থেকে চাবি সংগ্রহ করল রানা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বারে। নানা দেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে দেখা গেল, টেবিলে ড্রিঙ্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, কিন্তু পাপিতাকে কোথাও দেখল না ও। ধারণা করল, ওর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সে হয়তো হোটেলে নিজের কামরায় চলে গেছে। এক বোতল সোডা ওয়াটারের অর্ডার দিল ও, এই গরমে এরচেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

বার থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ল ও। নিজের কামরায় ফিরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল, তারপর গায়ে জড়াল হালকা একটা ড্রেসিং গাউন। কি মনে করে ঝুল-বারান্দায় চলে এল ও।

থালার মত মস্ত চাঁদ উদ্ভাসিত করে তুলেছে সাগর আর ফুলের বাগানটাকে। রেইলে হাত রেখে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাঁতার কাটার প্রচণ্ড একটা ঝোঁক চাপল। যাবে কি যাবে না ভাবছে, এইসময় পাশের ঝুল-বারান্দা থেকে শব্দ পেল ও।

দুই ঝুল-বারান্দার মাঝখানে একটা পার্টিশন, কিন্তু ঝুঁকে পড়ে পার্টিশনের ওদিকটা দেখা সম্ভব। কান খাড়া করে থাকল রানা। একটু পর আবার হলো শব্দটা। কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কি, ঘুম আসছে না?' জিজ্ঞেস করল রানা, জানে, ওদিকের বারান্দায় পাপিতা আছে।

'কে···ও, তুমি ফিরে এসেছ! না···এত গরমে মানুষ ঘুমোয় কিভাবে!'

'এ রকম একটা হোটেলে এয়ারকন্ডিশনিং নেই কেন বুঝি না।'

'কিছু কিছু কামরায় আছে। কেমন কাটল তোমার সময়?'

'যেমন কাটার কথা—বোরিং। খালি বক বক।'

একটু বিরতি, তারপর পাপিতা জানতে চাইল, 'আমার বিদঘুটে লাগছে—তোমার? এই যে কথা বলছি, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

কপালে ভুরু তুলে পার্টিশনের মাথায় তাকাল রানা। একটা লাফ দিল ওপর দিকে। পার্টিশনের মাথাটা ধরে ফেলল। ওদিকে ঝুল-বারান্দায় পৌঁছুতে তিন সেকেন্ডও লাগল না ওর। 'এখন আর বিদঘুটে লাগবে না, কি বলো?'

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত সুরে বলল পাপিতা, 'বিপদ হতে পারত।'

পাপিতার সামনে একটা চেয়ার খালি পেয়ে সেটায় বসে পড়ল রানা। 'রোমিও যেসব বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল, এটা তো সে সবের তুলনায় কিছুই না।'

হেসে ফেলল পাপিতা। তারপর রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মুখ তুলল আকাশে, গোল চাঁদের ওপর স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। দু'জনেই চুপচাপ, শুরু হতে না হতেই যেন শেষ হয়ে গেছে ওদের আলাপ।

অনেকক্ষণ পর, চাঁদের দিকে চোখ রেখেই, পাপিতা বলল, 'জানো, পুরুষদের আমি হিংসে করি। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করতে পারে। যেখানে মন চায় যেতে পারে। কিন্তু একটা মেয়েকে কোথাও একা দেখা গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। কিংবা পিছু নেবে। কিংবা লোকে খারাপ বলবে। মেয়ে হয়ে জন্মানো বোধহয় একটা পাপ।'

'তোমার মত স্মার্ট আর আধুনিক একটা মেয়ের মুখে এই ধরনের কথা শুনব বলে আমি আশা করিনি,' বলল রানা। 'একমতও হতে পারলাম না। আজকাল পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। তৃতীয় বিশ্বে পরিস্থিতি এতটা ভাল নয়, কিন্তু ইউরোপে যত লোক ট্র্যাভেল করছে তাদের অর্ধেকই মেয়ে।'

'বুড়ি।'

পাপিতার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল রানা। 'কোন কারণে তোমার মন খারাপ?'

'না। এখানে একা বসে থাকতে থাকতে...' কাঁধ ঝাঁকাল পাপিতা। '...একাকিত্বকে আমার সাংঘাতিক ভয়, হুয়ান। এই একটাই কারণে মৃত্যু আমার কাছে একটা আতঙ্ক। আমার সবচেয়ে বড় শত্রু এই নিঃসঙ্গতা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল পাপিতা, রেইল ধরে চাঁদের দিকে তাকাল।

হালকা রঙের পাতলা একটা নাইলন কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়েছে পাপিতা, চেয়ার থেকে তার লম্বা পা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল রানা। কোন শব্দ না করে চেয়ার ছাড়ল ও। পাশে রানার উপস্থিতি টের পেয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাপিতা। দুই হাতে পাপিতার কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানল রানা। একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল পাপিতা, পরমুহূর্তে ঢিল পড়ল তার পেশীতে, শরীরটা নেতিয়ে পড়ল রানার গায়ে। নিচু হলো রানা, পাপিতার ঘাড়ের পাশে ঠোঁট ছোঁয়াল।

শিউরে উঠল পাপিতা। কাঁপুনিটা অনুভব করল রানা। সিধে হয়ে রানার মুখোমুখি হলো পাপিতা, ঠোঁট জোড়া তুলে ধরল ওপর দিকে, সামান্য একটু ফাঁক হয়ে আছে সে দুটো। রানার তৃষিত ঠোঁট নেমে আসতেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা।

এরমধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। নির্জন অটোরুট ধরে ট্যাক্সি নিয়ে ডাকারে আসার পথে ভাবছে লুডলাম।

পাপিতা অমন নার্ভাস হয়ে আছে কেন? এই অবস্থায় আগে কখনও দেখেনি ওকে। তার মুখে রানার নাম শুনেই এমন চমকে উঠল, আরেকটু হলে গ্লাসটাই পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে। কেন? তারপর, রাশিয়ানদের কথা তুলতেই মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ব্যাপার কি?

কিছু একটা রহস্য না থেকেই পারে না। সেনেগালে আসার কারণ কি

পাপিতার? ওয়াট বলেছেন, তিনি ওকে পাঠাননি। বললেন, পাপিতা সেনেগালে যাওয়ায় তিনি খুশি হয়েছেন, কিন্তু তারমানে এই নয় যে তিনি ওকে পাঠিয়েছেন। তাহলে? নিজের টাকা খরচ করে এখানে এল কেন? পাপিতা জানে, লেসলি টমাস কি রকম কাজের লোক। প্যারিস ছেড়ে মেয়েটা পালাতে পারবে না, এইটাই তার ধরে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু বলল উল্টো কথা! উঁহুঁ, সেনেগালে আসার পিছনে অন্য কোন কারণ আছে পাপিতার! কিন্তু কি হতে পারে সেটা?

বারবার পায়ের ওপর পা তুলল আর নামাল লুডলাম। খানিক পরপরই শোনাল নিজেকে, কোথাও একটা ঘাপলা আছে। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবল ততই যেন দৃঢ় হয়ে উঠল তার বিশ্বাস। মুখে যাই বলুক, সীন ওয়াটের বুদ্ধিমত্তা আর কূটনীতির ওপর শ্রদ্ধা আছে তার। ওয়াট কি তাকে আসলে পাপিতার ওপর নজর রাখার জন্যে এখানে পাঠিয়েছেন? তিনি কি শেষ পর্যন্ত পাপিতার ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছেন?

অনেক কথাই মনে পড়ে গেল লুডলামের। পাপিতা তাকে কোনদিনই পাত্তা দেয়নি। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কিন্তু তার সাথে সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে পাপিতা। আর সবার সাথে উষ্ণ হতে দেখেছে ওকে, আন্তরিক হতে দেখেছে, কিন্তু তার সামনে পড়লেই কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় পাপিতা। ওয়াটের হয়ে কাজ করে এমন দু'একটা মেয়ে আরও তো আছে, তারা কিন্তু এমন নয়। হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে, পাপিতার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সমাজের উঁচু মহলে চলাফেরা করে, নিজের ওজন সম্পর্কে সব সময় বড় বেশি সচেতন। সেজন্যেই কি পাপিতাকে অপছন্দ করে সে? নাকি তাকে অপছন্দ করার পিছনে আরও গভীর কোন কারণ আছে, যা নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়? ব্যাপারটা কি এমন হতে পারে—এতদিন এই লাইনে থেকে, লোকজনের সাথে ওঠাবসা করে যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছে সেই অভিজ্ঞতার গুণেই তার অন্তরের অন্তস্তল গাইছে, এই মেয়েকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না?

সিগারেট ধরাল লুডলাম। শেষ পর্যন্ত অবচেতন মন থেকে এই প্রসঙ্গটা বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে, এটা উপলব্ধি করে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। আসল ব্যাপারটা তাহলে অন্য রকম! পাপিতা আমাকে পাত্তা দেয়নি, কারণ আমার হাবভাব দেখে পাপিতা বুঝতে পারত, আমি ওকে বিশ্বাস করি না। আমার অবচেতন মনে পাপিতার প্রতি অবিশ্বাস ছিল, সেটা আমি নিজে টের না পেলে কি হবে, পাপিতা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।—ভাবল লুডলাম।—সেজন্যেই আমার সাথে অমন ঠাণ্ডা ব্যবহার করত সে।

অবচেতন মন কখনোই বিশ্বাস করেনি পাপিতাকে। কিন্তু কেন? গত চার-পাঁচ বছর এক সাথে কাজ করছে ওরা। পাপিতার ওপর বিশেষ আস্থা রাখেন ওয়াট। মেয়েদের মধ্যে পাপিতাই সেরা এজেন্ট, এ-কথা অনেকবার তিনি বলেছেন। তাহলে? পাপিতাকে অবিশ্বাস করার পিছনে কি কারণ আছে তার অবচেতন মনের?

অনেক ভেবে-চিন্তেও পাপিতাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ বের করতে পারল না লুডলাম। বরং মনে পড়ল, কয়েকটা কাজে চমকপ্রদ সাফল্যের পরিচয়

দিয়েছে পাপিতা।

সিডেল-এর কথা মনে পড়ল লুডলামের। টপ সিক্রেট ইনফরমেশন রাশিয়ানদের হাতে তুলে দিচ্ছিল সিডেল। একটানা কয়েক বছর ধরে এই কাজ করে আসছিল সে। তার এই বিপজ্জনক কুকীর্তি ফাঁস করে দেয় এই পাপিতাই। কাউন্টার এসপিওনাজের ইতিহাসে এটা শুধু চমকপ্রদই নয়, একটা বিস্ময়কর সাফল্য।

কিন্তু··· কিন্তু··· সিডেল ধরা পড়ায় পাপিতার সুনাম ছড়িয়ে পড়লেও, সি.আই.এ-র কোন লাভ হয়নি। কারণ, সিডেল মারা গেল। সত্যিই কি সে আত্মহত্যা করেছিল? নাকি তার পেট থেকে কথা আদায়ের আগে চুপ করানো হয়েছে?

এরপর আরবানের কথা মনে পড়ল লুডলামের। আরবানের কুকীর্তিও এই পাপিতাই ফাঁস করে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও, লোকটা ধরা পড়ায়, সি.আই.এ-র কোন ফায়দা হয়নি। ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে পালাবার চেষ্টা করে আরবান, রাস্তায় একটা গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে। গাড়ির নম্বরটা ছিল ভুয়া। কোন হদিস পাওয়া যায়নি। রহস্যময় নয়?

আরেকটা কথা মনে পড়ল লুডলামের। সিডেল আর আরবান, দু'জনকেই সন্দেহ করা হচ্ছিল, এই সময় পাপিতা ওদেরকে ধরতে পারে। পাপিতা যদি না-ও পারত, লেসলি টমাসের হাতে ধরা তারা পড়তই।

সিডেল আর আরবান মারা যাওয়ায় সি.আই.এ.-র কোন লাভ না হলে কি হবে, লাভ হয়েছে কে. জি. বি-র।

চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে এল লুডলামের। হোটেল ডি-প্যালেসে কোন রাশিয়ান উঠেছে কিনা জিজ্ঞেস করায় পাপিতার চেহারা অমন রক্তশূন্য হয়ে উঠল কেন? সিডেল আর আরবানের ব্যাপারটা যখন ঘটল, সবাই বলল, পাপিতার দুর্ভাগ্য। ওরা মারা না গেলে সুনাম আরও বাড়ত পাপিতার। তবে তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ওয়াট তাকে সেরা মেয়ে এজেন্টের সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি। একমাত্র পাপিতাকেই তিনি তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। তাহলে কি দাঁড়াল ব্যাপারটা? সিডেল আর আরবান মারা যাওয়ায় লাভবান হয়েছে রাশিয়ানরা, লাভবান হয়েছে পাপিতা।

উত্তেজিত হয়ে উঠল লুডলাম। ভাবল, আমি যেভাবে চিন্তা করছি, তাতে পাপিতাকে ডাবল-এজেন্ট বলে মনে করতে হয়।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা খারাপ করছে না তো সে? কিন্তু তারপরই মনে প্রশ্ন জাগল, পাপিতা আমাকে হোটেল ডি-প্যালেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল কেন? ওখানে কি এমন ঘটছে যা আমাকে জানতে দিতে চায় না সে?

মন্থর হয়ে এল ট্যাক্সির গতি। ড্রাইভার বলল, 'সামনে ডাকার, স্যার। কোথায় যাব?'

'ভাল কোন হোটেলে,' বলল লুডলাম।

ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিল সে, স্যানডোরা মেয়েটার ঠিকানা না পাওয়া পর্যন্ত পাপিতার ওপর একটা চোখ রাখব আমি। তাতে হয়তো কপালে জুটে যেতে পারে আশাতীত কোন উপহার।

রু গ্যালান্দু-দিউফ-এ পৌঁছে হোটেল কন্টিনেন্টালের সামনে থামল ট্যাক্সি। তরতর করে সিঁড়ির ধাপ ক'টা ভেঙে ছুটে এল একজন আফ্রিকান পোর্টার। ড্রাইভারকে ভাড়া দিচ্ছে লুডলাম, হোল্ডঅলের দায়িত্ব নিল সে। তাকে অনুসরণ করে লবিতে চলে এল লুডলাম।

বাথরুম সহ একটা কামরা চাইল ও। খাতায় নাম লিখিয়ে হল পোর্টারকে হাত-ইশারায় ডেকে বলল, কাল সকাল আটটায় একটা ট্যাক্সি দরকার হবে তার, ড্রাইভার ছাড়া। হল পোর্টার জানাল, এটা কোন সমস্যাই নয়। পাসপোর্টটা চেয়ে নিল সে।

এলিভেটরে চড়ে তিনতলায় উঠে এল লুডলাম। কামরাটা মাঝারি আকারের, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। গা থেকে কোট নামিয়ে হোল্ডঅল খুলল সে। সারাক্ষণ মাথার ভেতর ঘুরছে পাপিতা।

রাশিয়ানদের সাথে সম্পর্ক আছে পাপিতার, কোনভাবেই বিশ্বাস হয় না। ভাবল, কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিচ্ছি আমি, সেজন্যেই পাপিতাকে সন্দেহ হচ্ছে আমার। দেরাজে শার্টগুলো গুছিয়ে রাখার সময় নিজেকে সম্বোধন করে বলল, তুমি শালা সাংঘাতিক খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক।

খালি হোল্ড-অল ক্লজিটে ভরে রেখে বিছানায় বসল সে। ঠিক করল, কাল সকালে হোটেল ডি-প্যালেসে যাবে ও। এক নজর চোখ বুলিয়ে দেখে আসবে। যত তাড়াতাড়ি পাপিতাকে সন্দেহমুক্ত করা যায় নিজের মানসিক শান্তির জন্যে ততই মঙ্গলজনক হবে সেটা।

বাংলো টাইপ বাড়িটার সামনে থামল রঙচটা গাড়িটা। জাহের নামতেই কাছাকাছি ছায়া থেকে দু'জন লম্বা আফ্রিকান স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর।

'আমি,' তাড়াতাড়ি বলল সে, 'জাহের। মি. নেলসনকে রিপোর্ট করব।'

জাহেরের শরীরে হাত দিয়ে চেক করা হলো। ছুরি, রিভলভার কিছুই পাওয়া গেল না। তাকে নিয়ে বাংলোর ভেতর ঢুকল ওরা।

একটা চেয়ারে বসে আছে বুলিন, সামনের টেবিলে একটা ম্যাপ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল জাহের। কামরায় আরও একজন লোক রয়েছে। মাথায় চুলের রেশমাত্র নেই, সম্পূর্ণ কামানো। ধড়টা মানুষ আকৃতির, কিন্তু মুণ্ডুটা বুলডগের সাথে বেশি মেলে। ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর চেহারা। সম্ভবত খুব বেশি ভোদকা খায় বলেই মুখের রঙ এই রকম লাল, ভুল করে মনে হতে পারে, চামড়া খসানো হয়েছে। একে কারলোভিচ বলে চেনে সবাই। রাশিয়ায় যারা পিস্তল দিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করতে পারে, কারলোভিচ তাদের একজন। কোন কাজে বাড়তি লোকের দরকার হলে একেই বেছে নেয় বুলিন। বুলিন থাকলে সেখানে কারলোভিচকেও পাওয়া যাবে।

মুখ তুলে জাহেরকে দেখল বুলিন। চোখ ইশারায় এগিয়ে আসার নির্দেশ দিল সে। বুকে ভয় নিয়ে ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল জাহের। ভয় পাবার কারণ আছে তার। জানে, বুলিন যে কাজটা তাকে করতে দিয়েছে তাতে সফল হয়নি

সে। শুধু টাকা পাবে বলে, তা না হলে এই বাঘের ঘরে সে পা দিত না।

'তারপর?'

'আপনার হুকুম মত লোকটার পিছু নিই আমি,' বলল জাহের। 'রু-কারনেটে একটা নাইটক্লাব আছে, দি টাওয়ার। মক্কেল সেখানে গেল। বেশ রাত পর্যন্ত ওখানেই ছিল সে। তারপর সোজা হোটেলে ফিরে যায়।'

সবুজ চোখের অশুভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে জাহেরকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল বুলিন। তারপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'শেষ?'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে সরু কাঁধ দুটো একটু তুলল জাহের। 'ডাকারে এসে বিদেশীরা তো শুধু এই কাজই করে, স্যার! নাচে আর মদ খায়। আপনার এই মক্কেলও তাই করছে।'

'নাচল? কার সাথে নাচল?'

শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে নিল জাহের।

'কালো একটা মেয়ের সাথে।'

চোখ পাকাল বুলিন। মনে হলো, এই মুহূর্তে জাহেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঘের মত গর্জে উঠল সে, 'আমি নাম জানতে চেয়েছি!'

বুলিনের গর্জনের তুলনায় জাহেরের গলার আওয়াজ ফিসফিসে শোনাল, অথচ বেশ জোরেই জবাব দিল সে, 'আদমা, স্যার। ওর বোনের নাম অ্যাওয়া, স্যার। ওদের বাপের নাম…'

'ওই ক্লাবে রোজ আসে সে?'

'জী-জী, রোজ আসে। কলগার্ল, স্যার,' দ্রুত কথা বলছে জাহের। ধমক খাবার পর নিজের ওপর অনেকটাই কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে। 'বেশ্যা, স্যার।'

'জেসমিন তার বান্ধবী ছিল?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল জাহের। 'ছিল বৈকি, স্যার। থাকবেই তো। সে-ও তো, মানে জেসমিনও তো কলগার্ল ছিল। কিন্তু খুব দামী কলগার্ল, স্যার। সাধারণ লোক পাত্তা পেত না…'

'এই লোক আর কোন মেয়ের সাথে নাচেনি?'

'সে সুযোগ আদমা কাউকে দিলে তো। মক্কেলকে সারাক্ষণ আগলে রেখেছিল সে, স্যার। মাগী বহুত চালাক!'

'ক্লাবে সে কতক্ষণ ছিল বললে?'

'প্রায় দু'ঘণ্টা, স্যার।'

'প্রতিটি মুহূর্ত তার ওপর চোখ ছিল তোমার।'

'হ্যাঁ, জী, স্যার। বারের ওপর আয়না আছে, সেটা থেকে চোখ নামাইনি। ওরা আমাকে দেখতে পায়নি, স্যার।'

'নাচল, তারপর কি করল?'

'ড্রিঙ্ক করল, স্যার। আর কথা বলল।'

'কি কথা বলল?'

'মিষ্টি মিষ্টি কথা, স্যার। গুরুত্বপূর্ণ কিছু না,' বলল জাহের। 'মক্কেল চলে যাবার পর আদমার সাথে কথা বলেছি আমি। ওদের আলাপে জেসমিনের প্রসঙ্গ

পর্যন্ত ওঠেনি, স্যার।'

'লোকটা কিছু দেয়নি আদমাকে? টাকা?'

'না, স্যার।'

'তাহলে দু'ঘণ্টা খাটল কেন আদমা? তুমিই তো বললে, সঙ্গ দেয়া তার ব্যবসা!'

লম্বা কানের লতি ধরে বার বার টানছে জাহের। এই একটা বদাভ্যাস তার, নার্ভাস হয়ে পড়লে হাতটাকে কানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। 'কি জানি, কেন খাটল! হয়তো ড্রিঙ্ক কিনে দিয়েছে বলে আর কিছু চায়নি আদমা।'

'তারমানে, রিপোর্ট করার মত কিছু জোগাড় করতে পারোনি তুমি।'

অসহায় দেখাল জাহেরকে। 'আমি কি করব, স্যার! কিছু ঘটেনি, সেটা কি আমার দোষ, আপনিই বলুন?'

বিরক্তির সাথে বাতাসে হাত ঝাপটাল বুলিন। হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল সে। তারপর একহাজার ফ্রাঙ্কের একটা নোট ছুঁড়ে দিল জাহেরের দিকে। উড়ে যাওয়া প্রজাপতি ধরার জন্যে বাচ্চা একটা ছেলে যেভাবে ছোটে, জাহেরও সেভাবে ছুটে এসে মেঝেতে পড়ার আগেই লুফে নিল নোটটা।

'জেসমিনকে তুমি কতটুকু চিনতে?' জিজ্ঞেস করল বুলিন, জাহেরের কাছ থেকে কোন তথ্য না পেয়ে তাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না।

'পরিচয় ছিল, স্যার। দু'একবার কথাও হয়েছে। উঁচুদরের মেয়ে ছিল কিনা, কাছে ঘেঁষা একটু কঠিন হত। এক ভদ্রলোক বাঁধা খদ্দের ছিলেন ওর। খুব ধনী, খুব প্রভাবশালী। জেসমিনের রক্ষক।'

'কে সে? নাম কি?' শান্ত সুরে জানতে চাইল বুলিন।

'কে, তা জানি না, স্যার। শুধু জানি বিস্তর টাকার মালিক তিনি।'

'দেখেছ কখনও?'

'একবার? জেসমিন থাকতে রোজ ক্লাবে আসতেন।'

'দেখতে কেমন?'

'ভদ্রলোক পর্তুগীজ, স্যার। মোটা মানুষ। ইয়া গোঁফ।'

চোখ সতর্ক, শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল, তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল বুলিন, 'পর্তুগীজ কিনা ঠিক জানো তুমি?'

'জানি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুলিন। 'যেতে পারো,' বলে এগিয়ে গিয়ে স্টীল সেফের সামনে দাঁড়াল সে।

অসহায় চোখে কারলোভিচের দিকে তাকাল জাহের। হাত-ইশারায় তাকে বিদায় হতে বলল কারলোভিচ। জাহের কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বুলিনের দিকে ফিরল সে। জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

সেফ খুলে ভেতর থেকে মোটা একটা ফোল্ডার বের করল বুলিন। টেবিলের সামনে ফিরে এসে বসল নিজের চেয়ারে।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্লাসে ভোদকা ঢালল কারলোভিচ। বুলিনের দিকে চোখ রেখে ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগল গ্লাসে।

'প্যাকারের ডোশিয়েতে কিছু একটা পড়েছি, ঠিক মনে করতে পারছি না।' ফোল্ডার খুলে একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছে বুলিন।

গ্লাস নিঃশেষ করে আবার তাতে ভোদকা ঢালল কারলোভিচ। চেহারায় ধৈর্য এবং নির্লিপ্ততা নিয়ে প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করল সে। তারপর টেবিলের ওপর খটাস করে হাত চাপড়াল বুলিন।

'পেয়েছি!' বলল সে। 'বছর বিশেক আগের কথা। ডাকারের একটা আইসপ্ল্যান্টে এঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করত ওয়েন প্যাকার। এই আইস ফ্যাক্টরির মালিক ছিল একজন পর্তুগীজ। নাম, চেস্টন পোলো। ওরা দু'জন ডাকারে একই বাড়িতে থাকত।' চোখ তুলে কারলোভিচের দিকে তাকাল বুলিন। 'এই পোলোই হয়তো জেসমিনের প্যারিসে যাবার আয়োজন করেছিল। কে জানে, এই লোক হয়তো জানে প্যাকার কোথায় লুকিয়ে আছে।'

'বিশ বছর,' বলল কারলোভিচ। 'অনেকদিন আগের কথা। এখনও কি ডাকারে আছে ওই লোক?'

একগাদা খবরের কাগজের তলা থেকে ফোন গাইডটা বের করল বুলিন। চেক করে দেখে বলল, 'গাইডে তার নাম নেই। কিন্তু আইস ফ্যাক্টরির নাম আছে।'

'এখন?' জানতে চাইল কারলোভিচ।

'কাল ডাকারে গিয়ে তদন্ত করব আমরা,' বলল বুলিন। চেহারায় ক্ষীণ একটু উত্তেজনার ছাপ। টান টান হয়ে উঠল ঠোঁটের একটা কোণ, নাকের দু'পাশে কয়েকটা রেখা ফুটে ওঠায় নিষ্ঠুর দেখাল চেহারা। 'তোমার নিস্তার নেই, ওয়েন প্যাকার, দাঁড়াও,' ফিসফিস করে বলল সে, 'আসছি আমরা।'

মরুযাত্রা

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮৪

এক

ধীরে ধীরে নিটোল ঘুম থেকে জেগে উঠল জেনি পাপিতা। শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে রয়েছে গভীর সুখ। এই মুহূর্তে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ আর ঝুঁকির কথা মনে থাকল না, উপলব্ধি হলো—জীবন বড় আনন্দের।

জানালা গলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে একগোছা তাজা ফুলের মত উজ্জ্বল সোনালি রোদ, মোজাইক করা মেঝেতে আলপনা এঁকেছে, চোখ মেলতেই বারকয়েক কুঁচকে উঠল পাতা জোড়া। কপালের কাছে হাত তুলে ছোট্ট রিস্টওয়াচ দেখল সে। সাতটা দুই।

মাথা ফিরিয়ে পাশে শুয়ে থাকা মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে। 'হুয়ান ফার্নান্দেজ!' ফিসফিস করে ডাকল একবার।

জেগে আছে রানা, কিন্তু সাড়া দিল না।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্রুত হয়ে উঠল পাপিতার নিঃশ্বাস। নিজেকে তার রাক্ষুসী, ডাইনী এই সব মনে হতে লাগল। ইচ্ছে হলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। ক্ষীণ, কাঁপা কাঁপা একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। চাদরের তলা দিয়ে রানার নগ্ন তলপেটে ডান হাত রাখল সে। আঙুলগুলো নড়েচড়ে নামছে নিচের দিকে। নিজের অজান্তেই অস্ফুট একটা গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে।

বালিশে কনুই রেখে মাথা তুলল পাপিতা, রানার মুখে মুগ্ধ দৃষ্টি রেখে ভাবল, এই ছদ্মবেশের আড়ালে না জানি কেমন দেখতে লোকটা!

চোখ না মেলেও মুখের ওপর পাপিতার দৃষ্টি অনুভব করে নড়ে উঠল রানা, পাশ ফিরে একটা হাত রাখল তার নিরাবরণ পিঠে, কাছে টানল। রানার গায়ে নিজের শরীরটা ঢিল করে দিল পাপিতা।

পাপিতার জীবনে দেহ উপভোগ এই প্রথম নয়। পুরুষমানুষ তার বেঁচে থাকার নিতান্ত প্রয়োজনীয় একটা উপকরণ। কিছুদিন পর পর এমন একটা সময় আসে, মিলনের জন্যে কাঙাল, নির্লজ্জ হয়ে ওঠে তার শরীর। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, বিছানার সঙ্গী জুটলেও প্রায় সময়ই তৃপ্তি মেলে না। পুরুষরা বিছানায় এমন জঘন্য রকম স্বার্থপর, ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ওদের ওপর এক ধরনের ঘৃণা জন্মে গেছে তার মনে। নিজেদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয় ওরা, তার ব্যাপারে থাকে সম্পূর্ণ উদাসীন। সবশেষে দেখা যায়, অতৃপ্ত পাপিতা একা একা বিছানায় ছটফট করছে, ষোলো আনা মজা লুটে বিদায় নিয়েছে সঙ্গী। কিন্তু গত রাতে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতার স্বাদ দিয়েছে তাকে মাসুদ রানা।

গত রাতের আদর চিরকাল মনে থাকবে পাপিতার। কিভাবে পাপিতা উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে যাবে, রানা যেন সেটা জানত। আর সবাই যেমন জবরদস্তি করে, রানা তার ধার দিয়েও যায়নি। অলস ভঙ্গিতে, প্রচুর সময় নিয়ে শুরু করে ও, ধীরে ধীরে অস্থির উন্মাদিনী করে তোলে তাকে। তারপর ঘটে বিস্ফোরণ। আগে পরে নয়, একসাথে। সবশেষে নিজেকে নিঃস্ব, নির্জীব এবং পরিতৃপ্ত লাগে পাপিতার। সারা শরীরে বাসা বাঁধে গভীর সুখ। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পাপিতার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

সেই তৃপ্তি, সেই তীব্র আনন্দের স্বাদ আবার পেতে চায় পাপিতা। সুখের এই দুর্লভ উপকরণ হাতে পেয়ে সেটাকে হারাতে চায় না সে। জীবনে এই প্রথম মার্কিন আর রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করার জন্যে নিজের ওপর রাগ হলো তার। আজ মনে হচ্ছে, একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে যে পথে পা বাড়িয়েছিল, সেটা যে শুধু তাকে আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তাই নয়, তাকে ঠেলে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মহা এক বিপদের মুখে। এই বিপজ্জনক জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে, বুঝল, এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, গা বাঁচিয়ে পিছু হঠার আর কোন রাস্তাই খোলা নেই।

কারণটা টাকা নয়। রানাকে যা বলেছে সেটাই সত্যি। ধনী সমাজ-সেবক পিতার একমাত্র সন্তান পাপিতা। বাবা মারা যাবার পর আবিষ্কার করল, সারা জীবন দু'হাতে টাকা ওড়ালেও তার ব্যাংক ব্যালেন্স শেষ হবার নয়। অথচ এই টাকা আর জীবন নিয়ে করার কিছুই নেই তার।

বাবার পথ ধরে কিছুদিন সমাজ-সেবার চেষ্টা করল সে। দেখল, সারা দুনিয়া জুড়ে দান পাবার আশায় যারা বসে আছে, সংখ্যায় তারা এতই যে তার সব টাকা বিলিয়ে দিলেও সমুদ্রে বারি বিন্দুর চেয়ে বেশি কোন প্রভাব ফেলবে না। তাছাড়া সমাজ-সেবার জন্যে শুধু টাকা নয়, মনও দরকার, সেটি তার ছিল না।

মায়ের জন্ম ইতালিতে হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন। সেই মার্কিন মুলুকে বেড়াতে গিয়ে পাপিতা দেখল, ধনী লোকের মেয়ে-বউরা প্রয়োজন থাক বা না থাক মন-পছন্দ জিনিস-পত্র কেনাকাটা কারাটাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বা করণীয় বলে ধরে নিয়েছে। তার বৈচিত্র্য-পিয়াসী মন ঝুঁকে পড়ল সেদিকে। জন্মসূত্রে মায়ের কাছ থেকে একটা খারাপ গুণ পেয়েছে সে, কোন কিছুই বেশিদিন ভাল লাগে না তার। রোজ রোজ একগাদা মার্কেটিং করা, প্রতি মাসে গাড়ি বদলানো, পার্টিতে যাওয়া, পার্টি দেয়া, ভাল রেস্তোরাঁয় খাওয়া, সমাজের ধনী লোকদের সাথে ওঠাবসা—ক'দিনই বা ভাল লাগে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে একঘেয়েমিতে পেয়ে বসল তাকে।

ঠিক এই সময় এক পার্টিতে সীন ওয়াটের সাথে পরিচয়। তারচেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও, ওয়াটের ব্যক্তিত্ব এবং তীক্ষ্ণ চেহারা আকৃষ্ট করল তাকে। নিজের সম্পর্কে যে-সব কথা খতিয়ে ভাবেনি কখনও, ওয়াট সেগুলো তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তাকে বলা হলো, দেশ-বিদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে তোমার। তুমি ধনী, সবাই তোমাকে চেনে,

তোমার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। বিদেশী দূতাবাসগুলোয় ককটেল পার্টি আর ডিনার পার্টি হলেই তুমি নিমন্ত্রণ পাও। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি সুন্দরী—সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের এরচেয়ে বড় ছাড়পত্র আর কিছু হতে পারে না।

দিনকয়েক পর পাপিতাকে ডিনার খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল সীন ওয়াট। বলল, 'তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে। তোমার একঘেয়েমির কথা যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, আমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে, আমরা তোমাকে তুলে নিয়ে আসতে পারি রহস্য আর রোমাঞ্চের বিচিত্র এক জগতে।'

কি প্রচণ্ড আগ্রহের সাথেই না ওয়াটের কাজ করতে রাজি হয়েছিল পাপিতা! যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে তথ্য সংগ্রহ করা, এর মধ্যে অন্যায় বা খারাপ কিছু দেখতে পায়নি সে। কাজগুলোও পানির মত সহজ, শুধু ঘুরে বেড়ানো, লোকজনের কথা মন দিয়ে শোনা, গুজবের উৎস আবিষ্কার, সবজান্তাদের সাথে খাতির রাখা—ব্যস। সারা হপ্তায় যা জানতে পারবে সে, সেগুলো গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে রিপোর্ট করতে হবে ওয়াটের কাছে।

প্রথম বছরটা বেশ মজাই লাগল, কিন্তু তারপর আবার যাকে-তাই অবস্থা, একঘেয়েমিতে পেয়ে বসল তাকে। উত্তেজনা চায় সে, এমনকি বিপদও, কিন্তু ওয়াট তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট দিতে রাজি নয়। তাকে বলা হলো, এখন তুমি যেসব কাজ করছ সেগুলোই তোমার জন্যে ভাল।

তারপর এক বিকেলে একটা ফোন কল পেল পাপিতা। লোকটা নিজের পরিচয় দিল রেলিক বলে। পাপিতা যাদেরকে চেনে তাদের কথা বিশদ উল্লেখ করে নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করল লোকটা, শেষ পর্যন্ত শ্যেন নদীর ধারে একটা বোটে পাপিতা আসবে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করল সে।

চল্লিশের ওপর বয়স লোকটার, সিনেমার নায়কদের মত চেহারা। তার প্রতিটি আচরণ এবং নড়াচড়ায় মার্জিত আদব-কায়দার পরিচয় পাওয়া যায়। বোটম্যান ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে, পাপিতাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানাল রেলিক। প্রথম দিকে মনে হলো, পাপিতার রূপে মুগ্ধ একজন কোটিপতি সে, পাপিতাকে নিয়ে আনন্দ বিহারে বেরোতে পারায় তার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ ভাষায় আলাপ শুরু করল লোকটা। দেখা গেল, পাপিতা সম্পর্কে সমস্ত খবর তার নখ-দর্পণে, নাড়ি-নক্ষত্র কিছুই তার অজানা নেই। পাপিতা একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারছে না, এরজন্যে পাপিতাকেই দায়ী করল লোকটা। বলল, ওয়াটকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। চমকপ্রদ কিছু একটা করে তাক লাগিয়ে না দিলে ওয়াট তোমার যোগ্যতা বুঝবে না। আচ্ছা, ভাল কথা, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তুমি কি খুব বিরূপ ধারণা পোষণ করো?

সোভিয়েত রাশিয়া কেন, দুনিয়ার কোন দেশের বিরুদ্ধেই বিরূপ ধারণা পোষণ করে না পাপিতা। ওয়াটের দরকার, তাই রাশিয়া সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে সে। না, রাশিয়ানরা তাকে কাজে লাগাতে চাইলে আমেরিকা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে তার কোন আপত্তি নেই। এতে অন্যায়ের কি আছে? আমেরিকাও আমার দেশ নয়, রাশিয়াও আমার দেশ নয়। লোকজনের মুখের কথা বাতাসে উড়ে

বেড়াচ্ছে, সেগুলো শুনে আরেকজনের কানে তুলে দেয়া, এর মধ্যে অপরাধ কোথায়? তাছাড়া, আমি এটাকে পেশা হিসেবেও নিইনি। একমাত্র লাভ, আমি এতে মজা পাই, আনন্দ-উত্তেজনার খোরাক পাই। এখন প্রশ্ন হলো, রাশিয়ানরা কি আমার যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে উৎসাহী? তারা কি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট দিতে রাজি আছে?

এইভাবে শুরু। যত দিন যেতে লাগল ততই নির্ভুল হতে লাগল পাপিতার কাজ। ক্রমেই এক্সপার্ট হয়ে উঠল সে। প্রথম দিকে রাশিয়ানরাও তাকে ছোটখাট কাজ দিল। তবু, দুই দেশের হয়ে কাজ করছে বলে, এসব কাজেও প্রচুর উত্তেজনা আর মজা পেল পাপিতা। আগের চেয়ে অনেক সাবধানে চলাফেরা করতে হয় তাকে। চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতে হয়। সবসময় নজর রাখতে হয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। বোঝে, মার্কিনীরা যদি জানতে পারে সে রাশিয়ার হয়েও কাজ করছে তাহলে পরিণতি ভয়ঙ্কর। এই বিপদের ঝুঁকিটাই তার জীবনে নতুন রোমাঞ্চ আর স্বাদ এনে দিল। তারপর একদিন সিডেল আর আরবান সম্পর্কে কিছু তথ্য দিল রেলিক। এই তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে ওদের দু'জনকে বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত করল পাপিতা। খুব বুদ্ধি করে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল, ওয়াটকে বোকা বানানো কোন সমস্যাই হয়নি। বেচারাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হয়, পাপিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ফলেই এই দু'জন বেঈমানের পরিচয় ফাঁস করা সম্ভব হয়েছে।

আসলে, সিডেল আর আরবানকে দিয়ে রাশিয়ানদের আর কোন কাজ হচ্ছিল না। ওরা দু'জন তাদের ঘাড়ে বোঝার মত চেপে বসেছিল। ধরা পড়ে-পড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল দু'জনই।

এরপর শুরু হলো পাপিতার নতুন ক্যারিয়ার। রাতারাতি সীন ওয়াটের সেরা মেয়ে-এজেন্ট হয়ে উঠল সে। আর ঠিক এই সময় রাশিয়ানরাও তার ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করল। ছোটখাট তথ্য যোগানোর ফরমাশ না দিয়ে, তাকে ওরা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট দিতে শুরু করল।

অভিজ্ঞতা বেড়েছে পাপিতার, কোন্ কাজে কতটা বিপদ বোঝে সে। লক্ষ্য করল, প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট আগেরটার চেয়ে কঠিন। এই প্রথম একটু ভয় ভয় লাগল তার। এর কিছুদিন পর আরও বিপজ্জনক একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হলো তাকে। এই প্রথম কাজটা করে দিতে রাজি হলো না সে।

টেলিফোনে তাকে ডেকে পাঠাল রেলিক। ঠিকানা লিখে নিয়ে রওনা হলো পাপিতা।

বাড়িটা নির্জন, লোক বলতে রেলিক একা। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে সে-ই দরজা খুলে দিল। ঠাণ্ডা চোখে পাপিতার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল রেলিক। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। তার পিছু পিছু হলঘরে ঢুকল পাপিতা। নিজে একটা আরাম কেদারায় বসল রেলিক, কিন্তু পাপিতাকে বসতে বলল না।

'ডেকেছেন কেন?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল পাপিতা।

পাপিতার চোখে চোখ রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রেলিক। তারপর

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে চুরুট ধরাল। কটু-গন্ধী ধোঁয়া পাপিতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, পাপিতা।'

রেলিক আর কিছু বলছে না দেখে পাপিতা জানতে চাইল, 'কি কথা?'

'তোমার নিরাপত্তা,' বলল রেলিক, 'আমাদের হাতে। সিডেল আর আরবানের কথা ভুলে যেয়ো না—ওরাও তোমার মত ডাবল এজেন্ট ছিল।'

অর্থাৎ উত্তেজনা আর মজা টেনে এনেছে ওকে অনেকদূর। এখন থেকে ব্যাপারটা আর নিছক খেলা রইল না। জটিল এক ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে সে, যেখান থেকে চাইলেও বেরিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

টেলিফোনের তীক্ষ্ণ ঝন ঝন শব্দে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল পাপিতা। বিছানার কিনারা ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে রানা, টেলিফোনটা টেবিলের ওপর। রানা নড়েচড়ে উঠতেই তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাপিতা, দ্রুত হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে তুলে নিল রিসিভার।

'ইয়েস?'

'আমার ঠিকানায় ন'টার মধ্যে,' বলল বুলিন।

'এত সকালে?' প্রতিবাদের সুরে বলল পাপিতা। 'সম্ভব নয়। আরও খানিক দেরি করে যাব।'

'ন'টায়,' বলে রিসিভার রেখে দিল বুলিন।

রানার বুক থেকে নামতে যাবে পাপিতা, অনুভব করল তার পিঠে হাত বুলাচ্ছে রানা। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল সে, তারপর গড়িয়ে নেমে পড়ল রানার ওপর থেকে। বিছানায় বসে চাদর টেনে বুক ঢাকল, বলল, 'ধেত্তেরী ছাই, কিছু যদি মনে থাকে!' রানার দিকে তাকাল, চোখ-ইশারায় ফোনটা দেখাল ওকে। 'আমার বান্ধবী, লিজা। গাড়ি করে কোথায় যেন বেড়াতে নিয়ে যাবে আমাকে। ন'টার মধ্যে দেখা করতে হবে ওর সাথে, একদম মনেই ছিল না!'

'তাই? তোমার বান্ধবী?' জানতে চাইল রানা। 'বন্ধু নয়?'

'মানে?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল পাপিতা। জিভ, গলা সব শুকিয়ে এল তার।

'না, কানে এক-আধটু আওয়াজ ঢুকল কিনা—মনে হলো, পুরুষ মানুষের গলা।'

'ও, এই কথা!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠল পাপিতা। 'দোষ তোমার নয়। ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে লিজার।'

'বেচারী!' বলে চাদরের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাপিতাকে জড়িয়ে ধরল রানা, টেনে নিজের বুকের ওপর এনে ফেলল তাকে। 'তুমি খুব সুন্দর,' বলে পাপিতার চোখে চুমু খেলো ও। তারপর ঠোঁট দিয়ে খুঁজতে শুরু করল ঠোঁট।

হঠাৎ করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল পাপিতা। 'উঁহুঁ, না···এখন নয়···শোনো, প্লীজ! অ্যাই, লাগে!' বগলের নিচে সুড়সুড়ি অনুভব করে হি হি করে হেসে উঠল। 'আশ্চর্য লোক তো! রাত কাটালে, এবার যাও! এই, কি হচ্ছে! ছাড়ো, প্লীজ!'

দু'জোড়া ঠোঁট জোড়া লেগে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল কথা। এক সেকেন্ড

জোর খাটাল পাপিতা, পরমুহূর্তে ঢিল করে দিল শরীর। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে আঁকড়ে ধরল রানার চওড়া পিঠ।

অনেকক্ষণ পর, পাশাপাশি শুয়ে হাঁপাচ্ছে ওরা, তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

একটা আঙুল দিয়ে রানার ঠোঁট স্পর্শ করে বলল পাপিতা। 'এই স্বাদ আগে কখনও পাইনি জীবনে।'

বিছানায় উঠে বসে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আটটা বাজতে চলল,' বলল ও। 'চলি।'

বিছানা থেকে নেমে মেঝে থেকে কাপড় তুলে নিল রানা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাপিতা। 'আজ রাতে আসবে না, হুয়ান?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে। 'তা না হলে কিন্তু মরে যাব আমি।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। 'আজ সারাটা দিন কিভাবে কাটবে এখুনি বলতে পারছি না,' বলল ও। 'তবে রাতে একবার ফিরবই। যদি পারি লাঞ্চের সময় বীচে খুঁজব তোমাকে।'

রানা চলে যেতেই মন খারাপ হয়ে গেল পাপিতার। কোথাও যেতে ভাল লাগছে না। ইচ্ছে হলো, সারাদিন শুয়ে থাকে। তারপরই মনে পড়ল, তার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই। বুলিনের হাতের পুতুল সে, সময়মত না পৌঁছুলে খেপে যাবে লোকটা। বিছানা থেকে নেমে খোলা জানালার সামনে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল সে, মাথা থেকে রানাকে সরাতে পারছে না। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢুকল বাথরুমে।

ন'টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে রিসেপশন লবিতে নেমে এল পাপিতা, সেখান থেকে বেরিয়ে এল হোটেলের টেরেসে। দেখল, কালো ক্যাডিলাকটা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। তালগাছের মত লম্বা আফ্রিকান শোফারের হাতে বাঁশের সরু একটা ছোটো টুকরো, একমনে সেটার ডগা চিবাচ্ছে সে। মাথার লাল ফেজ টুপিটা পিছন দিকে হেলে আছে। পাপিতাকে এগিয়ে আসতে দেখে গাড়ির দরজা খুলে দিল সে, ঝকঝকে সাদা দাঁতের উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কালো মুখ। ছোট্ট করে মাথা নিচু করে বো করল সে।

বাংলোয় পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগল। সারাটা পথ বুলিন কেন ডেকেছে তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল পাপিতা। নার্ভাস এবং অসুস্থ বোধ করল সে।

আরও নার্ভাস বোধ করত পাপিতা যদি জানত হোটেলের আঙিনা থেকে ওকে ক্যাডিলাকে চড়তে দেখেছে রবার্ট লুডলাম। ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে সাড়ে আটটায় হোটেল ডি-প্যালেসে পৌঁছায় সে। পাপিতাকে অনুসরণ করবে কি করবে না ভেবে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর ভাবল, পাপিতা প্রফেশনাল, পিছু নিলে টের পেয়ে যাবে। ক্যাডিলাকের লাইসেন্স নাম্বার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল সে। সিমকায় স্টার্ট দিয়ে ফিরে চলল ডাকারের দিকে।

বাংলোর সামনে থামল ক্যাডিলাক। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে লবিতে ঢুকল পাপিতা।

ওর অপেক্ষাতেই ছিল বুলিন। ওকে নিয়ে বড় ঘরে চলে এল।

'মাসুদ রানা,' বলল সে। 'কাল রাতে কোথায় ছিল? কিছু বলছে তোমাকে?'

'বলল, সন্ধেটা ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে কাটিয়েছে।'

'মিথ্যে কথা,' বলল বুলিন। 'টাওয়ার নাইটক্লাবে ছিল সে। সময় কাটিয়েছে কালো একটা মেয়ের সাথে। এই মেয়েটা স্যানডোরার বান্ধবী। এখন বুঝতে পারছ তো? এই লোক যে শুধু মাসুদ রানা তাই নয়, এ-ব্যাটা এখন কার্ল হফারের হয়ে কাজ করছে।'

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল পাপিতার, মুখে কথা যোগাল না।

'আমরা বসে নেই, তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি,' বলল বুলিন। 'কিছু কিছু সুফলও আসতে শুরু করেছে। রানার ব্যাপারে তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে?'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'বিছানার ব্যাপারটা। বলেছিলাম, ওর সাথে শুতে হবে তোমাকে। কিন্তু এখন আর তার দরকার হবে না।'

কারণ জিজ্ঞেস করতে অস্বস্তি আর দ্বিধা বোধ করল পাপিতা, শুধু চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল বুলিনের দিকে।

'এখন আমার বিশ্বাস, রানাকে ছাড়াই ওয়েন প্যাকারকে খুঁজে বের করতে পারব আমরা,' বলল বুলিন। 'আর ক'মিনিটের মধ্যেই শিওর হতে পারব।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পাপিতার দৃষ্টি। 'কিছু ঘটেছে। কি সেটা?'

'আমার বিশ্বাস, প্যাকারের একটা কন্ট্যাক্ট আছে এখানে। সন্দেহ নেই, সেই কন্ট্যাক্টকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে রানা। এই কন্ট্যাক্টের মাধ্যমেই প্যাকারকে পাবে ও।' পাপিতা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে তাকে বাধা দিল বুলিন। 'সেই কন্ট্যাক্ট কে, বোধহয় চিনতে পেরেছি আমি। তার নাম চেস্টন পোলো। অনেক বছর আগে প্যাকার আর পোলো পরস্পরের বন্ধু ছিল। পোলো...' নিকোলাই কারলোভিচকে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল সে, তারপর জানতে চাইল, 'কি?'

'আইস ফ্যাক্টরি থেকে অবসর নিয়েছে পোলো,' বলল নিকোলাই, চট করে একবার দেখে নিল পাপিতাকে। 'এখন সে লিল দো গোরি-তে থাকে। ছোট একটা দ্বীপ ওটা। ডাকার পোর্ট থেকে মাইল তিনেক দূরে। তার ভিলার নাম ভেনাস।'

'এই দ্বীপে যাবার উপায়?'

'নিয়মিত ফেরি সার্ভিস আছে। পৌঁছুতে মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট নেয়,' বলে একটা চেয়ার টেনে তাতে বসল নিকোলাই। কথা বলার সময় চোখ পড়ে থাকল পাপিতার সুগঠিত পায়ের গোছের ওপর।

'দেরি নয়, আজ সকালেই ওখানে পৌঁছুব আমরা,' বলল বুলিন।

'ঠিক আছে,' বলল নিকোলাই। 'কিন্তু আমরা দু'জন যাব না, একজন যাব। এই লোককেই আমরা খুঁজছি, তা না-ও হতে পারে। আমাদের দু'জনের একসাথে রাস্তায় বেরোনোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'কে যাবে?' জানতে চাইল বুলিন।

'আমি। সাথে চারজন লোক থাকবে। আমরা যা জানতে চাই গড় গড় করে বলে দেবে লোকটা, সেরকম কিছু আশা করা বৃথা। কথা ওর কাছ থেকে আদায় করতে হবে।'

'হ্যাঁ,' বলল বুলিন। 'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই যাও।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'বোট ছাড়বে কখন?'

'দশটার বোট ধরার সময় পাব না। সাড়ে এগারোটায় আরেকটা বোট আছে, সেটা ধরছি।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপিতার পা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নিকোলাই। 'দেখা যাক, ভাগ্য ফেরে কিনা। গেলাম।'

নিকোলাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পাপিতার দিকে ফিরল বুলিন। 'এই লোক যদি বলতে পারে প্যাকার কোথায় আছে, রানাকে নিয়ে কি করব আমরা বলতে পারো?'

চেহারায় এমন একটা গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে রাখল পাপিতা, যেন বুলিনের প্রশ্নটা ভাল বুঝতে পারেনি সে। সরল গলায় জানতে চাইল, 'কি করব?'

'ভেবে বের করো।'

খানিক পর কাঁধ ঝাঁকাল পাপিতা, বলল, 'আমরা যদি জানতে পারি প্যাকার কোথায় আছে তাহলে রানা আমাদের কোন কাজে লাগছে না। সেক্ষেত্রে ওকে নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেই চলবে।'

'বোকা নাকি!' রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল বুলিনের চেহারায়। 'ওই তো আমাদের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা! প্রথম কাজ হবে, ওকে শেষ করা। প্যাকার কোথায় লুকিয়ে আছে এ-কথা জানার পর এই কাজে কোনমতেই দেরি করা চলবে না। ওকে তুমি গাড়ি করে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দেবে। এখানে নিয়ে আসবে। বলবে, এটা তোমার বান্ধবীর বাড়ি। এখানে তুমি তাকে আনতে পারলে মেরে ফেলাটা কোন সমস্যাই নয়।'

পাপিতার বুকের ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। 'যতটুকু পারি করব,' বলে উঠে দাঁড়াল সে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বুলিনের দৃষ্টি। কিন্তু চোখ না ফিরিয়ে পাপিতাও তার চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

'আর লুডলাম? তাকে নিয়ে কি করতে চাও?' জানতে চাইল বুলিন। 'কাল রাতে টেলিফোনে কথা বলার সময় মনে হলো তোমার ধারণা, সে তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভুলও হতে পারে,' বলল পাপিতা, নার্ভাস ভঙ্গিতে হ্যান্ডব্যাগটা বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে সে। 'এক এক করে অনেক প্রশ্ন করল আমাকে। তোমাকে তো সব বলেছি। অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক।'

ঠোঁট-বাঁকা হাসিতে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল বুলিনের চেহারা। 'আমিও তাই। একবারে একটা কাজ। প্রথমে আমরা রানাকে সরাব, তারপর লুডলামকে। শকুনের দল বিরাট একটা ভোজ পাবে মনে হচ্ছে।'

প্রচুর সময় নিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল রানা, তারপর হাতে কফির কাপ নিয়ে বেরিয়ে

পাল পাল বারান্দায়, সারাটা দিন কি করবে আজ তাই ভাবছে। প্রথমেই পাপিতার কথা মনে এল। মেয়েটা ওকে একটু চিন্তাতেই ফেলে দিয়েছে। একই প্লেনে সেনেগালে এসেছে ওরা, এর কি কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে? মাদাম স্যানডোরা ওরফে সাদিয়া জেসমিনের বান্ধবী হতে পারে না পাপিতা। ওরলি এয়ারপোর্টে সাদিয়াকে পড়ে যেতে দেখেছে সে, অথচ আতঙ্কিত বা বিমর্ষ হতে দেখা যায়নি তাকে। একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, সেটা স্বাভাবিক। পাপিতা সীন ওয়াটের এজেন্টও হতে পারে না। কার্ল হফার সব খবরই রাখে, তার ধারণা ওয়াটের হাতে কোন সূত্রই নেই, সেনেগালে কাউকে পাঠানো দরকার এ-কথা তার মনেই হবে না।

ওর ওপর নজর রাখার জন্যে কার্ল হফার পাপিতাকে পাঠায়নি তো? একটা সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইল না। কার্ল হফার যাদেরকে দিয়ে কাজ করায় তাদের কয়েকজনকে দেখেছে ও, পাপিতাকে তাদের সাথে এক করে ভাবা যায় না। ধনী লোকের বখে যাওয়া মেয়ে, একঘেয়েমিতে ভুগছে—পাপিতার এই কথাগুলো বিশ্বাস করেছে ও। হফারের কাজ শুধু টাকার লোভেই করতে চাইতে পারে কেউ, কিন্তু পাপিতার টাকার কোন অভাব নেই। তাছাড়া, ওর ওপর নজর রাখার জন্যে কাউকে যদি পাঠাতই হফার, একজন পুরুষকে বেছে নিত সে। হফারের সাথে যদি ও বেঈমানী করে, একটা মেয়ে ওকে ঠেকাবে বা বাধা দেবে, হফার এটা আশা করতে পারে না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, এদের কারও সাথে পাপিতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেটাও মেনে নিতে মন চাইল না। চিন্তিত হবার মত আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে রানা। আজ যখন পাপিতার কামরা থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছিল, তার দৃষ্টিতে গভীর ভালবাসা জ্বলে উঠতে দেখেছে ও।

নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, বোকার মত ওর প্রেমে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটা। ব্যাপারটাকে যদি বেশি দূর গড়াতে দেয়া হয় খামোকা জটিলতাই শুধু বাড়বে।

পাপিতাকে কোথাও খাপে খাপে মেলাতে পারছে না দেখে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপিতাকে বাদ দিয়ে হফারকে নিয়ে পড়ল।

সেনেগালে আজ এটা তার তিন নম্বর সকাল, সন্দেহ নেই প্যারিসের হিলটন হোটেলে অধৈর্য হয়ে উঠেছে হফার। প্যারিসে ফোন করার মধ্যে ঝুঁকি আছে, তারচেয়ে বরং কেব্‌ল্ পাঠানো যেতে পারে। ডাকার পোস্ট অফিস থেকে পাঠালে সেটা হয়তো কেউ ট্রেস করতে পারবে না।

এরপর জেসমিনের বাবার কথা ভাবল রানা। কে জানে এই লোকের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে কিনা। সন্দেহ আছে। এই লোকের সাথে দেখা করলে পরিণতি ভালর চেয়ে খারাপ হাবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু এই একটা ছাড়া আর কি সূত্রই বা তার হাতে আছে?

একেবারে নেই, তা নয়। আদমার কথা মনে পড়ে গেল। রহস্যময় পোলো লোকটার পরিচয় বের করে ফেলতে পারে সে। তার কাছ থেকে কিছু পাবার

আশায় আরও একটা দিন অপেক্ষা করা যেতে পারে, তারপর না হয় রিপোর্ট করা যাবে হফারকে।

বেলা দশটার একটু পর, সৈকতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে রানা, টেলিফোন বেজে উঠল। কে হতে পারে, ভাবতে ভাবতে রিসিভার তুলল ও।

'আপনার ফোন, স্যার,' বলল অপারেটর। 'এক মিনিট ধরুন, প্লীজ।'

কয়েকটা যান্ত্রিক শব্দ হলো, তারপর একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনল রানা। 'মি. হুয়ান? আপনি মি. হুয়ান ফার্নান্দেজ?' গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে অসুবিধে হয় না উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে মেয়েটা।

'বলছি। আদমা?'

ঝর্ণার মত কলকল করে হেসে উঠল আদমা। তারপর বলল, 'বলিনি, লোকটাকে আমি খুঁজে বের করব? খোঁজ পেয়ে গেছি, বুঝলেন? কোথায় থাকে জেনেছি।'

'তুমি আমাদের পর্তুগীজ বন্ধুর কথা বলছ, তাই না?'

'জ্বী, হুজুর!' সাফল্যের আনন্দে ছটফট করছে মেয়েটা। 'কাল রাতে আমার বান্ধবীদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে জানলাম, একজনের বয়ফ্রেন্ড এই পোলো সাহেবকে চেনে। সাইকেলে প্যাডেল মেরে সাতসকালে পৌঁছে গেলাম তার বাড়ি। এইমাত্র ফিরলাম সেখান থেকে। জেনে এসেছি। ওকে আমার পাঁচশো ফ্রাঙ্ক দিতে হয়েছে, মি. জুয়ান।'

'ভাল করেছ। ওটা তুমি পেয়ে যাবে। এখন বলো, কে লোকটা, কোথায় থাকে?'

'আমার সাথে আপনার দেখা হওয়া দরকার, তাতে করে আপনার সময় বেঁচে যাবে,' বলল আদমা। 'অচেনা জায়গা, খামোকা খুঁজে মরবেন, তারচেয়ে আমিই তার কাছে নিয়ে যাব আপনাকে। দেখা হলে আমার পাওনাটাও আপনি মিটিয়ে দিতে পারবেন। কি বলেন?'

'ঠিক আছে, কিন্তু কখন?'

'এখুনি, আপনি যদি আসতে পারেন।'

'তা পারব, কোথায়?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল আদমা, তারপর বলল, 'রেল স্টেশনে চলে আসুন। স্টেশন থেকেই কথা বলছি আমি। তাড়াতাড়ি চলে আসুন, একা একা অপেক্ষা করতে খারাপ লাগে। একটা কথা, সাথে টাকা আনতে যেন ভুল না হয়।'

'তা হবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর ক্লজিট খুলে ভেতর থেকে সুটকেস নামাল। সুটকেসের ফলস বটম খুলে রিভলভারটা বের করল। আরেকটা পকেট থেকে তুলে নিল ছোট আকারের একটা সাইলেন্সার। রিভলভার লোড করা আছে কিনা চেক করল, হোলস্টার পরে তাতে ঢুকিয়ে রাখল সেটা। জ্যাকেট পরে দাঁড়াল আয়নার সামনে, কোটের বাইরেটা সামান্য একটু ফুলে থাকলেও ওকে সশস্ত্র বলে সন্দেহ করবে না কেউ।

মানিব্যাগের অবস্থা দেখে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। দ্রুতপায়ে এগোল এলিভেটরের দিকে।

দুই

গাড়ি পার্ক করে রাস্তা পেরোল লুডলাম, আমেরিকান দূতাবাসের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পথরোধ করে দাঁড়ানো গেটম্যানের সামনে থামল। 'লেফটেন্যান্ট রনি পিটারসনের সাথে দেখা করব,' বলল সে। 'আমার নাম বললেই চিনবে সে। রবার্ট লুডলাম।'

পাঁচ মিনিট পর মস্ত একটা ডেস্কের সামনে হাজির করা হলো লুডলামকে। প্যারিসের মার্কিন দূতাবাসে লেসলি টমাস যে পদে রয়েছে, সেনেগাল দূতাবাসে রনি পিটারসনেরও সেই একই পদ। খুবই শক্ত-সমর্থ চেহারা লেফটেন্যান্টের, ক্লিনশেভড্, ত্রিশের কাছাকাছি বয়স, ঠাণ্ডা চেহারায় সদা-সতর্ক ভাব। ডেস্কের ওধারে শক্ত কাঠের চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে, মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল লুডলামের ভাঁজ খাওয়া কোট, ধুলো মাখা জুতো, বেঁকে থাকা নেকটাই তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

বলল, 'হ্যাঁ, আপনার কথা জানি আমরা। মি. ওয়াট কেব্ল্ পাঠিয়েছেন। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'জানতে চাই, এই নম্বরের গাড়িটা কার, মালিক কে।' বলে লেফটেন্যান্টের দিকে একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল লুডলাম। 'জরুরী। তাড়াতাড়ি জানতে চাই। সাহায্য করা সম্ভব?'

'খুব।' হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল লেফটেন্যান্ট, অপারেটরকে পুলিস হেডকোয়ার্টারের লাইন দিতে বলল। কারও সাথে কথা বলল কয়েক সেকেন্ড, অপরপ্রান্তের কথা শুনতে শুনতে সিগারেট ধরাল, সবশেষে বলল, 'ফাইন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে তাকাল লুডলামের দিকে। 'ওটা একটা ভাড়া করা গাড়ি, পিকক কার এজেন্সি থেকে ভাড়া করা হয়েছে।'

'কে ভাড়া করেছে জানা সম্ভব?'

'সম্ভব। এদের সাথে খাতির আছে আমাদের।' আবার ফোনের রিসিভার তুলে নিল লেফটেন্যান্ট রনি পিটারসন। সামান্য আলাপ করার পর বলল, 'ধন্যবাদ। কি? আরে না! স্রেফ রুটিন।' ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'সুইনডেল নেলসন এক মাসের জন্যে ভাড়া করেছে গাড়িটা। লোকটা ডেনিশ ট্যুরিস্ট। রুফিসকু এলাকার বাইরে, সাজানো একটা ভিলায় উঠেছে।'

'নেলসন…ডেনিশ?'

'হ্যাঁ। অন্তত তার পাসপোর্ট সে-কথাই বলে।'

'সেনেগালে এই আমার প্রথম আসা,' বলল লুডলাম। 'সাজানো ভিলাটা ঠিক কোথায় বলতে পারেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট, দেয়ালে পিন দিয়ে সাঁটা ডাকারের একটা স্কেল ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়াল সে। লুডলামও তার সাথে যোগ দিল।

'এই যে, এখানে,' ম্যাপের গায়ে এক জায়গায় একটা আঙুল রাখল রনি পিটারসন। 'বিশ কিলোমিটারের কম নয়, রুফিসকুর উল্টোদিকে, এই গলি ধরে যেতে হবে।'

নিজের চেয়ারে ফিরে এল লুডলাম। 'সাদিয়া জেসমিন সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেল?'

ঠোঁট ওল্টাল লেফটেন্যান্ট। 'কই! শুধু জানতে পেরেছি টাওয়ার ক্লাবে কাজ করত।'

'সে-তো আমি মি. ওয়াটের কাছ থেকেই জেনেছি,' বলে একটু থামল লুডলাম, তারপর জানতে চাইল, 'ভাল কথা, এই কয়েকদিনের মধ্যে কোন রাশিয়ান এসেছে কিনা বলতে পারেন?'

সিগারেট ধরা হাতটা ওপরে তুলছিল লেফটেন্যান্ট, মাঝপথে স্থির হয়ে গেল সেটা, মাথাটা একদিকে একটু কাত করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। জানতে চাইল, 'আমরা যতদূর জানি—না। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'রাশিয়ানরাও এ ব্যাপারে নাক গলাতে পারে, এই ধারণা থেকে জানতে চাইলাম,' বলল লুডলাম। 'আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। আচ্ছা, জেনি পাপিতা বোধহয় এখনও আপনাদের সাথে দেখা করেনি, তাই না?'

'না। আমরা জানি হোটেল ডি-প্যালেসে উঠেছে সে। কিন্তু এখানে আসেনি।'

'ঠিক আছে, এখন তাহলে চলি। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ,' চেয়ার ছেড়ে বলল লুডলাম। 'দরকার হলে আপনাদের স্ক্র্যাম্বলার ফোন ব্যবহার করতে পারব কি?'

'যখন খুশি।' লুডলামকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল লেফটেন্যান্ট রনি পিটারসন।

রেলস্টেশনে ঢোকার মুখে আদমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। মেদহীন কালো শরীর, সাদা ট্রাউজার আর সাদা কোটে চমৎকার মানিয়েছে। রানাকে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করতে দেখে মুক্তোঝরা হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। হাঁটার ধরনটা ভারি সুন্দর—অনায়াস ভঙ্গিতে লম্বা করে পা ফেলে, পিছনের পা তোলার সময় সামান্য একটু ঝাঁকি খায় শরীর, ফলে অদ্ভুত একটা ছন্দের সৃষ্টি হয়, সেই ছন্দের সাথে তাল রেখে দুই আঙুলে চুটকি বাজায়। গোটা দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে তারুণ্যের মাধুর্যমাখা চঞ্চলতা।

এক হাতে গাড়ির হাতল ধরল সে, মোচড় দিয়ে টানল নিজের দিকে, খোলা দরজা দিয়ে একরকম লাফিয়ে পড়ল ভিতরে। দরজা বন্ধ করে পাশে বসা রানার দিকে ফিরে অকারণে হাসতে লাগল।

'কোন্‌দিকে?' জানতে চাইল রানা।

'গাড়ি ঘুরিয়ে নিন,' বলল আদমা। রানা গাড়ি ঘোরাচ্ছে, জানতে চাইল, 'আনতে ভুল করেননি তো, মি. হুয়ান?'

'কি?' তারপর মনে পড়ল রানার। হেসে ফেলল ও। 'নিয়ে এসেছি। এখুনি নেবে?'

'না, পরে দিলেও চলবে।'

পথ বাতলে বাঁসি উয়েসে নিয়ে এল আদমা। ইতিমধ্যে রানাকে জানিয়েছে সে, তার ভাইয়ের নিজস্ব মোটরবোট আছে, সেটায় চড়েই দ্বীপে যাবে ওরা।

'আমার ভাইকে এক হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে আপনার,' বলল আদমা। 'আপনার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও।'

'ঠিক আছে।' খোলা একটা গেটের ভেতর দিয়ে লাইনবন্দী যানবাহন ধীর গতিতে এগোচ্ছে। সামনে দেখা গেল জেটি।

টিন দিয়ে ছাওয়া একটা জায়গা দেখাল আদমা। 'গাড়িটাকে আমরা ওখানে রেখে যাব।'

গাড়ি চালিয়ে পার্কিং লটে চলে এল রানা, নামল, তালা দিল দরজায়, বাঁ হাতটা আদমার দখলে ছেড়ে দিয়ে খানিক দূর হেঁটে এসে দাঁড়াল পানির ধারে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে ছোট বড় কয়েকটা ফিশিং বোট।

আদমার ভাইয়ের নাম মাহমুদ, বিশ-বাইশ বছর বয়স, আর সব আফ্রিকানদের মত তালগাছের সমান লম্বা না হলেও পাকানো দড়ির মত পেশীবহুল শরীর। ইলেকট্রিক ব্লু-রঙের একটা ঢোলা জোব্বা পরে আছে, চওড়া পায়ের আঙুল ছুঁই ছুঁই করছে সেটা। পথ দেখিয়ে রানাকে একটা মোটর বোটের সামনে নিয়ে এল সে। বোটটাকে দেখে মনে হলো, দ্রুতগতি। প্রথমে চড়ল আদমা, তারপর রানা। স্টার্নে মুখোমুখি বসল ওরা। কেউ যেন চাবি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, হাসি আটকে রাখতে পারছে না আদমা। নোঙর তুলে বোট ছেড়ে দিল মাহমুদ। বোট আর নৌকোর ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে থ্রটল খুলে দিল সে, লাফ দিল বোট, তারপর তীরবেগে ছুটল।

ছোট একটা দ্বীপ। পৌঁছুতে আধঘণ্টাও লাগল না। ফেরি স্টেশনকে এড়িয়ে এসে ঢেউ ঠেকাবার জন্যে তৈরি বাঁধের পাশে বোট ভিড়াল মাহমুদ। বোট থেকে নামার ঠিক আগের মুহূর্তে হাতঘড়ি দেখল রানা, এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। ফেরি স্টীমারটা এখনও বেশ দূরে, ডাকারের দিক থেকে আসছে। রানা যদি জানত ওই ফেরিতে নিকোলাই কারলোভিচ আছে তাহলে তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত ও। কিন্তু মাঝ-দুপুরের রোদ এমনই কড়া—গায়ে ফোস্কা পড়ার মত। রানার নড়াচড়ার মধ্যে অলস একটা ভাব এসে গেল।

'আমার ভাই মাহমুদ এখানে অপেক্ষা করবে,' বলল আদমা। 'আপনার সাথে আমি যাব। বাড়িটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

খানিকদূর এগিয়ে এসে বাঁধ থেকে নামল ওরা, বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে থামল চৌকো নগর-চত্বরে। চারদিকে ঝড়ো কাকের মত বাড়ি-ঘর, গলিগুলো সরু। একপাল ছোট ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরায় থামতে হলো ওদেরকে। সবাই এরা কুচকুচে কালো, কেউ সম্পূর্ণ নিরাবরণ, কারও গায়ে নোংরা শার্ট আছে তো প্যান্ট নেই। একেবারে চুপচাপ, চোখে রাজ্যের কৌতূহল। খপ করে রানার একটা হাত

ধরে ফেলে ভিড় ঠেলে এগোল আদমা, ছেলেপিলেরা পিছু নিল ওদের। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ধমক লাগাল আদমা, ছত্রখান হয়ে গেল ভিড়টা। এরপর বাড়ি-ঘরের ছায়ার নিচ দিয়ে নিরুপদ্রবেই এগোতে পারল ওরা।

সরু গলিটা আগুনের কুণ্ড বললেই হয়। পাঁচ মিনিট হাঁটতেই সারা শরীর ভিজে গেল ঘামে। তারপর হঠাৎ করেই আবার সামনে পড়ল সাগর। দাঁড়িয়ে পড়ল আদমা, হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে, ওই বাড়িটা। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

লাল রঙের ঢালু ছাদ ছাড়া বাড়িটার বিশেষ আর কিছু দেখা যায় না এখান থেকে। সাদা পাঁচিলের ঘের বাড়িটার বাকি অংশ ঢেকে রেখেছে।

ধপ করে একটা মসৃণ পাথরের ওপর বসে হ্যান্ডব্যাগ থেকে লাল সিল্কের একটা রুমাল বের করল আদমা, মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'আমি বাবা এর বেশি যেতে পারব না। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই ঠাঁই নিলাম। ফিরে এসে আমাকে টাকা দেবেন তো?'

'হ্যাঁ,' বলে বাড়িটার দিকে এগোল রানা।

ঢোকার মুখে প্রকাণ্ড একটা কাঠের গেট, লোহার খিল খোলার পর রানা আবিষ্কার করল, তালা দেয়া রয়েছে। পিছিয়ে এল ও, রুমাল দিয়ে মুখ মুছল, তারপর লোহার একটা ঝুলে থাকা চেইন দেখে সেটা ধরে টানল। পাঁচিল ঘেরা বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এল কলিংবেলের আওয়াজ।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর গেটের গায়ে ছোট জানালাটা খুলে গেল, ভেতর থেকে উঁকি দিল কালো একটা মুখ। কালো-সাদা রঙের কৌতূহলী এক জোড়া চোখ খুঁটিয়ে দেখল রানাকে। বিদেশী বুঝতে পেরে ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

'আমি মি. পোলোর সাথে দেখা করতে এসেছি,' বলল রানা।

'উনি বাড়িতে নেই।'

'খুব জরুরী দরকার,' বলল রানা। 'কখন ফিরবেন?'

'ঠিক নেই। তবে সন্ধে ছ'টার দিকে একবার ফিরতেও পারেন।'

'তাহলে এই কথাগুলো বলতে হবে তাকে,' বলল রানা। 'আমি সাড়ে ছ'টার সময় আবার আসব। আমি সীন ওয়াটের একজন বন্ধু। মনে থাকবে তো?'

মাথা দোলাল লোকটা, তারপর বন্ধ করে দিল জানালা।

ফিরে এল রানা। ঝট করে উঠে দাঁড়াল আদমা, চেহারায় উদ্বেগ। জানতে চাইল, 'আপনি ভদ্রলোকের সাথে দেখা করলেন না কেন? উনি যে এই বাড়িতে থাকেন আমি জানি।'

'থাকেন, কিন্তু এখন নেই,' বলল রানা। 'আজ আবার সন্ধের সময় আসতে হবে আমাকে।'

'তাহলে আমার টাকার কি হবে?' অসহায় দেখাল আদমাকে। 'আপনি হয়তো ভাবছেন ভদ্রলোকের সাথে আপনার দেখা না হলে আমি পাওনা হই না…'

'তা ভাবছি না,' হাসি চেপে বলল রানা। মানিব্যাগ বের করে পাওনার চেয়ে

এক হাজার ফ্রাঙ্ক বেশি দিল ও। 'খুশি?'

নিজের ব্যাগে টাকা ভরার সময় আবার বাঁধনহারা হাসিতে মুখর হয়ে উঠল আদমা। তারপর বলল, 'আপনি যদি নিজেকে ট্যুরিস্ট বলে মনে করতে পারেন, আমি আপনার গাইড হতে পারি। দ্বীপটা ঘুরেফিরে দেখতে চান? ভারি ইন্টারেস্টিং জায়গা। আশ্চর্য একটা মিউজিয়াম আছে এখানে, স্লেভ হাউস আছে। আপনার খুব ভাল লাগবে।'

'কিন্তু এখন আমার সবচেয়ে ভাল লাগবে,' বলল রানা, 'পেটে যদি কিছু দানাপানি দিতে পারি। এখানে ভাল কোন রেস্তোরাঁ আছে কিনা জানো?'

রানার হাত ধরল আদমা। 'চমৎকার একটা হোটেল আছে। আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

'তোমার ভাই?'

'আপনি আমার সাথে এসেছেন, বোট নিয়ে সারাদিন বসে থাকতে হলেও ও থাকবে।'

আদমার সাথে হাঁটা ধরে ভাবল রানা, চলে গিয়ে আবার ফিরে আসার চেয়ে দ্বীপটা ঘুরেফিরে দেখে সময়টা কাটিয়ে দিলে মন্দ হয় না। সরু একটা গলির ভেতর ঢুকল ওরা। কোন কারণ নেই, তবু পিছনদিকে একবার তাকাবার একটা ঝোঁক অনুভব করল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে। গলির ফেলে আসা মুখের সামনে দিয়ে একজন লোককে ধীরস্থির ভঙ্গিতে চলে যেতে দেখল ও। লোকটা পোলোর বাড়ির দিকেই যাচ্ছে।

দেখেই লোকটাকে রাশিয়ান বলে চিনতে পারল রানা। সে যে নিকোলাই কারলোভিচ, সেটা ওর জানার কথা নয়।

'দাঁড়াও এখানে,' চাপা গলায় বলল রানা, নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত ফিরে এল গলির মুখে। শরীরটা আড়ালে রেখে উঁকি দিয়ে তাকাল ও।

নিকোলাইকে পোলোর বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। উজ্জ্বল লাল মুখ ঘামে ভিজে আছে। লোহার চেইন ধরে টানল সে।

নিকোলাইয়ের ওপর চোখ রেখে রানা ভাবল, আমার সন্দেহই তাহলে ঠিক। এই ব্যাপারটার সাথে রাশিয়ানরা জড়িয়ে আছে। উত্তেজনা বোধ করল ও।

গেটের ছোট জানালা খুলে গেল, বাইরে উঁকি দিল গেটকীপার। ওদের মধ্যে কি কথা হলো আন্দাজ করতে পারল রানা। পিছিয়ে এল নিকোলাই, ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল জানালা। তার চেহারায় হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠেছে। আবার সেই ধীরস্থির ভঙ্গিতে গলির মুখের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল সে।

চারদিকে তাকাল রানা। গা ঢাকা দেয়ার জন্যে একটা জায়গা দরকার। কাছাকাছি একটা দরজা রয়েছে, খোলা। ভেতরে আবর্জনা ভরা উঠান। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে উঠানে চলে এল রানা, তারপর খোলা দরজার কবাটের আড়ালে লুকাল। কবাটের ফাটলে চোখ রেখে গলির মুখটা দেখার চেষ্টা করল ও। মাত্র একটুখানি দেখা গেল।

গলির মুখে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল নিকোলাই। রুমাল দিয়ে মুখ মোছার ফাঁকে

প্রথমে ডানদিকে, তারপর বাঁ দিকে তাকাল। নোংরা জোব্বা পরা একজন লোক প্রায় ছুটে এসে ব্রেক কষল নিকোলাইয়ের সামনে। লোকটার মাথায় কালো একটা কাপড় জড়ানো, এককালে সেটার রঙ ছিল সাদা। ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় নিকোলাই বলল, 'শালা বাড়িতে নেই। সন্ধের আগে ফিরবে না। তোমার লোকজন কোথায়?'

ঘাড়ের ওপর মাথাটা চারদিকে একবার ঘোরাল লোকটা, একগাল হেসে বলল, 'আছে।'

'বাড়িটাকে ঘিরে ফেলো,' নির্দেশ দিল নিকোলাই। 'ব্যাটা না ফেরা পর্যন্ত এই জায়গা ছেড়ে নড়বে না কেউ। খবরদার, কারও চোখে পড়ে যেয়ো না।'

'আপনি, মশিয়ে?'

'হোটেলে যাচ্ছি। বানচোত ফিরলেই তোমার একজন লোককে দিয়ে খবর পাঠাবে হোটেলে। ঠিক আছে?'

সবিনয়ে বো করল লোকটা।

'কোন্‌দিক দিয়ে গেলে কাছে হবে হোটেলটা?' জানতে চাইল নিকোলাই।

রানার অপেক্ষায় আদমা যেখানে অপেক্ষা করছে, হাত তুলে সেদিকটা দেখাল জোব্বাধারী।

রানার দৃষ্টিসীমা থেকে সরে গেল নিকোলাই। খোলা দরজার পাশ ঘেঁষে এগোল সে, তার পায়ের স্পষ্ট আওয়াজ পেল রানা। আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যাবার পর সাবধানে দরজার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে গলিতে তাকাল ও।

নিকোলাইয়ের ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও। আদমা তার সেই আগের জায়গাতেই অসীম ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে। একটা দরজার পাশে ছোট বারান্দা, তাতে বসে ড্রেনের ওপর পা দোলাচ্ছে সে। রানাকে গলিতে বেরিয়ে আসতে দেখে লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল।

'হোটেলে নিয়ে চলো আমাকে,' কাছে এসে বলল রানা।

সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার একটা হাত ধরল আদমা। 'যো হুকুম।'

প্রচণ্ড গরম, পা চলতে চায় না। দশমিনিট হাঁটার পর হোটেলটাকে দেখতে পাওয়া গেল, পিছনে উঁকি দিচ্ছে সাগর।

'এখন তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ডাকারে ফিরে যেতে পারো, আদমা,' বলল রানা। 'এই নাও, তোমার ভাইয়ের টাকা।'

ব্যাগে টাকা ভরে আদমা বলল, 'আপনি যদি চান আমার ভাই আপনার জন্যে সেই সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

'না, তার দরকার নেই। ওকে নিয়ে ফিরে যাও তুমি। আর মনে রেখো, আমার কথা কাউকে কিছু বলবে না তোমরা।'

'আপনার সাথে আমার আর দেখা হবে না,' চেহারা ম্লান করে বলল আদমা। 'নাকি হবে?'

'বোধহয় না,' বলল রানা। 'ঠিক বলতে পারছি না।' আদমাকে আর কোন

প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে হন হন করে হোটেলের দিকে এগোল ও।

নিজের জায়গায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল আদমা, তারপর আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের পথ ধরল। সামান্য এক-আধটু কাজের বিনিময়ে চাইলেই টাকা দেয়, এইরকম লোক আগে কখনও দেখেনি সে। এই লোকের সঙ্গ ত্যাগ করতে খারাপই লাগল তার।

হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে রানা ভাবল, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে না তো? হোটেলে রাশিয়ান লোকটা দেখবে ওকে। তারপর ভাবল, দেখে দেখুক। সৈকতে আরও অনেক বিদেশী রয়েছে, হোটেলের বাইরে টেরেসগুলোতেও কয়েকজনকে দেখা গেল। আরেকজন বিদেশীকে দেখে অস্থির হবার কোন কারণ নেই লোকটার।

লম্বা টেরেসে উঠে খালি একটা টেবিল পেল রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে রাশিয়ানটাকে কোথাও দেখতে পেল না। তারপর চোখ পড়ল একটা খোলা জানালার দিকে, জানালাপথে ছোট একটা বার দেখা গেল, একা একটা টেবিল দখল করে বসে রয়েছে রাশিয়ান লোকটা। টেবিলের ওপর স্কচের একটা বোতল, পাশে অর্ধেক খালি গ্লাস।

উর্দি পরা ওয়েটার এসে দাঁড়াল সামনে। বিয়ারের অর্ডার দিল রানা। মিনিট কয়েক পরে আবার লোকটা ফিরে আসতে রানা জানতে চাইল, 'লাঞ্চ তৈরি হতে কত দেরি আর?'

'হয়ে গেছে, স্যার,' বলল ওয়েটার। 'ওপরতলায়।'

'আসছি,' বলে ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল রানা। ইতিমধ্যে গ্লাসটা খালি করে ফেলেছে নিকোলাই, এখন আবার ভরছে সেটা। আঙুল নেড়ে বারম্যানকে ডাকল সে। কিছু কথা হলো ওদের মধ্যে। তারপর আবার গলা ভেজানোয় মন দিল সে।

বিয়ার শেষ করে টেবিল ছাড়ল রানা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ইংরেজী অক্ষর এল আকারের রেস্তোরাঁয়। দেশী লোক এখানে একজনকেও দেখা গেল না, সবাই বিদেশী ট্যুরিস্ট। ওয়েটার ওকে পথ দেখিয়ে একটা টেবিলের সামনে নিয়ে এল, এখান থেকে রেস্তোরাঁর দুটো বাহুই, শেষ মাথা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

লাঞ্চের অর্ডার দিল রানা। মুরগীর রোস্ট, সালাদ। সাথে ছোট আকারের রুটি। খেতে শুরু করেছে, এমনসময় রেস্তোরাঁয় ঢুকল নিকোলাই। ঢোকার মুখে একটা টেবিলে বসল সে। সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল একবার। ওর দিকে লোকটা তাকাবার আগেই চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। খানিক পর আবার যখন তার দিকে তাকাল ও, নিকোলাই তখন মেন্যু পরীক্ষা করছে।

এর এক মিনিট পরই দু'জন লোক ঢুকল রেস্তোরাঁয়। প্রথম লোকটা রোগা-পাতলা, মাথা জোড়া টাক। সাথে একটা ব্রিফকেস। ওয়েটারের পিছু পিছু কোণের একটা টেবিলের দিকে হাঁটার সময় চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলল সে।

রানার মনোযোগ কেড়ে নিল দ্বিতীয় লোকটা। বেশ লম্বা, প্রায় ওর সমান। মেদ আর মাংস নিয়ে মোটাসোটা শরীর। মুখটা গোল। চওড়া কালো গোঁফ জোড়া

যত্ন করে ছাঁটা। চোখে গাঢ় রঙের গ্লাস। লোকটার চেহারার সাথে মিশরের প্রাক্তন বাদশা ফারুকের যথেষ্ট মিল আছে। তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে চকচক করছে বড় একটা সোনার সিগনেট রিঙ।

ওয়েটারের সাথে রানার দিকেই এগিয়ে আসছে ওরা। কিভাবে যেন বুঝতে পারল ও, এই লম্বা-চওড়া লোকটাই মি. পোলো।

তিন

ফেরি স্টেশন থেকে সরে এসে বাঁধের গা ঘেঁষে লম্বালম্বি ভাবে থামল ফেরি স্টীমার। রঙচঙে পোশাক পরা আফ্রিকানরা লাইন ধরে উঠতে শুরু করল।

রেস্তোরাঁর জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা। লাঞ্চ শেষ করেছে ও, টেবিলে ওর সামনে এইমাত্র ধূমায়িত কফি দিয়ে গেছে ওয়েটার। রাশিয়ান লোকটা চলে গেছে। যাবার আগে ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করেছিল, বারো নম্বর কামরা কোন্‌দিকে? রানা বুঝে নিয়েছে, ভরপেট খেয়ে একটা ঘুম দেবার তালে আছে লোকটা।

সরাসরি না তাকালেও পোলো আর তার সঙ্গীর ওপর নজর রাখছে রানা। মোটাসোটা পর্তুগীজ একাই দশজনের খাবার সাবাড় করেছে। সঙ্গীর সাথে কথা হচ্ছে তার, আওয়াজ পেলেও দু'একটা ছাড়া শব্দগুলো ধরতে পারেনি রানা। খাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা দু'জনেই এখন চুরুট ফুঁকছে, টেবিলে ওদের সামনে ব্র্যান্ডি আর কফি দিয়ে গেছে ওয়েটার।

হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠল রানার। আগের চেয়ে উঁচু গলায় কথা বলছে ওরা।

'ওই যে বোট,' বলল পোলো। 'প্যাসেঞ্জার নেবার জন্যে তৈরি হলো।'

'ছাড়বে কখন?' জানতে চাইল সঙ্গী।

'দেরি আছে,' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল পোলো। 'দুটোর আগে নয়।'

'আমার সাথে যাবেন, তাতে আপনার সময়ের টান পড়বে না তো, মি. পোলো?' জানতে চাইল সঙ্গী। 'আপনি না গেলেও আমি ম্যানেজ করে নিতে পারব...'

থলথলে হাত নেড়ে সঙ্গীকে থামিয়ে দিল পোলো। 'তা হয় না। কাজটা তো আপনার একার নয়। সময় আছে, আজ বিকেলে করার মত কিছু নেই আমার।'

কফি শেষ করে ওয়েটারকে ডাকল রানা। বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ও। আগুনের বৃষ্টি মাথায় করে এগোল স্টীমারের দিকে।

একবার যখন পেয়েছে পোলোকে, তাকে আর চোখের আড়াল করতে রাজি নয় রানা। সঙ্গী বিদায় না হওয়া পর্যন্ত লোকটাকে অনুসরণ করবে বলে ঠিক করেছে ও। তারপর কথা বলার জন্যে সামনে যাবে।

টিকেট কিনে স্টীমারে চড়ল রানা। জায়গা বেছে বসল, তাকাবে পৌঁছুলে

ভাড়া গাড়ি যাতে নেমে যেতে পারে।

স্টীমার রওনা হবার মিনিট পাঁচেক আগে পোলো আর তার সঙ্গীকে দেখা গেল, বালির ওপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে আসছে। এখনও কথা বলছে পোলো, মাথা ঝাঁকিয়ে বার বার শুধু সায় দিচ্ছে সঙ্গী লোকটা। কথা বলার সময় মাঝে মধ্যে এক হাত তুলে নাড়ছে পোলো, রোদ লেগে ঝিক করে উঠছে আঙটি।

স্টীমারে চড়ল ওরা। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় দু'জনেই রানার চেয়ারের সাথে একটু করে ঘষা খেলো। এগিয়ে গিয়ে শেডের নিচে বসল ওরা। নজরে রাখার জন্যে চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে ওদের দিকে মুখ করে বসল রানা।

বেশ দূরের পথ ডাকার, সময়টা চিন্তা-ভাবনার কাজে লাগাল রানা। সবচেয়ে বেশি যেটা উতলা করে তুলল ওকে, ও যে সীন ওয়াটের কাছ থেকে এসেছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে পোলোকে দেবার মত কিছু নেই ওর। নিজের পরিচয় সম্পর্কে লোকটাকে নিঃসন্দেহ করতে না পারলে প্যাকার কোথায় লুকিয়ে আছে সে-তথ্য তার কাছ থেকে আদায় করা সহজ হবে না। রাশিয়ানদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে পোলোকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে ও। কিন্তু তাতে কতটুকু কাজ হবে বলা কঠিন।

জেটিতে স্টীমার ভিড়তেই সবার আগে নেমে পড়ল রানা। পিছু পিছু আসছে রঙচঙে পোশাক পরা হাসিখুশি একদল আফ্রিকান যুবক-যুবতী। চট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখে নিল ও। ভিড়ের অনেকটা পিছনে পড়ে আছে পোলো।

দ্রুতপায়ে পার্কিং লটে রেখে যাওয়া নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল, ভেতরে আটকে থাকা বাতাস গরম আঁচের মত লাগল চোখে মুখে। জানালা খুলে গাড়িতে স্টার্ট দিল ও।

একটু পরই পোলো আর তার সঙ্গীকে দেখা গেল, কথা বলতে বলতে কালো একটা বুইকের দিকে এগোচ্ছে। আফ্রিকান শোফার দরজা খুলে ধরতে গাড়িতে চড়ল ওরা।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেল বুইক, গাড়ি নিয়ে সেটাকে অনুসরণ করল রানা। পাঁচ মিনিট পর যানবাহনের ভিড় থেকে নাক বের করে রাস্তার একধারে সরে এসে বুইক থামল কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংকের সামনে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানার গাড়ি, ড্রাইভিং মিররে চোখ রেখে ওদের ওপর নজর রাখল রানা। গাড়ি থেকে নেমে ব্যাংকে ঢুকতে দেখল ওদেরকে।

খানিকটা জায়গা খালি করে সামনের পার্কিং বে থেকে বেরিয়ে গেল একটা মার্সিডিজ, গাড়ি নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে দিল ও। এখান থেকে ব্যাংকে ঢোকার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। গাড়ির মাথার ওপর কোন আচ্ছাদন নেই, কিন্তু ওদের ওপর নজর রাখার জন্যে অপেক্ষা করতে হলে এই জায়গা ছেড়ে নড়া চলে না। গাড়ি চালু থাকায় বাতাস ঢুকছিল, এখন তাও নেই। দেখতে দেখতে গনগনে তন্দুর হয়ে উঠল গাড়ির ভেতরটা। ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা।

আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে বুইক। দশ মিনিট পর গরম অসহ্য হয়ে

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো রানা, কয়েক পা এগিয়ে আশ্রয় নিল ব্যাংকের সামনের একটা খিলানের নিচে। চারদিকে আগুন ঝরা রোদ নিয়ে ছোট্ট একটা ছায়ায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকাটা মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। রোদ মাথায় করে রাস্তার ওপার থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে এল রানা। কাগজ খুলে মেলে ধরল সামনে, কিন্তু চোখ পড়ে আছে ব্যাংকের দিকে।

অন্য কোনদিকে খেয়াল ছিল না রানার, দেখতেই পেল না পাপিতা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তার গলার আওয়াজ শুনে রীতিমত চমকে উঠল ও।

'কি আশ্চর্য!' রানার একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাপিতা। 'তুমি! এখানে কি করছ?'

সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে চোখ পিট পিট করে তাকাল রানা। 'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন! তুমি এখানে কি করছ?' মুখে হাসি টেনে হাতের কাগজ ভাঁজ করতে শুরু করল ও। চট করে ব্যাংকের দিকে তাকাল একবার। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, যাই ঘটুক না কেন, পোলোকে হারানো চলবে না।

'হোটেলের বাসে করে এসেছি,' বলল পাপিতা। 'আমার যা কাজ, মার্কেটিং করছি। তুমি? মনে হচ্ছে কারও জন্যে অপেক্ষা করছ?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ।' হাত তুলে ব্যাংকের গেটটা দেখাল। 'আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু ভেতরে ঢুকেছে, ওর সাথে কথা বলব বলে দাঁড়িয়ে আছি।'

পাপিতার চেহারায় হতাশার ছায়া পড়ল। 'খুব জরুরী বুঝি?'

'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে জবাব দিল রানা। 'খুব।'

'আমি একটা বোকা,' মৃদু কণ্ঠে বলল পাপিতা। 'তোমাকে দেখেই গাড়ি করে বেড়াবার প্ল্যান করে ফেলেছি। তোমার যে কাজ থাকতে পারে সে-কথা একবারও মনে হয়নি।'

'দুঃখিত। এই লোকের সাথে কথা না বললেই নয়,' চেহারায় কৃত্রিম বিষাদ ফুটিয়ে তুলল রানা। 'যাকে বলে ব্যবসা, বোঝোই তো।'

চোখ ফিরিয়ে নিল পাপিতা। হঠাৎ করে সন্দেহে ছেয়ে গেল তার মন। কে এই লোক ব্যাংকে ঢুকেছে? সেই লোকটা, যে ওয়েন প্যাকার কোথায় লুকিয়ে আছে জানে? নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে এই গরমে আর কার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা?

'দুঃখ প্রকাশ করার দরকার নেই,' বলল পাপিতা। রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সে। 'কি কিনেছি দেখবে?' ব্যাগ খুলে খুদে একটা পুতুল বের করল সে, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। 'দোকানের মালিক বলল...।'

'আমাকে মাফ করতে হবে, পাপিতা,' দ্রুত বলল রানা। পোলোকে দেখতে পেয়েছে ও, ব্যাংক থেকে একা বেরিয়ে আসছে। 'আমার লোক এসে গেছে। রাতে তোমার সাথে দেখা করব হোটেলে, কেমন?'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে পোলোকে দেখল পাপিতা, ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 'ঠিক আছে, কি আর করা,' বলল সে। 'যাও, তোমাকে আর দেরি

করিয়ে দেব না। রাতে আমার সাথে দেখা করার কথা মনে থাকবে তো?'

'থাকবে,' বলে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে পাপিতার কাঁধ আলতো হাতে একবার চাপড়ে দিল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই পিছু নিল পোলোর।

পোলোর কাছ থেকে রানা যখন আর মাত্র কয়েক মিটার পিছনে, এই সময় হাঁটার গতি মন্থর করল ও। একটা বাঁক ঘুরল পোলো, তার পিছু পিছু রু কারনটে চলে এল ও।

রানা অদৃশ্য হয়ে যেতেও দু'সেকেন্ড ইতস্তত করল পাপিতা। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল রু কারনটের দিকে। গরম, শুকনো একটা হাত খপ করে ওর কব্জি চেপে ধরল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে। অজানা ভয়ে আঁতকে উঠে ঘাড় ফেরাল পাপিতা, বুলিনের প্রকাণ্ড শরীর ওর ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার।

'কেটে পড়ো, এদিকটা আমিই দেখছি,' কর্কশ সুরে বলল বুলিন, পাপিতাকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল পাপিতা। বুকের ভেতরটা এখনও ধড়াস ধড়াস করছে। মোটা-সোটা লোকটা যে পোলো, এখন আর সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। বুঝল, রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। নির্জন কোন জায়গায় ওদেরকে পেলে কি করবে বুলিন, কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না। শিউরে উঠল সে।

এই প্রথম উপলব্ধি করল পাপিতা, এই অচেনা মাসুদ রানাকে কতটা গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে সে। আজ সকালে তার কাছ থেকে চলে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত সারাটা দিন ঘুরেফিরে শুধু ওর কথাই ভেবেছে। যাকে বলে প্রেম, তেমন কিছুর মধ্যে এর আগে কখনও পড়েনি সে। কোন কোন পুরুষ তাকে আকৃষ্ট করেছে বটে, কিন্তু তাদের ভাল-মন্দের কথা ভেবে মুহূর্তের জন্যেও উতলা হতে পারেনি সে। রানার জন্যে সব করতে পারবে সে, স-অ-ব। এই কথাটাই বারবার আজ মনে হয়েছে তার, কোন কারণ ছাড়াই। এমনটি আর কারও বেলায় মনে হয়নি কখনও। রানাই তার জীবনে প্রথম পুরুষ যার কথা যত ঘন ঘনই মনে পড়ুক, মনে পড়ার সাথে সাথে বুকের রক্ত ছলকে উঠছে, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে অদ্ভুত এক পুলকে।

রানাকে হারাতে হতে পারে এই সম্ভাবনা মনে উঁকি দিলেই অসুস্থ বোধ করছে ও। উপলব্ধি করছে, ওয়েন প্যাকারকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে রানার বিরুদ্ধে কাজ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। পরিণতি যাই হোক না কেন, এই মুহূর্তে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল সে, দল বদল করে রানার পক্ষেই থাকতে হবে তাকে।

রানাকে বলা দরকার, ওর সম্পর্কে কিছুই অজানা নেই বুলিনের।

এতে করে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল পাপিতা। কিন্তু কোনরকম দ্বিধা বা ভয় অনুভব করল না সে। রানা যদি তাকে নেয়, যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি আছে সে।

বুলিনের পিছু নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল পাপিতা।

ক কারনেট ধরে খানিক দূর এগোবার পর বুলিনের সোনালি চুল মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল পাপিতা। ফুটপাথে অনেক লোকের ভিড়, তাদের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। বিস্মিত কৌতুকের চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল পথচারী আফ্রিকানরা।

ধীরেসুস্থে হাঁটছে চেস্টন পোলো, হাবভাবে কোন রকম ব্যস্ততা নেই। তার পিছনে লেগে আছে রানা। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল পোলো, গাড়ির মিছিলে ক্ষণিক ছেদ পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানাও।

হাতঘড়ি দেখল পোলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে প্রথম সুযোগেই দ্রুতপায়ে রাস্তা পেরোল। সামনের কোণে একটা কাফে, সোজা এগিয়ে গেল সেদিকে।

কাফেতে ঢুকে বারম্যানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল পোলো, হেঁটে গিয়ে বড় ঘরের শেষ মাথায় একটা খালি টেবিলে বসল।

রাস্তা পেরিয়ে এসে কাফের সামনে থামল রানা। ভেতরে তাকিয়ে দেখল, একজন ওয়েটারের সাথে কথা বলছে পোলো। তারপর লেদার কেস খুলে একটা সিগার বের করল সে।

রাস্তার ওপার থেকে কাফের সামনে রানাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল বুলিন, একটা দোকানের জানালায় সাজানো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দিকে মনোযোগী হয়ে উঠল সে। আড়চোখে লক্ষ্য করছে রানার গতিবিধি।

রাস্তার আরও পিছন থেকে বুলিনের ওপর চোখ রেখে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে পাপিতা।

পোলোর টেবিলে বিয়ার পরিবেশন করছে ওয়েটার, কাফেতে ঢুকল রানা। কামরার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে এগোল ও, থামল গিয়ে পোলোর পাশের খালি টেবিলের সামনে। মুখ তুলে তাকাল পোলো, তারপর মন দিল বিয়ারে।

চেয়ারে বসে ইঙ্গিতে ওয়েটারকে ডাকল রানা, বিয়ারের অর্ডার দিল। ওয়েটার চলে যেতে আড়চোখে পোলোর দিকে তাকাল ও। ওর উপস্থিতি নিয়ে পোলো মাথা ঘামাচ্ছে বলে মনে হলো না। বিয়ার দিয়ে চলে গেল ওয়েটার। চেয়ার বদলে পোলোর কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আজ সকালে আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনার সাথে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে।'

চুরুটে টান দিল পোলো, মুখের ভেতর থেকে ধীর গতিতে বেরিয়ে আসতে দিল একরাশ ধোঁয়া। অলস ভঙ্গিতে মাথাটা ফেরাল সে। গাঢ় রঙের চশমার আড়াল থেকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল রানাকে। শান্ত, বড়সড় মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না।

'তাই?' চাপা গলায় বলল পোলো। প্রশ্নটা কঠিন এবং ঝাঁঝাল শোনাল রানার কানে।

৲

'আপনার সাথে দেখা করার জন্যে মি. সীন ওয়াট পাঠিয়েছে আমাকে,' বলল রানা।

'সীন ওয়াট?' এবারও পোলোর চেহারায় ভাবান্তর ঘটল না। 'এই নাম আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আপনি…মি…মি…?'

'মাসুদ রানা।'

বিয়ারের গ্লাস চোখের সামনে তুলল পোলো, খুদে বুদ্বুদগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে। 'এই নামও আগে কখনও শুনিনি,' বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'কি বিষয়ে আপনি আমার সাথে কথা বলতে চান, মি. রানা?'

চারদিকে তাকাল রানা। কাফের অর্ধেকটাই খালি। কাছেপিঠে এমন কেউ নেই যে ওদের কথা শুনতে পাবে। তবু গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বলল ও, 'বিষয়—ওয়েন প্যাকার।'

কালো ভুরু জোড়া কপালের ওপর সামান্য একটু তুলল পোলো। 'হ্যাঁ, এটা একটা পরিচিত নাম বটে। কিন্তু, কি আশ্চর্য! সে কি আজকের কথা! তা বিশ-পঁচিশ বছর তো হবেই, তখন ওই নামের এক লোক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বটে।'

'তারমানে কি এই যে সেই ভদ্রলোক এখন আর আপনার বন্ধু নন?'

'পঁচিশ বছর, মি. রানা, মাইন্ড ইট। সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই বদলে যায়। বন্ধুত্ব জিনিসটাও তো আর চিরস্থায়ী নয়।' একদিকের ভারী একটা কাঁধ সামান্য একটু তুলল সে। 'তবু বলতে পারি, আবার যদি প্যাকারের সাথে দেখা হত, খুশি হতাম। যতদূর মনে পড়ে, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল তার।'

'গত দু'হপ্তার মধ্যে ওয়েন প্যাকারের সাথে আপনার দেখা হয়েছে,' বলল রানা। 'সাদিয়া জেসমিনের কাছ থেকে জেনেছি আমি।'

'জেসমিন…আরেকটা পরিচিত নাম,' বলল পোলো, চুমুক দিল গ্লাসে। 'তার সাথে আপনার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মি. ওয়াটের অনুরোধে তার সাথে দেখা করি আমি,' বলল রানা। 'জেসমিন তার তথ্যের বিনিময়ে আমার কাছ থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার নেয়। কিন্তু টাকাটা সে ভোগ করতে পারেনি।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না পোলো। তারপর মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'ভোগ করতে পারেনি? কারণটা বলবেন, মি. রানা?'

'ওরলি এয়ারপোর্টে তাকে বাধা দেয়া হয়,' বলল রানা। 'ডাকার ফ্লাইট ধরতে যাচ্ছিল সে। কার্ল হফারের ভাড়াটে লোক তাকে গুলি করে।'

পোলোর হাতে ধরা গ্লাসের ভেতর সামান্য একটু লাফিয়ে উঠল বিয়ার। 'সে কি মারা গেছে?' খসখসে, বেসুরো শোনাল গলার আওয়াজ।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'একই প্লেনে আসার কথা ছিল আমাদের। আমি একা চলে আসি।'

পোলোর ভিজে জুলফি থেকে ঘামের একটা ধারা গড়িয়ে ইঞ্চিখানেক নিচে নামল। ভাঁজ করা রুমাল বের করে ঘামের ওপর চেপে ধরল সে। 'কার্ল হফার…কে সে?'

'কুখ্যাত এক লোক। টাকার কুমীর। সে-ও ওয়েন প্যাকারের খোঁজ চায়।'

'কিন্তু জেসমিনকে মেরে ফেলল কেন?'

সাবধান, নিজেকে সতর্ক করে দিল রানা। ওয়াট নয়, হফারের নির্দেশে এখানে এসেছে ও এ-কথা পোলো যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। 'জেসমিনকে দিয়ে তার কোন স্বার্থ উদ্ধার হত না, তাই,' বলল ও। 'মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে জেসমিনের কাছ থেকে আপনার নাম জেনে নিয়েছে সে।'

'এই কুখ্যাত হফার তাহলে আমাকেও খুঁজছে?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল পোলো।

'হ্যাঁ।'

কালো রঙের সানগ্লাস জোড়া রানার দিকে তাক করা। পোলো জানতে চাইল, 'এত কথা আপনি জানলেন কিভাবে, মি. রানা?'

'মি. ওয়াট জানেন না এমন বিষয় নেই বললেই চলে। তাঁর কাছ থেকে জেনেছি আমি।'

কাফের ভেতর বসে কথা বলছে ওরা, ওদিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনস্থির করার জন্যে নিজের সাথে যুদ্ধ করছে পাপিতা। রানাকে বিপদের মুখ থেকে সরিয়ে আনতে হবে, এই মুহূর্তে এটাই তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। কিভাবে সেটা সম্ভব, ভাবতে গিয়ে কোন কূল-কিনারা খুঁজে পেল না সে। তারপর হঠাৎ করেই সমাধানটা দেখতে পেল। ফুটপাথে বুলিন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে আরও দূরে সরে এল সে, বাঁদিকে বাঁক নিল, আরও কয়েক পা এগিয়ে চট করে ঢুকে পড়ল ছোট একটা কাফে বার-এ। সোজা বারম্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। জানতে চাইল, 'আপনাদের ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?'

বিয়ারের গ্লাসে শেষ একটা চুমুক দিয়ে রানার দিকে মুখ তুলল পোলো। বলল, 'আশ্চর্য সব কথা বলছেন আপনি, মি. রানা। এ-সবের মধ্যে অদ্ভুত একটা রহস্যের গন্ধও আছে। আপনি আমার কাছ থেকে কি আশা করেন তাই বলুন।'

ধৈর্য হারাতে শুরু করল রানা। 'জেসমিনের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে একজন এজেন্টকে দায়িত্ব দেন মি. ওয়াট। এই এজেন্ট কাজটা আমাকে দেয়। তারপর কার্ল হফার তাকে ধরে ফেলে। আমি তার লাশ দেখেছি। মেরে ফেলার আগে তার ওপর টরচার করা হয়।'

চেয়ারে হেলান দিল পোলো। 'আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না,' বলল সে। 'কি আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন আপনি?'

হঠাৎ একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল রানা। বার কাউন্টারের কোণে পড়ে থাকা টেলিফোনটা বাজতে শুরু করেছে। বারম্যানকে রিসিভার তুলে নিতে দেখল ও। অপরপ্রান্তের কথা শুনে ভুরু-কুঁচকে উঠল লোকটার। তারপর কাফের চারদিকে তাকাল। রানার সাথে চোখাচোখি হতে ইশারা করল সে।

'এক মিনিট,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রানা, দ্রুত এগিয়ে এসে বারম্যানের সামনে দাঁড়াল।

'আপনি মি. হুয়ান ফার্নান্দেজ, স্যার?' জানতে চাইল বারম্যান। মাথা ঝাঁকাল

রানা। 'আপনার ফোন।'

বারম্যানের হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?' আশ্চর্য হয়ে গেছে ও, এখানে ওকে কে ফোন করতে পারে? 'হুয়ান ফার্নান্দেজ বলছি।'

অপরপ্রান্ত থেকে যানবাহনের আওয়াজ ভেসে আসছে, পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। তারপর কানে ঢুকল একটা মেয়েলি কণ্ঠ। চাপা গলা, সম্ভবত রিসিভারে রুমাল জড়িয়ে নিয়েছে। 'একজন রাশিয়ান আপনাকে অনুসরণ করছে,' বলল মেয়েটা। 'মাথায় সোনালি চুল। আপনার কাফের বাইরেই অপেক্ষা করছে সে।' তারপরই বিছিন্ন হয়ে গেল লাইন।

রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রেখে ওখানে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তাকিয়ে আছে রোদ ঝলসানো রাস্তার দিকে। লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলে কি হবে, পাপিতার গলা চিনতে পেরেছে ও। কিন্তু বিশ্বাস করতে গিয়ে হোঁচট খেতে হলো। ক্ষীণ একটু সন্দেহ হয়েছিল বটে, এসবের সঙ্গে পাপিতার একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। সত্যিই তাহলে সম্পর্ক আছে! ওকে সাবধান করে দিল, তারমানে ওর ক্ষতি হোক চায় না। আসলেও কি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে কাজ করছে, নাকি ওর প্রতি দুর্বলতা বোধ করায় তাদের সাথে বেঈমানী করার ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে?

মনে পড়ল, হোটেল ডি-প্যালেসে প্রকাণ্ড রাশিয়ান লোকটাকে দেখেছে ও। হঠাৎ করেই গোটা বুক জুড়ে আঁটসাঁট একটা ভাব অনুভব করল। রাশিয়ান লোকটা যদি সত্যি ওর পিছু নিয়ে থাকে, ওর পরিচয় তাহলে অজানা নেই তার। লোকটা তাহলে সম্ভবত চেস্টন পোলোকেও চিনতে পেরেছে।

ধীর পায়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এল রানা। ধৈর্য ধরে বসে আছে পোলো, রানাকে দেখে দু'সারি দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুট নামাল, বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে, মি. রানা। আপনার কথাগুলো ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আপনাকে আমি আর সময় দিতে পারছি না, জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, দুঃখিত।'

'বাড়িতে আপনাকে না পেয়ে ফিরে আসছি, এই সময় একজন রাশিয়ান এজেন্টকে দেখি আমি। আপনার গেটকীপারের সাথে কথা হয়েছে তার। আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখছে ওরা, মি. পোলো। আর এক রাশিয়ান এজেন্ট এই কাফের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

পোলোর চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। 'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, তার প্রমাণ কি, মি. রানা?'

'বাড়িতে ফোন করে গেটকীপারকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারেন,' পরামর্শ দিল রানা।

নড়ল না পোলো। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে বসে থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর জানতে চাইল, 'আপনার সাথে যোগাযোগ করার উপায়?'

'হোটেল ডি-প্যালেসে উঠেছি,' বলল রানা। 'হুয়ান ফার্নান্দেজ নামে। কি করতে চান আপনি?'

'সেটা আমার ব্যাপার, ভেবে দেখতে হবে,' বলে উঠে দাঁড়াল পোলো। 'পরে কোন একসময় আপনার সাথে যোগাযোগ করব আমি।'

'বাড়িতে ফিরলে ভুল করবেন,' বলল রানা। 'চোখ-কান খোলা রেখে যতটুকু পারেন সাবধানে থাকুন। ওদের হাতে পড়লে মারা পড়বেন।'

'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানা আছে আমার,' ঝাঁঝের সাথে বলল পোলো। 'তবু সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কিছুক্ষণ আপনি এখানেই থাকুন, প্লীজ। আমি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

বারের দিকে এগোল পোলো। কাউন্টারের ওদিকে পৌঁছে বারম্যানের সাথে কথা বলল। তারপর ছোট একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পিছন দিকে।

নতুন আরেক প্রস্থ বিয়ারের অর্ডার দিল রানা। মিনিট পাঁচেক পর কাফের সামনে দিয়ে রাশিয়ান লোকটাকে হেঁটে যেতে দেখল ও।

পাশ ঘেঁষে যাবার সময় কাফের ভেতর তাকাল বুলিন। তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করল রানা।

চার

হোটেলের বাসে করে ফিরবে পাপিতা, শেডের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের শান্ত ধীর মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। রানাকে সাবধান করে দিয়েছে, ঘুণাক্ষরে একটু যদি আভাসও পায় বুলিন, সাথে সাথে তাকে খুন করবে সে। বুলিনকে যতটুকু চিনেছে, এবং তার সম্পর্কে যে-সব কথা শুনেছে, এই লোকের মনে দয়ামায়ার কোন অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তবু বুলিনকে তার মোটেও ভয় করছে না। অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থির করেছে সে, কপালে যাই থাকুক রানার দলে আছে সে। কোন বাধাই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

বাস এখনও আসছে না কেন! হোটেলে ফেরার জন্যে অস্থিরতা অনুভব করল সে। ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, ঘ্যাঁচ করে সামনে একটা গাড়ি থামতে একটু চমকে উঠল। ঘাড় ফেরাতেই বুলিনের ক্যাডিলাক দেখতে পেল সে, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

ক্যাডিলাকের পিছনের সীটে একা বসে রয়েছে বুলিন। হাত-ইশারায় ডাকার সময় তার সবুজ চোখ পাপিতার মুখের ওপর আগুনের আঁচের মত লাগল। কলজে শুকিয়ে গেলেও চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল পাপিতা। শেড থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোবার সময় বুলিনের চোখ থেকে দৃষ্টি সরাল না। বুলিন কি টের পেয়ে গেছে ব্যাপারটা? প্রতিশোধ নেবার জন্যে এসেছে? দূর, তা কি করে হয়! রানাকে হয়তো টেলিফোনের রিসিভার তুলতে দেখেছে সে, কিন্তু কে ফোন করেছে না করেছে জানবে কিভাবে?

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল পাপিতা।

'উঠে পড়ো,' জানালার কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে হুকুমের সুরে বলল বুলিন। তারপর সীটের আরেক কোণে সরে গেল সে।

দরজা খুলে গাড়িতে উঠল পাপিতা। ঘামে ভিজে গেছে হাতের তালু।

'আমি ফিরে যাচ্ছি,' সীটের কোণ থেকে পাপিতার ওপর চোখ রেখে বলল বুলিন। 'তোমাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ,' বলল পাপিতা। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল।

'হোটেল ডি-প্যালেস,' শোফারকে বলল বুলিন। 'কোথায় বেরিয়েছিলে?'

গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

'টুকটাক কিছু কেনাকাটা করলাম,' বলল পাপিতা। 'কি ঘটল ওখানে?' জানতে চাইল সে। 'মোটা লোকটা কে? নাকি জানতেই পারোনি?'

সোজা গাড়ির সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল বুলিন। দুই ঠোঁটের মাঝখানে টান টান হয়ে আছে একটা রেখা। 'চেস্টন পোলো। এই লোকটাই ওয়েন প্যাকারের কন্ট্যাক্ট। একটা কাফেতে ঢোকে ওরা। পিছন দিয়ে কেটে পড়েছে পোলো।'

'আর রানা?'

'তাকে ওখানে রেখে চলে এসেছি। পোলোর সাথে কথা হয়েছে ওর।'

'তারমানে ওয়েন প্যাকার কোথায় আছে, রানা এখন তা জানে?' জিজ্ঞেস করল পাপিতা।

'কি জানি! পোলো তাকে বলেছে বলে মনে হয় না।'

'এখন কি করা উচিত আমাদের?'

'যা করছি,' বলল বুলিন। 'পোলোর বাড়ির ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে নিকোলাই। রাতে যখনই হোক বাড়ি ফিরবে পোলো, তখন তাকে ধরব আমরা।' হঠাৎ করে পাপিতার দিকে ফিরল সে। 'তোমার জন্যে একটা কাজ আছে।' বুলিনের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে কেমন যেন জড়সড় হয়ে উঠল পাপিতা।

'কি কাজ?' পাপিতার নিজের কানেই বেসুরো শোনাল আওয়াজটা।

'আর দেরি করা চলে না,' বলল বুলিন। 'আজ রাতেই আমার বাংলোয় রানাকে নিয়ে আসছ তুমি।'

একটা ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয় করল পাপিতা, বলল, 'কিন্তু এই না তুমি বললে পোলো তাকে কিছু বলেছে বলে মনে হয় না!'

'ঠিক ওই কথা বলিনি,' বুলিনের সবুজ চোখ পাপিতার মুখের ওপর স্থির হয়ে থাকল। 'ওদের মধ্যে কথা হয়েছে, কি কথা হয়েছে সেটা জানতে চাই। জানার পর আজ রাতেই শেষ করব ওকে।'

শিউরে উঠল পাপিতা।

'তুমি অসুস্থ বোধ করছ?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল বুলিন।

'সামান্য,' চোখ দুটো আধবোজা করে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল পাপিতা, বলল, 'যা গরম!'

'হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নাও,' বলল বুলিন। 'সন্ধের পর ওকে নিয়ে বেরুবে তুমি।'

'কিন্তু দেখা পেলে তো,' মৃদু কণ্ঠে বলল পাপিতা। রানার বিপদ বুঝতে পেরে

সত্যি সত্যি অসুস্থ বোধ করছে সে। 'কখন আসে কখন যায়, কোন ঠিক নেই তার। তাছাড়া...'

'তাছাড়া?'

'কি বলব ওকে? তোমার বাংলোয় যেতে চাইবে কেন?'

'কি বলতে হবে, তোমাকে জানিয়েছি,' কঠিন সুরে বলল বুলিন। 'এক কথা ক'বার বলতে হয়? তোমার বান্ধবী লিজা পার্টি দিচ্ছে। তুমি চাও, সে-ও তোমার সাথে যাক। আমার নির্দেশ মত ওকে যদি প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পেরে থাকো, না বলবে না।'

'কিন্তু রাতে যদি ফিরতে দেরি করে ফেলে?'

'দেরি করবে না,' বলল বুলিন। 'পোলো কখন ওয়েন প্যাকারের কাছে নিয়ে যাবে সেই অপেক্ষায় আছে সে, হাতে আর কোন কাজ নেই। পোলো এখুনি তাকে প্যাকারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে না। প্রথমে রানা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করবে সে। হোটেলে ফিরে পোলো যোগাযোগ করবে এই আশায় অপেক্ষা করবে রানা। আজই কাজটা সারতে হবে তোমাকে। রাত আটটার দিকে। এটা এমন কোনও কঠিন কাজ নয়, তুমি পারবে।'

না, পারব না! মনে মনে বলল পাপিতা, কিন্তু মুখে বলল, 'চেষ্টা করব।'

'কি বললে?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল বুলিন। 'চেষ্টা করবে? শুধু চেষ্টা আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট নয়। কথাটা মনে রেখ। আমার একার জন্যে নয়, রানাকে আমার বাংলোয় নিয়ে আসাটা তোমার জন্যেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়ই তুমি ফরাসী জেলখানায় দশটা বছর কাটাতে চাও না?'

শিউরে উঠল পাপিতা। 'না!'

'এই তো বুঝেছ!'

ট্রাফিক লাইট লাল দেখে শ্লথ হয়ে এল গাড়ির গতি, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের সামনে, পাশের রাস্তায়, এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সিমকা, বুলিন বা পাপিতা কেউ সেদিকে তাকাল না। কিন্তু সিমকা থেকে ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পেল রবার্ট লুডলাম।

শহর দেখতে বেরিয়েছিল লুডলাম, ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে ডাকারে। পাপিতাকে দেখেই চমকে উঠল সে, তারপর তার চোখ পড়ল বুলিনের ওপর। ক্যাডিলাকটা চিনতে পারল সে। এই কি সেই রহস্যময় ডেনিশ? ক্যাডিলাকের উইন্ডস্ক্রীনে রোদ পড়ায় চকচক করছে, বুলিনকে ভাল করে দেখতে পেল না সে।

লাল আলো সবুজ হতেই দ্রুত সামনে বাড়ল ক্যাডিলাক। সিমকাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল শোফার, বুলিন বা পাপিতা লুডলামের দিকে তাকাল না।

মরিয়া হয়ে উঠে সামনের দুটো গাড়িকে ওভারটেক করল লুডলাম, প্রতিবাদ উঠল ড্রাইভারদের গলা থেকে, পঁচিশ গজ পেরোতে একটুর জন্যে তিনটে দুর্ঘটনা এড়াল, বাঁকের কাছে পৌঁছে বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে চলে এল পাশের রাস্তায়, তারপর অটোরুট ধরে ছুটল তীর বেগে।

গাড়ি সিধে করে নিতেই ক্যাডিলাককে দেখতে পেল লুডলাম। এখনও প্রায়

আধ কিলোমিটার দূরে রয়েছে, ছুটছেও ঝড়ের গতিতে। ওটাকে ওভারটেক করা সম্ভব নয়, চেষ্টা করল যাতে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখা যায়। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, কয়েক কিলোমিটার এগোবার পর সামনে একপাল ছাগল পড়ায় গতি কমাতে হলো ক্যাডিলাককে, এই সুযোগে তার ঠিক পিছনে চলে এল সিমকা। সদাহাস্যময় তিনজন আফ্রিকান কিশোর ওগুলোকে নিয়ে অটোরুট পেরুল। ক্যাডিলাকের পিছু পিছু আবার রওনা হলো সিমকা।

লুডলামকে পিছনে নিয়েই হোটেলে ঢুকল ওরা। ক্যাডিলাককে ছাড়িয়ে গিয়ে একটু দূরে থামল সিমকা, পিছনের উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে লুডলাম দেখল, হোটেলের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াল ক্যাডিলাক, দরজা খুলে নিচে নামল পাপিতা। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

ধীর গতিতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাডিলাক, ইতিমধ্যে সিমকা থেকে নেমে পড়েছে লুডলাম। ক্যাডিলাক ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় চোখ ফিরিয়ে ওর দিকে একবার তাকাল বুলিন, কিন্তু চেহারায় কোন সতর্ক ভাব ফুটল না।

ডেনিশ ? হাসি পেল লুডলামের। হতেই পারে না! চেহারাতেই স্পষ্ট লেখা রয়েছে, ব্যাটা রাশিয়ান।

এক লাফে সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে হোটেলের ভেতর ঢুকল লুডলাম। লবিতে পা দিয়েছে, দেখল, রিসেপশন থেকে বেরিয়ে আসছে পাপিতা, হাতে চাবির রিঙ।

'হাই!' পাপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লুডলাম। দ্রুত এগিয়ে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল পাপিতা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। হাসল বটে, কিন্তু সেটা জোর করা তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। জিজ্ঞেস করল, 'এই অসময়ে···কোত্থেকে?'

'আকাশ থেকে,' বলল লুডলাম। 'তোমার সাথে কথা আছে। চলো, বারে বসি।'

বিনা প্রতিবাদে লুডলামের পিছু নিল পাপিতা, তার মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। লুডলাম কি তাকে বুলিনের সাথে দেখেছে? নিশ্চয়ই তাই। তাহলে এখন কি হবে! যাই হোক, আমি পরোয়া করি না! ঠিক সামলে নেব। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি উতরে যেতে না পারি তাহলে আমি কিসের এজেন্ট! বুলিনকে লুডলাম চেনে না, বড়জোর জিজ্ঞেস করতে পারে, লোকটা কে? এর একটা উত্তর দেয়া তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু তাকে সন্দেহ করে বসেনি তো লুডলাম? ওকে দেখার সাথে সাথে তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, সেটা কি লক্ষ্য করেছে ও?

মনটা একটু দমে গেল পাপিতার। জানে, এই ধরনের খুঁটিনাটি ব্যাপার লুডলামের দৃষ্টি এড়ায় না।

নির্জন একটা কোণে মাঝখানে টেবিল নিয়ে বসল ওরা। নিজের জন্যে বিয়ার চাইল লুডলাম। পাপিতা বলল, সন্ধের আগে ড্রিঙ্ক করতে অভ্যস্ত নয় সে, তার

কফি হলেই চলবে।

অর্ডার নিয়ে চলে গেল ওয়েটার। সাথে সাথে প্রসঙ্গটা পাড়ল লুডলাম। 'ক্যাডিলাকে তোমার সাথে দেখলাম, কে ওই লোক?'

ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে পাপিতা। ভাব দেখাল, একটু অবাক হয়েছে। তারপর মুচকি হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল, 'এত কৌতূহল তো ভাল কথা নয়।'

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি, পাপিতা,' শান্ত সুরে বলল লুডলাম।

'আরে কেউ না!' হেসে উঠে বলল পাপিতা। 'হোটেলের বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, ভদ্রলোক আমাকে একটা লিফট দিতে চাইলেন। তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি কোন অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়িনি।'

গম্ভীর হলো লুডলাম। বলল, 'সত্যিই কি তাই? লোকটা তোমার চেনা-শোনা কেউ নয়?' ওয়েটারকে আসতে দেখে চুপ করে গেল সে। কফি আর বিয়ার দিয়ে ফির গেল লোকটা।

'না,' এবার পাপিতার কঠিন হবার পালা। 'আগে কখনও দেখিনি। এসবের মানে কি, জানতে পারি, লুডলাম?'

পাপিতার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লুডলাম বলল, 'লিফট দিতে চাইল, নিশ্চয়ই নিজের পরিচয় দিয়েছে। নাম কি?'

চেহারা লাল হয়ে উঠল পাপিতার। 'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে জেরা করছ? ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না, লুডলাম।'

মৃদু হাসল লুডলাম। 'সে ধরনের কোন ব্যাপার নয়। লোকটাকে আগেও কোথাও দেখেছি বলে মনে হলো, তাই জিজ্ঞেস করছি।' ভাবল, আমি যে ওকে সন্দেহ করেছি সেটা বুঝিয়ে দেয়া গেছে। এখন যদি আমি কিছু হয়নি এই রকম ভাব দেখাই, সাংঘাতিক ঘাবড়ে যাবে ও। এই মানসিক যন্ত্রণার তুলনা হয় না। একটু ভুগুক, অস্থির হয়ে উঠুক, তাহলে নিজের অজান্তে দু'একটা ভুল করে বসতে পারে। সেই সুযোগে থাকলাম আমি। 'লোকটা সুইডিশ, তাই না?'

চিন্তিত ভাবে লুডলামের দিকে তাকিয়ে থাকল পাপিতা। লুডলাম কি আমাকে সন্দেহ করেছে? ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। প্রথমদিকে কঠিন লাগছিল ওকে। তারপর হঠাৎ এই রকম নরম, স্বাভাবিক হয়ে উঠল কেন? 'বোধহয়। দেখে সে সুইডিশ বলেই মনে হয়, তাই না? লোকটার নাম ফর্গ্যান। ব্যবসার কাজে দু'চারদিনের জন্যে এসেছে এখানে। সত্যি আগে তুমি দেখেছ ওকে? কোথায় বলো তো?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না,' বলল লুডলাম। 'আমার ভুলও হতে পারে।'

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে লুডলাম ভাবল, পাপিতা মিথ্যেকথা বলছে। লোকটাকে যদি সে না চেনে লোকটা তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে সুইনডেল নেলসন বলে। তাছাড়া, পাপিতার যে অভিজ্ঞতা, এই লোক যে সুইডিশ নয় রাশিয়ান সেটা তার খুব ভাল করেই জানা আছে। প্রসঙ্গটা আবার টেনে আনল সে, জানতে চাইল, 'তোমার কি একবারও মনে হয়নি, লোকটা রাশিয়ানও হতে

পারে?'

গলা শুকিয়ে গেল পাপিতার। বিস্মিত হবার ভান করে বলল, 'কই, না! কিন্তু তুমি বলার পর মনে হচ্ছে, তাইতো! লোকটার যা চেহারা, রাশিয়ান হওয়াও বিচিত্র কিছু না।'

'তোমাকে কোন প্রশ্ন করেনি সে?'

'সাদামাঠা, সাধারণ প্রশ্ন দু'একটা। ছুটি উপভোগ করছি কিনা। কতদিন আছি। এইসব।'

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল লুডলাম, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমাকে নিয়ে মুশকিল কি জানো, আমি বড় সন্দেহপ্রবণ।' হেসে উঠল সে। 'বাদ দাও, ভুলে যাও। নতুন কিছু থাকলে বলো।'

'নতুন আর কি,' বলল পাপিতা। হাতঘড়ি দেখল সে। 'মিনিট কয়েকের মধ্যে বাস ধরে এয়ারপোর্টে যাব। প্যারিস ফ্লাইট এসে পৌঁছুবে চারটার সময়। রানা হয়তো থাকতে পারে ওতে।'

বিয়ারের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল লুডলাম। 'ঠিক আছে, আমি তাহলে গেলাম। তোমাকে আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব নাকি?'

'একবার ঘরে যেতে হবে,' বলল পাপিতা। 'না, আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই।' সে-ও চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'যোগাযোগ রেখো।'

'অবশ্যই,' বলে ঘুরে দাঁড়াল লুডলাম, বার থেকে বেরিয়ে এল লবিতে।

বাইরে থেকে ঠিক এই সময়ে রানাও ঢুকল লবিতে। পরস্পরকে পাশ কাটাল ওরা—রানা গেল ডেস্ক থেকে তার কামরার চাবি নিতে, লুডলাম গেল পার্কিং এরিয়ায় তার গাড়িতে চড়বে বলে।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লুডলাম, ভাবছে। ওর প্রথম সন্দেহ যে মিথ্যে নয়, এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাপিতা ডাবল এজেন্ট। সীন ওয়াটের হয়ে কাজ করছে সে, আবার রাশিয়ানদের হয়েও কাজ করছে। চাপ পড়লে কোন্ দলের দিকে ঝুঁকে পড়বে পাপিতা, সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

মি. ওয়াটকে সাবধান করা দরকার।

হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এল। নিজের গাড়ির কাছ থেকে সরে এসে দশ গজ দূরে অন্য একটা গাড়ির পিছনে দাঁড়াল সে। এখান থেকে হোটেলের গাড়ি-বারান্দাটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

মিনিট পাঁচেক পর গাড়ি-বারান্দায় এল হোটেলের বাস। হোটেলের ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্ট বেরিয়ে এসে ড্রাইভারের কাছ থেকে টিকিট কিনে বাসে চড়ল। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ড্রাইভার, তারপর ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল লুডলাম। তারমানে এমনকি এয়ারপোর্টের ওপরও নজর রাখছে না পাপিতা। তার কফিনের ওপর আরেকটা পেরেক।

ফিরে এসে সিমকায় চড়ল লুডলাম। দ্রুত ডাকারের দিকে ফিরে চলল সে।

গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা। রহস্যের জট ছাড়াতে না পেরে নিজের

ওপরই বিরক্ত হয়ে আছে ও। পোলোর আচরণের কারণ বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। পর্তুগীজ লোকটা তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারলে মুখ খুলবে না, সেটাই স্বাভাবিক। ওর ধারণা, আজ রাতের মধ্যেই কোন একসময় যোগাযোগ করবে সে। তার আগে অবশ্যই ওয়েন প্যাকারের সাথে কথা বলবে, জেনে নেবে ওয়েন প্যাকার রানার সাথে দেখা করতে চায় কিনা। সে রাজি হলে পোলো আর রানার সাথে রহস্যময় আচরণ করবে না।

কিন্তু পোলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে রানা উদ্বিগ্ন। সোনালি চুল রাশিয়ান ওর সাথে কাফেতে দেখেছে তাকে, রাস্তায় কোথাও আবার দেখলে সাথে সাথে চিনতে পারবে, যে-কোন রাস্তায় এই রকম মোটাসোটা লোক দু' একটাই দেখতে পাওয়া যায়। পোলোকে বাড়ি ফিরতে নিষেধ করে দিয়েছে ও, কিন্তু লোকটা কি ওর কথার গুরুত্ব দেবে? বলল বটে নিজেকে সে রক্ষা করতে জানে, কথাটা কতখানি সত্যি কে বলবে!

টেলিফোন কলটাই সবচেয়ে বেশি বিমূঢ় করে তুলেছে রানাকে। প্রথমে মনে হয়েছিল, পাপিতা। কিন্তু এখন ভাবছে, সত্যিই কি পাপিতা? গলার আওয়াজ শোনার সময় মনে হয়েছিল রুমাল দিয়ে রিসিভার ঢেকে কথা বলছে, কিন্তু নাও তো হতে পারে। মেয়েটার গলার স্বর হয়তো ওই রকম খসখসেই। আর যদি পাপিতাই ফোন করে থাকে, এর ব্যাখ্যা কি?

প্যাঁচ-ঘোঁচের মধ্যে না গিয়ে সহজ সরল একটা ব্যাখ্যা এইরকম হতে পারে না?—রাস্তায় এই রাশিয়ান লোকটাকে হঠাৎ করেই হয়তো দেখতে পায় পাপিতা, দেখে চিনতে পারে, এবং লক্ষ্য করে, লোকটা আমাকে অনুসরণ করছে। ও রাশিয়ান, পাপিতা তা জানে, সেটাই তার সতর্ক হয়ে ওঠার কারণ। আমাকে কাফেতে ঢুকতে দেখেছিল সে, বড় আকারের সাইনবোর্ডটা দূর থেকেই পড়তে পারে। ফোন গাইড ঘেঁটে নম্বর বের করতে কোন অসুবিধে হয়নি। আমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ফোন করে কাফেতে।

ব্যাখ্যা হিসেবে খুব যে খারাপ এটা তা নয়, কিন্তু রানা সন্তুষ্ট হতে পারল না।

তাহলে কি পাপিতা একজন এজেন্ট? ওদের দেখা হওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না, পাপিতার আচরণে বা হাবভাবে এমন কিছু দেখেনি যাতে তার এতটুকু সন্দেহ আসে। তবে, পাকা একজন এজেন্টের কাছ থেকে সেটাই তো আশা করা হয়—সাবলীল, স্বাভাবিক পথে আসবে সে, টেরও পেতে দেবে না অথচ গেঁথে নেবে বড়শিতে।

পাপিতা যদি এজেন্টই হয়, কার হয়ে কাজ করছে সে? সীন ওয়াট?

হোটেলের ডেস্ক থেকে চাবি নিয়ে লবিতে বেরিয়ে এল রানা, বিষয়টা নিয়ে এখনও ভাবছে। এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াল, দেখল, বার থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছে পাপিতা।

ম্লান হয়ে আছে পাপিতার চেহারা, দু'চোখে উদ্বেগ, নিষ্প্রাণ হাসিটা একটুও মানাল না। কাছে এসে দাঁড়াল সে, মুখ তুলে রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'সেকেন্ড, তারপর বলল, 'তোমার সাথে আমার কথা আছে, হুয়ান। আমার ঘরে

আসবে একবার?'

'চলো,' কোন প্রশ্ন না করেই রাজি হয়ে গেল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কিছু ঘটেছে?'

জবাব না দিয়ে এলিভেটরে চড়ল পাপিতা, তার পিছু পিছু রানাও। সাততলায় উঠে এল ওরা। করিডর ধরে পাশাপাশি হাঁটার সময় মৃদু কণ্ঠে পাপিতা বলল, 'হ্যাঁ, ঘটেছে। বলছি, আগে ঘরে চলো।'

রানাকে নিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল পাপিতা। দরজা বন্ধ করল। রানার কাছ থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে সরে গেল, তারপর ফিরল ওর দিকে। 'তুমি কে আমি জানি,' বলল সে। 'তুমি মাসুদ রানা।'

ঘাড়ের পিছনটা আঙুল দিয়ে ডলতে শুরু করল রানা, দুই ভুরুর মাঝখানে একটা ভাঁজ ফুটে উঠল। তারপর গায়ের কোট খুলে হোলস্টারের স্ট্র্যাপ ঢিলে করল। কোট আর রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে ওগুলোর পাশেই বসে পড়ল, পা ঝুলিয়ে। 'থামলে কেন? আমি কিছু বলার আগে তোমার সব কথা শুনতে চাই।'

'আমি ইউ-টু-টু-সিক্স-জিরো,' বলল পাপিতা, স্প্রিঙের খাটে ধপ করে বসে পড়ল। দোল শেষ হতে পা ছুঁড়ে জুতো খুলল, তারপর ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। 'এর অর্থ কি বোঝো?'

আশরাফের কাছে একবার শুনেছিল রানা, সীন ওয়াটের রিজার্ভে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে এজেন্ট আছে, তার কোড নেম ইউ-টু-টু-সিক্স-জিরো। আশরাফের সাথে পরিচয় হয়নি মেয়েটার, তবে তার লেখা দু'একটা রিপোর্ট দেখার সুযোগ হয়েছিল তার।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তোমার সম্পর্কে শুনেছি। মি. ওয়াটের কাজ করো। টেলিফোনের জন্যে ধন্যবাদ, পাপিতা।'

রানা আরও কিছু বলবে এই আশায় অপেক্ষা করে থাকল পাপিতা, কিন্তু ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে বোবা হয়ে থাকল রানা। অগত্যা, তাকেই মুখ খুলতে হলো, 'আমি সেনেগালে কেন, তুমি জানো?'

'বোঝাই যায়। মি. ওয়াট তোমাকে আমার ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠিয়েছে।' একটু চিন্তিত দেখাল রানাকে। জানতে চাইল, 'হঠাৎ এভাবে নিজের পরিচয় ফাঁস করলে কি মনে করে? বেশ তো বোকা বানিয়ে রেখেছিলে।'

'তুমিও আমাকে বোকা বানিয়েছ। আমি মনে করেছিলাম সত্যি তুমি হুয়ান ফার্নান্দেজ, মেক্সিকান ব্যবসায়ী।'

দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজটা আরও একটু গভীর হলো, রানা জানতে চাইল, 'ঠিক বুঝলাম না, আমার ওপর নজর রাখার জন্যে ওয়াট পাঠায়নি তোমাকে?'

'তাঁর কথায় আসিনি আমি। ব্যাপারটা তার চেয়েও জটিল, রানা।' কোন কারণ নেই, তবু হাঁপিয়ে উঠছে পাপিতা। 'তাঁকে যখন বললাম আমি ডাকারে যাচ্ছি, খুশি হলেন—এটুকুই। আমার এখানে আসার ব্যাপারটা তাঁর আইডিয়া নয়। তাঁর ধারণা, তুমি মারা গেছ।' হাত বাড়িয়ে সিগারেটের গায়ে টোকা দিল সে, ছাই পড়ল কার্পেটে। 'তুমি হফারের হয়ে কাজ করছ, তাই না?'

মুচকি হাসল রানা। 'তোমার কথা শুনতে হবে আমাকে, এই বলে ডেকে নিয়ে এসেছ,' বলল ও। 'আমাকে কিছু বলতে হবে কেন?'

'প্লীজ, রানা, আমার সাথে এমন কোরো না,' আবেদনের সুরে বলল পাপিতা। 'আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছি না।' বলতে ইচ্ছে করল, বোকার মত আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, রানা! কিন্তু সেটা রানার কাছে হাস্যকর শোনাবে ভেবে ইচ্ছেটাকে চেপে রাখল। বলল, 'আমার বিপদ হয়েছে, অপরাধ বোধে ভুগছি। কেন জানি না, তোমাকে অকপটে সব কথা বললে আমার কোন ক্ষতি হবে না, এই রকম একটা বিশ্বাস আমার আছে। মনটাও হালকা করা দরকার, তোমার পরামর্শও চাই।'

'ব্যাপারটা তারচেয়েও জটিল—এই কথার কোন ব্যাখ্যা দিলে না তুমি,' বলল রানা। 'আমার ওপর বিশ্বাস এসেছে তোমার, হয়তো মানুষ হিসেবে আমাকে তোমার ভালও লেগে গেছে—তা যদি হয়, আমিই দায়ী। দুঃখিত, পাপিতা। তোমার কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত ছিল আমার। তোমার মত অনেক মেয়েই আমার ব্যাপারে ভুল করে বসে।'

মন খারাপ হয়ে গেল পাপিতার, সেই সাথে সতর্ক হয়ে উঠল। কিভাবে যেন তার মনের অবস্থা টের পেয়ে গেছে রানা। তার প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে! নিজেকে জড়াতে চায় না তাই আগেই সাবধান করে দিল তাকে। জেনেই যখন ফেলেছে, সব কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার ওকে। বলল, 'তুমি ভুল বুঝছ, রানা। আমি তোমাকে দায়ী করছি না। কারও সাথে শুলে, পরে তাকে এড়িয়ে যেতে পারি আমি—তোমার বেলাতেও পারব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পারিনি। পুরুষ মানুষ আমার কাছে কাপড়-চোপড়ের মত, বদলে ফেলতে পারলে খুশি হই, কিন্তু তোমার বেলায় উল্টোটা ঘটছে। সেজন্যে তোমার চিন্তিত হবার কিছু নেই, রানা। তোমাকে নিয়ে ঝুলে পড়ার কোন প্ল্যান আমার নেই—বিশেষ করে তোমার যেখানে অমত।'

'আমাকে এড়াতে না পারার কারণ?'

কাঁধ ঝাঁকাল পাপিতা। 'কি জানি! ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। তবে তোমার মত আর কেউ আমাকে অন্তরের গভীরে এমন নাড়া দিতে পারেনি। হয়তো ব্যাপারটা অনেকখানিই সেক্সুয়াল। তোমাকে এড়াতে না পারার সেটাই হয়তো মূল কারণ।'

'তা যদি হয়, তোমার এই আকর্ষণ সাময়িক,' বলল রানা। 'নিজেকে বুঝতে ভুল করছ তুমি—একে প্রেম বলে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পাপিতা।

'এখন কি হবে তাই বলো,' জানতে চাইল রানা। 'আমি মারা যাইনি, খবরটা কি ওয়াটকে জানাবে তুমি?' তারপরই একটা কথা মনে পড়ে যেতে তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল ও, 'তুমি আমাকে চিনলে কিভাবে?'

'ভাবছিলাম, এখনও প্রশ্নটা করছ না কেন?' বলল পাপিতা। তিক্ত একটু হাসি ফুটে ছিল ঠোঁটে, সেটা মিলিয়ে গেল। বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হলো সে,

তাকাল সিলিঙের দিকে। ভাবল, না, রানা আমাকে ভালবাসবে এ আমি আশা করতে পারি না। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় আঘাত পেয়েছি বটে, কিন্তু ভুলের মধ্যে আরও জড়িয়ে পড়িনি সেটাও কম কথা নয়। ঠিক আছে, তবে তাই হোক, ভালবাসাটা একতরফাই থেকে যাক। রানাকে আমি বুলিনের ফাঁদে পড়তে দিতে পারি না। ওর কিছু ঘটলে আমি মরে যাব।

'এক কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি,' সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে রানার দিকে তাকাল পাপিতা। সিগারেট টানল। 'বুলিন বলেছে আমাকে।'

শক্ত হয়ে গেল রানা। 'বুলিন? কে সে?'

'বুলিনের নাম শোনোনি? ওয়াট জানে, আশরাফও নিশ্চয় জানত।'

'রাশিয়ান এজেন্টের কথা বলছ?' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'সোনালি চুল? ওর নাম বুলিন?'

'হ্যাঁ, ওর নাম বুলিন।'

'সে তোমাকে বলেছে? কেন? তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'ইউ-টু-টু-সিক্স-জিরো একজন ডাবল এজেন্ট, রানা।'

একদৃষ্টে পাপিতার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে, তারপর মৃদু গলায় জানতে চাইল, 'এসব কথা কেন বলছ আমাকে?'

বলছি, কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি, মনে মনে বলল পাপিতা। কিন্তু মুখে বলল, 'আমি নিজেও জানি না।'

চুপ করে থাকল রানা।

'বুলিনের ওপর নির্দেশ আছে, ওয়েন প্যাকারকে খুঁজে বের করতে হবে,' বলল পাপিতা। 'ওয়েন প্যাকারের হাতে টপসিক্রেট ইনফরমেশন আছে, রাশিয়ানরা চায় না সেটা আর কারও হাতে গিয়ে পড়ুক। বুলিনই আমাকে ডেকে পাঠায় এখানে। মি. ওয়াটের চেয়ে অনেক বেশি জানে বুলিন। মি. ওয়াট বলতে গেলে কিছুই জানেন না।'

'একেবারে কিছুই না?'

'জানেন, মাদাম স্যানডোরার সাথে সরাসরি যোগাযোগ না করাটা তাঁর মস্ত একটা ভুল হয়েছে। জানেন, স্যানডোরার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য ছিল। সেটা কি, এখনও তিনি লুডলাম আর আমার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করছেন।' পাপিতা লক্ষ্য করল, রানার পেশীগুলো এখনও টান টান হয়ে আছে, গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে ও। 'লুডলাম মি. ওয়াটের একজন এজেন্ট। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এখানে আসার পর থেকেই আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। আজ বিকেলে বুলিনের সাথে আমাকে দেখেছে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'এজেন্ট হিসেবে আমার ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে গেছে। আমার যাবার আর কোন জায়গা নেই, রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

'আর কি জানে বুলিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হফারের কথা জানে, কিন্তু তুমিও সেটা আন্দাজ করতে পেরেছ, তাই না?'

বালিশ থেকে পিঠ তুলে সিধে হয়ে বসল পাপিতা। কার্পেটে সিগারেট ফেলে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে, এক পাটি জুতো তুলে নিয়ে আগুনটার ওপর ঘষল। কালো দাগ পড়ে গেল কার্পেটে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সিধে হলো আবার। বলল, 'লুডলামের কথাও জানে বুলিন।' মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'তুমি হফারের হয়ে কাজ করছ, তাই না?'

কার্পেটের কালো দাগটা থেকে চোখ তুলে পাপিতার দিকে তাকাল রানা। কিন্তু জবাব দিল না।

'তাও বুলিন জানে,' বলল পাপিতা।

'খুব চালাক মানুষ, তাই না?' ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রানার ঠোঁট থেকে। 'সবজান্তা! হ্যাঁ, কার্ল হফারের কাজ করছি আমি। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে প্রস্তাব দিল, ওয়েন প্যাকারের কাছে একটা মাইক্রোফিল্ম আছে, সেটা নিয়ে এসে দিতে হবে। রাজি হয়ে গেলাম।' আসল কথা কিছুই পাপিতাকে জানাল না রানা। ওকে অবিশ্বাস করছে, তা নয়। গোপন কথা গোপন রাখতে হলে দু'কান করতে নেই।

'কথা হয়ে আছে আজ রাতে আমি তোমাকে বুলিনের বাংলোয় নিয়ে যাব,' বলল পাপিতা। 'বুলিনের এটা হুকুম। তোমাকে আমার বলতে হবে, লিজা পার্টি দিচ্ছে, আমি চাই আমার সাথে সেখানে যাও তুমি। বুলিন এখন জানে, পোলো ওয়েন প্যাকারের কন্ট্যাক্ট, কাজেই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন দরকার নেই বলে মনে করছে ও।'

'আজ রাতে?'

'হ্যাঁ।'

খানিক চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'আজ রাতে কিংবা খুব বেশি দেরি করলে কাল সকালে পোলো আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আজ অত্যন্ত জরুরী একটা বিজনেস মীটিঙে ব্যস্ত থাকব আমি, তুমি পার্টিতে যাবার ব্যাপারে আমাকে রাজি করতে পারোনি। কথা দিয়েছি কাল রাতে অবশ্যই লিজার সাথে পরিচয় করতে যাব। শুনে কি বলবে বুলিন?'

সন্ত্রস্ত দেখাল পাপিতাকে। 'কি জানি!'

'এই ছোট একটা ব্যর্থতার জন্যে নিশ্চয়ই কেটে ফেলবে না তোমাকে?' বলল রানা। 'কাল সকাল পর্যন্ত সময় পেলে আমি ওয়েন প্যাকারের সাথে কথা বলার জন্যে রওনা হয়ে যেতে পারব।'

'আমি ব্যর্থ হয়েছি শুনে সে নিজেই হয়তো...'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'আমাকে তার বাংলোয় পেতে হবে, তবে না খুন করবে? বাংলোয় আমাকে নিয়ে যাবার কাজটা কিন্তু আর কাউকে দিয়ে করাবে না বুলিন। সব কাজেরই একটা ধারা আছে। তুমি যদি বলো, আমি কাল যাব, বিশ্বাস করবে সে। আমি ব্যস্ত, সেটা আমার দোষ নয়, এটা সে বুঝবে। বলবে, আমি কিছু সন্দেহ করে বসতে পারি এই ভয়ে খুব বেশি চাপ দাওনি তুমি।'

'ঠিক আছে,' বালিশে হেলান দিয়ে আবার সিলিঙের দিকে চোখ রাখল

পাপিতা। 'কি জানো, রানা, এসব থেকে এখন আমি পালিয়ে যেতে চাই। কেউ যদি বলে দিত কিভাবে তা সম্ভব!' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'না, আমার সমস্যা নিয়ে তোমাকে আমি দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাই না।'

টেবিল থেকে নেমে বিছানায়, পাপিতার পাশে বসল রানা। 'এজেন্ট হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, আর ডাবল এজেন্ট হওয়া তো নিজের কবর খোঁড়া। এটা একটা ঘৃণ্য কাজ। এর শাস্তিও ভয়ঙ্কর। এ-পথে তুমি কেন এলে?'

'একঘেয়েমি কাকে বলে, কখনও শুনেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল পাপিতা। 'লোকে বলে, অলস হাতের জন্যে কাজ যোগায় শয়তান। মি. ওয়াট ভাল কোন কাজ না দিয়ে বিরক্ত করে তুলেছিলেন আমাকে। আমি উত্তেজনা খুঁজছিলাম, বিপদ চাইছিলাম…এই তো, সবই এখন পাচ্ছি আমি।' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল পাপিতা। বড় দুঃখের হাসি, অনুশোচনায় ভরা। 'কিন্তু এখন দেখছি এসব যতটা ভাল লাগবে বলে মনে হয়েছিল তা লাগছে না।' নিজেকে ব্যঙ্গ করছে সে, শাস্তি দিচ্ছে।

এক মুহূর্ত চিন্তিত দেখাল রানাকে। তারপর বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। তুমি বরং সব খুলে বলো। এ-লাইনে তুমি এলে কিভাবে?'

'কি হবে শুনে?'

'হয়তো কিছুই হবে না, কিন্তু আমার কৌতূহলটুকু মিটবে তো। নাও শুরু করো।'

কাঁধ ঝাঁকাল পাপিতা, তারপর শুরু করল। কিভাবে এজেন্ট, তারপর ডাবল এজেন্ট হলো, সব বলল রানাকে। সবশেষে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, বলল, 'আমি শেষ হয়ে গেছি, রানা। আমার আর কোন আশা নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। 'তারমানে, কোন আদর্শের জন্যে নয়, স্রেফ মজা পাবার জন্যে এসব করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

রানা আর কোন প্রশ্ন করল না। অনেক আশা নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল পাপিতা, ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল চেহারা। বুঝল, ওকে কোন উপায় বাতলে দেবার কথা ভাবছে না রানা।

'রানা?'

অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে উঠল রানা। 'উঁ?'

'আমার একটা অনুরোধ। রাখবে?'

পাপিতার দিকে ফিরল রানা। 'বলো।'

একটা হাত দিয়ে রানার গলা জড়িয়ে ধরল পাপিতা। 'আমাকে একটু ভালবাস। খুব বেশি সময় তোমার নষ্ট করব না। আর কোন কথা নয়…শুধু ভালবাস আমাকে।'

টেপ-রেকর্ডারের স্পুল নিজের কাজ করে চলেছে। ঘুরছে, সেই সাথে ওদের সব কথা আর শব্দ টেপ করে নিচ্ছে। পাশের কামরায় রয়েছে সেটা। পাপিতার এই কামরায় লুকানো রয়েছে শুধু ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন।

পাঁচ

সেদিনই বিকেল চারটের কিছু পর প্যারিস ফ্লাইট এসে পৌঁছল। কয়েক মিনিট পর পুলিস কন্ট্রোল পেরিয়ে ছোট ছোট ঝাঁকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আরোহীরা। ভিড়ের সাথে দু'জন লোক পাশাপাশি হাঁটছে, দু'জনের হাতেই একটা করে হালকা হোল্ড-অল। এদের একজন লম্বা নয়, কিন্তু চওড়ায় খুব বেশি। গোল মুখ, চোখ দুটো ছোট ছোট, তার বয়েসী তিনজন লোককে সে একাই সামাল দিতে পারে। পরনে সস্তা দামের ট্রপিক্যাল স্যুট, গায়ে ঠিকমত ফিট করেনি—বোঝাই যায়, তাড়াহুড়ো করে রেডিমেড দোকান থেকে কিনেছে। দ্বিতীয় লোকটা লম্বা, রোগা, রোদে পোড়া চেহারা। লোকটার কপাল আর মাথা বড়, মুখটা ক্রমশ সরু হয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে। নির্লিপ্ত চেহারা। তার হাঁটার ভঙ্গিতে আশ্চর্য একটা যান্ত্রিক ভাব আছে, পা দুটো ছাড়া শরীরের আর সব অংশ খুব কমই যেন সাড়া দেয়।

পুলিস কন্ট্রোল থেকে বেরিয়ে অ্যারাইভাল লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে আসার সময় মোটা লোকটার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বন্ধু এবং স্বজনদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অনেক আফ্রিকান যুবতী এসেছে, লম্বা-চওড়া মেয়েগুলোর বলিষ্ঠ গড়ন দেখে ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হলো তার। রঙচঙে কাপড় পরা মেয়েগুলোর গা ভরা গহনা, চড়ুই পাখির মত অনবরত কিচিরমিচির করে চলেছে। যেদিকেই তাকায় চওড়া লোকটা, চোখ আটকে যায়। কাকে রেখে কাকে দেখবে, তার জন্যে একটা সমস্যা হয়ে উঠল। তার রোগা পাতলা সঙ্গীটির ঠাণ্ডা তামাটে মুখ ভাবলেশহীন। মেয়েগুলোর দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। কিন্তু ফচেটের কথা আলাদা, জীবনে এই প্রথম আফ্রিকার মাটিতে পা দিল সে। চারদিকের সবকিছুই তার মনে আনন্দের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা।

'আফ্রিকানগুলো সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না,' উত্তেজিত সুরে বলল ফচেট। 'রোজ বিশটা করে ডিম খেলে তবে যদি ওদের একটাকে সামলাতে পারি। আই বাপ, কি পাছা! আর বুক? মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে থাকলে দু'পাশের নরম পাহাড় দিয়ে মাথা সুদ্ধ ঢেকে ফেলতে পারবে। এ্যাদ্দিনে একটা ভাল জায়গায় এসেছি...'

'শাট আপ!' ফচেটের দিকে তাকাল না জ্যাসন, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ গলা শুনে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল ফচেট।

হাতের ব্যাগটা ফুটপাথে নামিয়ে রেখে এদিকওদিক তাকাল জ্যাসন। লাল উর্দি পরা একজন আফ্রিকান যুবক এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'হোটেল ডি-প্যালেস, স্যার?' জানতে চাইল যুবক।

মাথা ঝাঁকাল ফচেট।

হাত তুলে অদূরে দাঁড়ানো একটা বাস দেখাল যুবক। 'পাঁচমিনিট পর ছেড়ে যাবে।'

বাসের পাশে এসে ড্রাইভারের কাছ থেকে টিকেট কিনল ওরা। বাসে উঠে দেখল, বেশিরভাগ সীটই দখল হয়ে গেছে। আরোহীদের মধ্যে প্রায় সবাই বিদেশী। জ্যাসনের পাশে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ফচেট।

গত সন্ধ্যায় রানার কাছ থেকে একটা কেবল পেয়েছে কার্ল হফার। রিপোর্টটা অস্পষ্ট, কতটুকু এগিয়েছে রানা সে-সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা দেয়নি। অসন্তুষ্ট এবং চিন্তিত হয়ে পড়ে হফার। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হিলটন হোটেলে ফচেটকে ডেকে পাঠায় সে।

'জ্যাসনের সাথে কাল সকালে তোমাকে ডাকারে যেতে হবে,' ফচেটকে বলল সে। 'রানা ওখানে কি করছে জানো। যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছে ও। তার সাথে কথা বলে আমাকে রিপোর্ট করবে।'

ভ্রমণ-সঙ্গী হিসেবে জ্যাসনকে পেয়ে মন বেজার হয়ে আছে ফচেটের। মেয়েমানুষ জ্যাসনকে টানে না। এই লোকের জীবনে ফূর্তি বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না তার। চোখে সবসময় সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি, নির্লিপ্ত চেহারায় হাসি আনন্দের স্থায়ী আকাল। সেজন্যেই তো ওর নাম দিয়েছে সে মড়াখেকো। একে নিয়ে কিভাবে সে তার এই প্রথম আফ্রিকা সফর উপভোগ করে!

বাসে করে হোটেলে যাবার পথে জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল ফচেট। সাগরের একটু ওপরে সীগাল আর গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে, সৈকত ঘেঁষে চলে যাচ্ছে ছাগলের পাল, কিনারার কাছে পানিতে ভাসছে জেলেদের ছোট ছোট প্রায় সমতল নৌকা। তারপর রাস্তার ওপর চোখ পড়ল। আঁটসাঁট সাদা ট্রাউজার পরে মার্কেটিং করছে মেয়েরা, দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। জানালা দিয়ে গলা বের করে দিল ফচেট। যতই দেখে, ততই দেখতে ইচ্ছে করে, সাধ আর মেটে না। প্রথম সুযোগেই এই সুন্দরীদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, ধৈর্য হারিয়ে হাতের তালুতে ঘন ঘন ঘুসি মারতে লাগল সে।

কিন্তু তার মনের এই আনন্দ-ঘন উত্তেজনা ভ্রমণ-সঙ্গীর সাথে ভাগ করে উপভোগ করবে, তার উপায় নেই। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে আছে জ্যাসন। চোখে পলক নেই, শরীরের কিছুই নড়ছে না। নিষ্প্রাণ এই পাষাণের মন কি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে, আদৌ কিছু ভাবে কিনা, তা ওর কাছে বিরাট এক রহস্য।

হোটেলে ঢুকে খাতায় শুধু নাম সই করতে হলো। কার্ল হফারের সেক্রেটারি আগেই টেলিফোনে ওদের জন্যে কামরা বুক করে রেখেছে।

পুলিস কার্ড পূরণ করল ওরা। কেরানীকে জিজ্ঞেস করল ফচেট, 'আপনাদের সাথে মি. ফার্নান্দেজ আছেন, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার,' ঘাড় ফিরিয়ে কী-বোর্ডের দিকে তাকাল কেরানী। 'সম্ভবত কামরাতেই আছেন।'

'দয়া করে একটু ডেকে পাঠাবেন?' অনুরোধ করল ফচেট।

ফোনের রিসিভার তুলে রানার কামরায় রিঙ করল কেরানী।

ঠিক এই মুহূর্তে অন্য কামরায় রয়েছে রানা, পাপিতাকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় পাশের কামরার টেলিফোনের বেল তার কানে পৌঁছল না। পৌঁছলেও রিসিভার ধরার জন্যে নিজের কামরায় আসত না সে।

'দুঃখিত, স্যার,' ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে বলল কেরানী। 'সাড়া পেলাম না। হতে পারে, মি. ফার্নান্দেজ হয়তো বীচে আছেন, কিংবা চাবি নিয়েই ভুলে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

'ঠিক আছে,' বলল ফচেট। 'কামরাতে আছি আমরা। ভদ্রলোক এলে আমাদের একটু খবর দেবেন।'

'অবশ্যই, স্যার।'

বিকিনি পরা কালো একটা মেয়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল। বিশ-বাইশ বছর বয়স হবে, নাক-চোখে কোন খুঁত নেই, যৌবন যেন উথলে পড়ছে। কেরানীর কাছ থেকে চাবি চাইল সে। তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল ফচেট, যেন পারলে গিলে খেয়ে ফেলে। জিভের ডগা বের করে নিচের ঠোঁট চাটল সে।

তার পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল জ্যাসন। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ফচেটের মুখ। একটা দৃশ্যের অবতারণা হবে, সেই ভয়ে কোন প্রতিবাদ করল না সে। জ্যাসনের পিছু পিছু এগোল এলিভেটরের দিকে। পাঁজরটা ডলতে ডলতে ভাবল, মৌজ লোটার এই সুযোগ কোনমতেই হারাবে না সে। শুধু জ্যাসনকে ফাঁকি দিতে পারলেই হলো।

লুডলামকে নিয়ে ছোট একটা কামরায় ঢুকল লেফটেন্যান্ট রনি পিটারসন। আসবাব বলতে খুদে একটা ডেস্ক, খানদুয়েক চেয়ার আর সবুজ একটা টেলিফোন। ফোনটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে লুডলামকে বলল সে, 'এটাই আমাদের স্ক্র্যাম্বলার ফোন। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিন দরজা, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনার আর কিছু দরকার আছে?'

'আপাতত নেই, লেফটেন্যান্ট,' চেয়ারে বসে বলল লুডলাম। 'পরে হয়তো লাগবে।'

'বলবেন।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রনি পিটারসন।

প্যারিসে, সীন ওয়াটের অফিসে ফোন করবে লুডলাম। ডায়াল করার পর পকেট থেকে একটা নোটবুক আর পেন্সিল বের করে ডেস্কের ওপর রাখল সে। তিন মিনিট পর কানেকশন পাওয়া গেল। প্যারিস থেকে পরিষ্কার ভেসে এল ওয়াটের কণ্ঠস্বর।

'লুডলাম। ডাকার দূতাবাস থেকে বলছি।' স্ক্র্যাম্বলার বাটনে চাপ দিল সে। 'আপনার ওদিকের বোতামে চাপ দিন,' অনুরোধ করল।

এক সেকেন্ড পর ওয়াট বলল, 'হয়েছে। কি ঘটেছে বলো।'

'কিছু বাদ না দিয়ে সব বলে যাচ্ছি আমি, তাহলে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কি ঘটছে,' বলল লুডলাম। একটা সিগারেট ধরাল। 'কোন প্রশ্ন করতে

চাইলে আমাকে বাধা দেবেন।' সাবধানে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমস্ত ঘটনা বলে গেল সে।

ওয়াটের নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল লুডলাম। শেষের দিকে সেটা দ্রুত, ঘন ঘন হয়ে উঠল। কাগজের খসখস আওয়াজও পেল, নোট নিচ্ছে।

লুডলামের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ওয়াট বলল, 'তোমার ওই ডেনিশ লোকটার চেহারার বর্ণনা দাও।'

'দেখার মত শরীর একখানা। ছয় ফিট চারের কম নয়, সোনালি চুল, সবুজ চোখ, খুবই সুদর্শন। কিন্তু ও যদি ডেনিশ হয়, আমি সোফিয়া লোরেন।'

অপরপ্রান্তে একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল ওয়াট। তারপর বলল সে, 'ও বুলিন। রাশিয়ার সেরা এজেন্টদের একজন। ওকে আমি দেখেছি। তোমার বর্ণনার পর আর কোন সন্দেহ নেই, ও বুলিন না হয়ে যায় না।'

'এই হলো পরিস্থিতি,' বলল লুডলাম। বুলিন সম্পর্কে আর সব সি. আই. এ. এজেন্টরা যতটুকু জানে, সে-ও তারচেয়ে বেশি বা কম জানে না। 'এখন…কি করতে বলেন আপনি?'

'তুমি ঠিক দেখেছ? ওর সাথে ছিল পাপিতা?'

'একটা গাড়িতে ওদের দু'জনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখেছি,' অধৈর্য হয়ে উঠলেও শান্ত স্বরে বলল লুডলাম। 'পাপিতা ডাবল এজেন্ট, মি. ওয়াট। সঙ্কট দেখা দিলে কোনদিকে ঝুঁকে পড়বে সে, আমার মত আপনিও সেটা আন্দাজ করতে পারেন, তাই না? এখন আমাকে কি করতে বলেন আপনি?'

প্যারিসে, নিজের অফিস কামরায় একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছে সীন ওয়াট। সামনে খোলা ফাইল, তলপেট থেকে উঠে আসছে ঠাণ্ডা, অসুস্থ একটা ভাব। পাপিতা! ডাবল এজেন্ট! এ কি করে বিশ্বাস করে সে! গত একটা বছর অন্ধের মত তাকে বিশ্বাস করেছে, তার সাথে টপ সিক্রেট সমস্যা নিয়ে কতবার আলোচনায় বসেছে। শুধু নিজে দেখা চলে এই রকম ফাইল খুলে দিয়েছে তার সামনে।

হাতের রিসিভার এত জোরে চেপে ধরে আছে সে, আঙুলগুলো ব্যথা করতে শুরু করল। ভাবল, লুডলামের ভুলও হয়ে থাকতে পারে। ওদের দু'জনকে একসাথে দেখেছে হয়তো ঠিকই, কিন্তু বুলিন হয়তো জানে পাপিতা মার্কিন এজেন্ট, আর তাই তার সাথে খাতির জমাবার চেষ্টা করেছে। দু'জনকে একসাথে দেখা গেছে বলেই পাপিতাকে ডাবল এজেন্ট মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।

কিন্তু তারপরই ওয়াটের মনে পড়ে গেল, বুলিনের বাংলোতেও গিয়েছিল পাপিতা। তারমানে একবার নয়, বুলিনের সাথে পাপিতার দু'বার দেখা হয়েছে। কমপক্ষে দু'বার। তবু, এই প্রমাণটাকেও অগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেল সে। সুদর্শন পুরুষের প্রতি বরাবর দুর্বলতা আছে পাপিতার, কে না জানে। বুলিন হয়তো একটা ফাঁদ পেতেছিল, তাতে ধরা পড়েছে সে। তার হয়তো ধারণা, বুলিন একজন ট্যুরিস্ট, তাকে নিয়ে একটু মজা করতে চায়।

'মি., ওয়াট!' অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লুডলাম। 'আমাকে

কি করতে হবে বলে দিন।'

'পাপিতা বুলিনের হয়ে কাজ করছে এর কোন নিশ্চিত প্রমাণ তোমার কাছে নেই,' নিজের ওপর অসন্তুষ্ট বোধ করাতেই বোধহয় ওয়াটের গলায় ঝাঁঝ ফুটে উঠল, বলল, 'তোমার চেয়ে ওকে আমি ভাল করে চিনি। পুরুষমানুষের ওপর কি রকম ঝোঁক ওর, তুমি জানো না। বুলিন কে তা না জেনেই হয়তো ওর খপ্পরে পড়ে গেছে।'

'কিন্তু এয়ারপোর্টে তাহলে নজর রাখছে না কেন? এখানে তো সেটাই ওর কাজ। বুলিনের সাথে গাড়ি করে ফিরে আসার পর আমাকে দেখেই তাহলে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠবে কেন?'

'এসবের নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যাখ্যা আছে,' বলল ওয়াট। 'পাপিতা রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না, লুডলাম। এ অসম্ভব।'

'আমি আপনাকে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি,' বলল লুডলাম। 'সেগুলো থেকে অর্থ বের করার দায়িত্ব আপনার…আমার নয়। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন।'

'এখুনি হোটেলে যাও, লুডলাম। পাপিতার সাথে দেখা করো। তাকে কালকের প্লেনে এখানে ফিরে আসতে বলো। বলো, এখানে তার জন্যে আমি একটা কাজ ঠিক করেছি, রিপ্লেসমেন্টের জন্যে অন্য আরেকজনকে পাঠাচ্ছি ওখানে। এমন কিছু বোলো না যাতে ওর মনে সন্দেহ হতে পারে। হাসি-খুশি ভাব দেখাবে। বলবে, প্যারিস থেকে দূতাবাসে আমি ফোন করার সময় ঘটনাচক্রে তুমি ওখানে ছিলে, আমি তোমাকে মেসেজটা পৌঁছে দিতে বলেছি।'

'ঠিক আছে, বলব। কিন্তু ধরুন, পাপিতা যদি ফিরে যেতে না চায়? ধরুন, বুলিন তাকে যেতে দিল না তখন?'

'সেক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট পিটারসনকে বলবে, ওকে যেন গ্রেফতার করে এখানে পাঠিয়ে দেয়।'

'ঠিক আছে।'

'যা যা বললাম সব ঠিকমত করতে পারবে তো?'

'পারা যায়…পারব,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল লুডলাম।

টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পাপিতার। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল সে, বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। চোখে আতঙ্ক নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

বালিশে কনুই রেখে মাথা উঁচু করল রানা, বারকয়েক চোখ মিটমিট করল, তারপর মাথা নেড়ে টেলিফোনটা দেখাল। বলল, 'কথা বলাটাই বোধহয় উচিত হবে।' হাতঘড়ি দেখল ও। ছ'টা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি।

রানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাপিতা, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল।

'এক ভদ্রলোক, নাম বলছেন রবার্ট লুডলাম, আপনার সাথে দেখা করতে চান, ম্যাডাম,' বলল ক্লার্ক।

খানিক ইতস্তত করার পর পাপিতা বলল, 'বার-এ অপেক্ষা করতে বলুন ওকে। বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

সিধে হয়ে বসল রানা, বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'কে?' গায়ে শার্ট চড়াতে চড়াতে জানতে চাইল ও।

'লুডলাম।'

'তোমার ব্যাপারে ওয়াটের সাথে কথা বলেছে ও।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।' বিছানা থেকে নামল ও, বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। শাওয়ারের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, 'বুলিন আমার ব্যাপারে এখনও কিছু জানে না, কাজেই তাকে আমি ভয় পাচ্ছি না। ভয় আমার লুডলামকেই।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা। কয়েক মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল পাপিতা, পরনে শুধু প্যান্টি আর ব্রা।

'কিভাবে কি করা দরকার শোনো,' বলল রানা।

রানা তার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছে মনে করে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাপিতার। কিন্তু ভুল ভাঙল সাথে সাথে।

'বলা যায় না, ওরা হয়তো হোটেলের ওপর নজর রাখছে। কাজেই আমি বেরিয়ে যাই। লুডলামকে বিদায় করার পরই বুলিনকে ফোন করবে তুমি।'

এগিয়ে এসে রানার পাশে বসল পাপিতা, দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। 'তুমি আমার প্রথম এবং শেষ প্রেম, রানা। তুমি জানো না, তোমার সঙ্গ পেয়ে এতদিনে আমার নারী-জন্ম সার্থক হয়েছে, এত সুখ আর কিছুতে পাইনি। এরপর আমার কি হবে না হবে আমি পরোয়া করি না।'

পাপিতার কাঁধে একটা হাত রেখে ভাল করে তার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার কিছুই হবে না।'

মুখ ফিরিয়ে নিল পাপিতা, কি যেন রানাকে দেখতে দিতে চায় না। কিন্তু রানা মুখ বাড়াতে ওকে চুমু খেতে দিল। আর মাত্র এক মুহূর্ত রানাকে জড়িয়ে রাখল সে, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্পেটে।

রানার চোখে চোখ রেখে হাসল পাপিতা। 'গুডবাই, রানা। মাঝে মধ্যে আমার কথা ভেব।'

'ব্যাপারটাকে এভাবে নাটকীয় করে তোলার কোন মানে হয় না,' বলল রানা। 'তুমি যা ভয় করছ তেমন কিছু ঘটবে না।'

'তুমি জানো না। বাঁচার কোন পথ খোলা নেই আমার। আমি শেষ হয়ে গেছি।'

'না। এত সহজে সব শেষ হয়ে যায় না।'

'কিন্তু, কই, আমার সব কথা শোনার পরও তো তুমি কোন মন্তব্য করলে না! কিভাবে বাঁচব তা যদি বলে দিতে নাও পারো, দুটো সান্ত্বনার কথাও তো শোনাতে পারতে! আমি কি এতই বড় পাপ করেছি যে...'

পাপিতাকে বাধা দিল রানা, 'পাপ নয়, মস্ত ভুল করেছ তুমি, পাপিতা। এ-ধরনের ভুলের এমন কি প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত হয় না। কিন্তু আর কেউ না বুঝুক, আমি

বুঝেছি, এসবে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে তোমার কোন স্বার্থ ছিল না। আর তাই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি করব।'

অবাক বিস্ময়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল পাপিতা। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কয়েক সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল, 'তুমি আমার ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ, রানা। কিন্তু আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, তা সম্ভব নয়। মি. ওয়াট সব জেনে ফেলেছেন। এই অবস্থায় রাশিয়ানদের কাছেও এক পয়সা দাম থাকছে না আমার। আমি এখন খরচের খাতায়। মি. ওয়াট…'

'ভয় তোমার ওয়াট বা লুডলামকে নয়, ভয় বুলিনকে।' বলল রানা ওকে থামিয়ে দিয়ে। 'ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে তোমাকে।'

'তা কেন? বুলিন তো এখনও কিছু জানে না…'

'কিন্তু জানবে। খুব দেরি হবে না।'

'কিভাবে জানবে বুঝতে পারছি না,' বলল পাপিতা। 'যাই হোক, আপাতত তুমি যদিও বা আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে, সারাজীবন আমার কাটবে কিভাবে?'

'বসো,' পাপিতার হাত ধরে তাকে বিছানায় বসাল রানা। 'যার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিই তার বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত সেই দায়িত্ব কাঁধেই রাখি আমি। তোমার বিপদটাকে আমি ছোট করে দেখছি, তা ভেব না। দায়িত্ব নিয়েছি, এখন শুধু তোমার সহযোগিতা দরকার আমার। তাহলেই তোমাকে রক্ষা করতে পারব।'

'বলো কি করতে হবে।'

'খুব মন দিয়ে শোনো কথাগুলো,' বলল রানা। 'আমি যে নির্দেশ দেব সেগুলো মেনে চললে তুমি বেঁচে যাবে। আমি এখন চলে যাব, কখন ফিরব তার কোন ঠিক নেই। চাইলেই আজ তুমি লন্ডন বা ওয়াশিংটনের প্লেনের টিকেট পাবে না। হয়তো কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে…'

'লন্ডন? ওয়াশিংটন? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'লন্ডন, ওয়াশিংটন বা অন্য কোন শহর, যেখানে রানা এজেন্সির শাখা আছে। যে-কোন একটা শাখায় গিয়ে আমার কথা বললেই ওরা কয়েকদিনের জন্যে তোমার নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করবে। হাতের কাজটা সেরে নিয়ে আমি দেখব তারপর কি করা যায়। কিন্তু প্লেনে ওঠার আগে আমার কয়েকটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে তোমাকে।'

'কি?'

'এক, এই হোটেল ছেড়ে কোথাও তুমি বেরুবে না। লুডলামের সাথে দেখা করবে বলে কথা দিয়েছ, এই হোটেলেই দেখা করবে তার সাথে। বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে যাবে না। দুই, নিজের কামরায় কাউকে ঢুকতে দেবে না। লুডলামকে অত ভয় করার কিছু নেই, কারণ তোমাকে শাস্তি দেবার অধিকার লুডলাম পেতে পারে না। কিন্তু তবু লুডলামকেও ঢুকতে দেবে না কামরায়। আসল কথা, লোকজন নেই এমন কোথাও যাবে না কারও সাথে, কেউ যেন তোমাকে

একা না পায়। তিন, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

'কি?'

'বুলিনের সাথে কোনভাবেই দেখা করবে না। ফোনে কথা বলতে পারো, কিন্তু ওর সামনে যাবে না কিছুতেই। কিছুতেই না।'

রানার শেষ নির্দেশটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল পাপিতা। ওর ধারণা, বুলিনকে শুধু শুধু বেশি ভয় পাচ্ছে রানা। বুলিন তো এখনও কিছু জানেই না। আসল ভয় লুডলামকে, কিন্তু রানা সেটা বুঝতে পারছে না। কিন্তু তর্কে না গিয়ে জানতে চাইল, 'বুলিন যদি ডেকে পাঠায়?'

'শরীর খারাপ বা অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবে,' বলল রানা। 'যাই ঘটে যাক, ওর সাথে কোনমতেই দেখা করবে না তুমি। এই নির্দেশগুলো মেনে চলো, সেনেগাল থেকে বেরিয়ে যাও, তারপর আমি সামলাব সীন ওয়াট আর বুলিনকে। বুলিন, আমি, লুডলাম—এদের মধ্যে সবচেয়ে অসুবিধের মধ্যে আছি আমি। বুলিনের সাথে অনেক লোক রয়েছে, কাজও শুরু করেছে সে আমার চেয়ে আগে—তার অবস্থা আমার চেয়ে ভাল। আর লুডলামের রয়েছে এমব্যাসির লোকজন—যদিও নির্দিষ্ট কোন মিশন নেই ওর। তাই ওর ব্যাপারে তেমন কোন চিন্তা নেই। ভয় বুলিনকে। ও কিছু করতে চাইলে আমি চেক দিতে পারব না। তাই বলছি, ওর সাথে দেখা কোরো না।'

'ঠিক আছে।' মেনে নিল পাপিতা। যদিও ওর ধারণা, বুলিনকে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে রানা, হালকা করে দেখছে লুডলামকে।

বিছানা থেকে নেমে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, সাবধানে খুলল সেটা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাপিতার দিকে, মৃদু হাসল, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দ্রুত, নিঃশব্দে পৌঁছল নিজের কামরায়।

নিজের কামরায় ফিরে এসে বেরোবার জন্যে তৈরি হলো রানা, মানিব্যাগে টাকা আছে কিনা দেখল, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকল এলিভেটরে।

নিচে নেমে রিসেপশন লবিতে চলে এল রানা। ডেস্ক ক্লার্ক চাবি নিতে গিয়ে বলল, 'মাফ করবেন, মি. ফার্নান্দেজ। দু'জন ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছিলেন। মি. ফচেট আর মি. জ্যাসন। আপনি চাইলে ওদের কামরায় ফোন করি আমি?'

বিস্ময়ের ভাবটা গোপন করে গেল রানা। ভাবল, তারমানে, কার্ল হফার খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। চিন্তিতই হয়ে উঠল ও। এই হারামী দুটো জটিল করে তুলবে পরিস্থিতি।

'না, এখুনি নয়,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে আমার একটু তাড়া আছে। ফিরে এসে দেখা করব ওদের সাথে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আমার একটা ফোন কল আসার কথা আছে,' বলল রানা। 'কেউ যদি আমার খোঁজ চায়, বলবেন, ওরিয়েন্টাল হোটেলের বারে থাকব আমি।' একশো ফ্রাঙ্কের দুটো নোট বের করে কেরানীর হাতে গুঁজে দিল ও। 'কোথায় থাকব তা যেন আমার ওপরতলার বন্ধুরা না জানে। এটা আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার কাজ,

কেউ বিরক্ত করুক চাই না।'

'ইয়েস, স্যার। আমি বুঝেছি।'

লবি থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, পাপিতাকে দেখতে পেল। কলাপাতা রঙের ফ্রক পরেছে, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে বারের দিকে এগোল। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল লবি থেকে।

বারের লাগোয়া টেরেসে পাওয়া গেল লুডলামকে। চুপচাপ বসে বিয়ার খাচ্ছে। পাপিতাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'হাই!' স্মিত হেসে জানতে চাইল, 'বিয়ার না অন্যকিছু?'

'জিন আর টনিক।' লুডলামের সামনে, খালি চেয়ারে বসল পাপিতা।

ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল লুডলাম, তারপর সহজ সুরে জানতে চাইল, 'চারটের ফ্লাইটে কেউ আসেনি?'

'না।'

'তোমার একটা মেসেজ আছে।'

জিন আর টনিক দিয়ে চলে গেল ওয়েটার। লুডলামের কথা শুনে কেমন যেন একটু শক্ত হয়ে গেছে পাপিতা। লক্ষ্য করল, লুডলাম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তার হাবভাবে কোনরকম টেনশন নেই। মৃদু স্বরে জানতে চাইল পাপিতা, 'আমার মেসেজ?'

'বিকেলে দূতাবাসে ছিলাম, এই সময় মি. ওয়াট ফোন করেছিলেন।' বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল লুডলাম। দেখল, পাপিতার হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল। 'তিনি তোমাকে প্যারিসে চান। হাতে কাজ এসেছে, তিনি চান তুমি সেটা সামলাও। তোমার জায়গায় আরেকজনকে এখানে পাঠাচ্ছেন, কালকের প্লেনেই এসে যাবে।'

'কবে ফিরতে বলেছেন আমাকে?'

'কাল।'

'প্লেনের যদি টিকেট পাই, তা নাহলে...'

'টিকেটের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর এয়ার ফ্রান্সের একটা এনভেলাপ রাখল লুডলাম। 'তোমার শুধু জিনিস-পত্র গোছগাছ করে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল পাপিতা। মনে মনে বলল প্যারিসে নয়, লন্ডনে যাচ্ছি আমি। 'যদিও এভাবে ফিরে যেতে খারাপই লাগছে। কাজটায় মোটেও সুবিধে করতে পারিনি, তাই না?' গ্লাসে একটা চুমুক দিল সে। মনে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে। পরিস্থিতি যেরকম বিপজ্জনক হয়ে উঠবে বলে ভেবেছিল, সেরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। অন্তত এখুনি নয়। সে ডাবল এজেন্ট, লুডলাম নিশ্চয়ই সেটা জানিয়েছে ওয়াটকে। কিন্তু ওদের হাতে শক্ত কোন প্রমাণ নেই।

'হ্যাঁ,' বলল লুডলাম। 'সময়েরই শুধু অপচয় হলো। তবে আমার কি ধারণা জানো? মেয়েটা কি বিক্রি করতে চেয়েছিল তা আমরা আর কোনদিনই জানতে পারব না।'

'তোমার ব্যাপারে কি বলেছেন?' জানতে চাইল পাপিতা। 'তুমি থাকছ?' গ্লাসের কিনারা থেকে উঁকি দিল পাপিতার চোখ।

'দু'চারদিন,' বলল লুডলাম। 'এমন কোন ক্লু নেই যা নিয়ে কাজ শুরু করা যায়। কিন্তু মি. ওয়াটকে তো চেনো, তিনি মিরাকল আশা করেন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'যাই। মি. ওয়াটকে বোলো, এখানে আমি অযথা সময় নষ্ট করছি—আমাকেও ডেকে নিলে ভাল করবেন।'

'ঠিক আছে।'

হাত নেড়ে বিদায় জানাল লুডলাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাপিতার চোখের সামনে থেকে।

ড্রিঙ্ক শেষ করে সিগারেট ধরাল পাপিতা। নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে বসে থাকল মিনিট পাঁচেক, চোখে সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি। তারপর ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বার থেকে। এলিভেটরে চড়ে সোজা উঠে এল নিজের কামরায়। হাতঘড়িতে এখন ছ'টা পঁচিশ। বুলিনকে ফোন করার সময় হয়েছে।

বিছানায় বসে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তার। রিসিভার তোলার সাহস পাচ্ছে না। নিচের ঠোঁটটা বার বার কামড়াল। তারপর, নিজের অজান্তেই এক সময় তুলে নিল রিসিভার। ডায়াল করার সময় লক্ষ্য করল, কাঁপছে হাতটা।

সাথে সাথে অপরপ্রান্তের রিসিভার তুলল বুলিন। 'ইয়েস?'

বুলিনের ভরাট গলা শুনে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল পাপিতার। 'মি. ফার্নান্দেজের সাথে দেখা করেছি আমি,' বলল সে, চেষ্টা করল গলার আওয়াজটাকে স্বাভাবিক রাখার। 'আমার সাথে পার্টিতে যাবার প্রস্তাব দিতে বলল, আজ কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের সাথে তার একটা জরুরী মীটিং আছে, বাতিল করা যাবে না। কথা দিয়েছে, কাল যাবে। ভাবলাম, বেশি চাপাচাপি করলে কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে, তাই আর জেদ ধরিনি। কাল যাবেই, বলেছে।'

বুলিন চুপ করে থাকল।

বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাস একটু একটু করে ছাড়তে শুরু করল পাপিতা।

অনেকক্ষণ পর নরম সুরে বলল বুলিন, 'আমি বলেছিলাম আজ রাতে।'

'জানি, কিন্তু ওর কাজ যে!'

আবার সেই নীরবতা, তারপর বলল বুলিন, 'ঠিক আছে, কি আর করা! সময় নষ্ট হচ্ছে বটে, তবে কাল রাতে হলেও চলবে। দেখো, কালও যেন আবার পিছলে না যায়।'

'যাবে না,' তাড়াতাড়ি বলল পাপিতা, বুলিন এত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিল দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল সে। 'কাল আমি ওকে যেভাবে পারি ধরে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু শোনো, তোমাকে এখুনি একবার এখানে আমার দরকার।' নরম সুর বুলিনের। 'জরুরী একটা ব্যাপারে আলাপ করতে চাই তোমার

সাথে…'

রানার নির্দেশ মনে পড়ে গেল পাপিতার। গলার স্বরে বিরক্তি টেনে বলল, 'তোমরা আমাকে পেয়েছটা কি বলো তো? একটু প্রাইভেসী, একটু বিশ্রাম—এসবও কি পেতে নেই আমার? চাকর নাকি, পয়সা নিই তোমাদের থেকে যে ডাকলেই ছুটতে হবে? পারব না। শরীর খারাপ। ঠেসে ঘুম দেব। কাল দেখা করব।' বলে আর অপেক্ষা করল না পাপিতা, ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার।

কিন্তু তারপরই ভাবল, কাজটা কি ঠিক হলো? ওর সাথে দেখা করলে হয়তো নতুন কোন তথ্য পাওয়া যেত, যা হয়তো কাজে লাগত রানার। বলল জরুরী আলাপ আছে। হঠাৎ কি এমন জরুরী ব্যাপার ঘটল! জানার জন্য ছটফট করতে লাগল বুকটা। হঠাৎ একটা উত্তেজনা অনুভব করল সে। উপলব্ধি করল, সেই পুরানো রোগটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। উত্তেজনার স্বাদ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে মন। নিষেধ থাকলেই সেটা তার ভাঙতে ইচ্ছে করে। রানার নিষেধ ভেঙে রোমাঞ্চের স্বাদ পাবার জন্যে ছটফট করছে মন।

ঠিক এই সময় আবার টেলিফোন।

রিসিভার তুলল পাপিতা। 'হ্যালো?'

'ব্যাপারটা কতটা জরুরী না বুঝেই যোগাযোগ কেটে দিলে,' গম্ভীর সুরে বলল বুলিন। 'শোনো। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছেও গেছে। চলে এসো। বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। হলো তো?' বলে কানেকশন কেটে দিল বুলিন।

ওখানেই বসে থাকল পাপিতা। হাতের রিসিভার হাতেই রয়েছে। শীত শীত করছে তার। মুখের ভেতরটা কাগজের মত শুকনো। ধড়ফড় করছে বুক। কয়েক মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। বিছানা থেকে নেমে ভাবল, বুলিন তো আমাকে সন্দেহ করেনি। কি হবে গেলে? কোন তথ্য পেলে বরং দিতে পারব রানাকে। যাব, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। বিড় বিড় করে বলল, 'কিন্তু ভয়ও লাগছে!'

জানালার সামনে দাঁড়াল পাপিতা। হোটেলের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো ক্যাডিলাক। আফ্রিকান শোফারের ফেজ টুপি কাত হয়ে আছে একদিকে, সরু বাঁশের একটা ডগা চিবাচ্ছে খুব মন দিয়ে।

থাক, এত ভয় করলে যাবার দরকার নেই, ভাবল পাপিতা। জানালার কাছ থেকে সরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ঠোঁট ফাঁক করে সামনের সারির একটা দাঁত দেখল। ভাবল, জানি, বুলিনের ওখানে গেলে আমার কোন বিপদ ঘটবে না। তবু যদি কিছু ঘটেই, সায়ানাইড ক্যাপসুলটা তো রয়েছেই। মাড়ি থেকে খসিয়ে কামড় দিলেই আমি শেষ—আমার ওপর কোন অত্যাচার করতে পারবে না।

ব্যাগ তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল পাপিতা। করিডর ধরে হন হন করে এগোল। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে শরীরের রক্ত।

ছয়

গাল ফুলিয়ে হুস্-স্ করে বাতাস ছাড়ল ফচেট, হাতের তালুতে চটাস করে ঘুসি বসাল। একঘেয়ে লাগছে তার, এসব তারই লক্ষণ। নিজের কামরায় খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখ পড়ে আছে হোটেলের গাড়ি-বারান্দা আর পার্কিং এরিয়ায়। আধঘণ্টা হয়ে গেল, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গাড়িগুলোর আসাযাওয়া লক্ষ্য করছে সে।

'কালো একটা ক্যাডিলাক,' জ্যাসনকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, 'এইমাত্র হোটেলের ভেতর এসে থামল।' লম্বা একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে জ্যাসন, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। 'একেই বলে গাড়ি! কিনলে এই রকম গাড়িই কেনা উচিত। শোফার ব্যাটা কালো ভূত, হাতে সরু বাঁশের একটা ডগা, খুব মন দিয়ে চিবাচ্ছে। মাথায় আবার একটা ফেজ। আচ্ছা, আমি যদি একটা পরি, কেমন দেখাবে বলো তো? কিনতে হবে একটা।'

খবরের কাগজের পাতা ওল্টাল জ্যাসন, ফচেটের কথা শুনছে না সে।

ঘাড় ফিরিয়ে জ্যাসনের দিকে তাকাল ফচেট। তার দিকে খেয়াল নেই দেখে চেহারায় অসন্তোষ ফুটে উঠল। বলল, 'গলা না ভিজিয়ে পারছি না আর। আসছ নাকি?'

'না,' বলল জ্যাসন।

'বারে থাকব আমি...' খোলা জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই রানাকে দেখতে পেল ফচেট। '...ওই যে মাসুদ রানা। কি মুশকিল, চলে যাচ্ছে যে!'

সোফা থেকে উঠে জানালার সামনে চলে এল জ্যাসন। একটা হাত তুলে রানার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফচেট। গাড়ি-বারান্দা পেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রানা, থামল ডি.এস.সিট্রনের পাশে। গাড়িতে চড়ে স্টার্ট দিল সে। হোটেল ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সেটা। যাচ্ছে ডাকারের দিকে।

'কি রকম হলো?' জ্যাসনের দিকে ফিরে জানতে চাইল ফচেট। 'শালা কেরানী আমাদের কথা ওকে বলেনি কেন?'

'বলেনি তা তুমি জানলে কিভাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল জ্যাসন। সিট্রনকে অনুসরণ করছে তার দৃষ্টি, অটোরুট ধরেছে রানা।

চেহারায় সন্দেহ নিয়ে জ্যাসনের দিকে তাকাল ফচেট। 'তোমার ধারণা, আমাদের সাথে বেঈমানী করছে ও?'

'কি করে বলব! তবে ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

খানিক ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল ফচেট। 'এই বদ্ধ ঘরে আটকে থাকার কোন মানে হয় না। চলো, নিচে গিয়ে বসি।'

হাতের কাগজটা ভাঁজ করে সোফার ওপর ছুঁড়ে দিল জ্যাসন, তারপর ফচেটের পিছু পিছু বেরিয়ে এল কামরা থেকে। দরজায় তালা দিয়ে এলিভেটরে

চড়ল ওরা।

ডেস্কের পিছনে আগের সেই কেরানীটি নেই। পোর্টারকে জিজ্ঞেস করে বার-টা কোন্‌দিকে জেনে নিল ফচেট। বারে ঢুকে নিজের জন্যে স্কচ হুইস্কির অর্ডার দিল সে, জ্যাসন বিয়ার চাইল।

হুইস্কি প্রায় শেষ করে এনেছে ফচেট, এই সময় বারে ঢুকে একজন পোর্টার জানতে চাইল, 'মি. ফার্নান্দেজ আছেন? মি. ফার্নান্দেজের টেলিফোন!'

সাথে সাথে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফচেট। 'কোথাও যেয়ো না,' জ্যাসনকে বলে ধীর পায়ে এগোল সে, বেরিয়ে এল লবিতে। দেখল, কেরানীদের একজন একটা ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে অপেক্ষা করছে, সন্ধানী চোখে তাকাচ্ছে লবির চারদিকে। এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল ফচেট, ছড়িয়ে থাকা রঙিন পোস্টকার্ডগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল সে।

রানাকে কোথাও না পেয়ে লবিতে ফিরে এল পোর্টার। নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে।

কানে রিসিভার তুলে কেরানী বলল, 'দুঃখিত, স্যার। মি. ফার্নান্দেজ বেরিয়ে গেছেন।' অপরপ্রান্তের কথা শুনল কিছুক্ষণ, তারপর আবার বলল, 'এক মিনিট, স্যার।' একটা নোটবুক খুলে পাতা ওল্টাল সে। 'ইয়েস, স্যার। একটা মেসেজ রেখে গেছেন। মি. ফার্নান্দেজ ওরিয়েন্টালে থাকবেন।'

কেরানী রিসিভার নামিয়ে রাখার কয়েক সেকেন্ড পর লবি থেকে হোটেলের বাইরে, গেটম্যানের সামনে এসে দাঁড়াল ফচেট। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওরিয়েন্টাল কি, কোথায় জানো?'

'ডাকারে, স্যার। হোটেল।'

'ওখানে যেতে চাই,' বলল ফচেট। 'তুমি আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ঠিক করো।'

'ঠিক আছে, স্যার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাবেন।'

'আমি বারে আছি,' বলে দ্রুতপায়ে জ্যাসনের কাছে ফিরে এল ফচেট। ইঙ্গিতে ওয়েটারকে আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্ক দিতে বলল সে। 'রানার ফোন এসেছিল। ওরিয়েন্টাল হোটেলের পথে রয়েছে ও। ওটা ডাকারে। ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে এসেছি। আরেকটা বিয়ার নেবে নাকি?'

মাথা নাড়ল জ্যাসন।

ওয়েটার আসতে দেরি করছে দেখে অধৈর্য হয়ে উঠল ফচেট। সিগারেট ধরাল একটা। ওয়েটার আসতে বিল মিটিয়ে দিল সে। তারপর গ্লাসে দ্রুত কয়েকটা চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল। জ্যাসনকে পিছনে নিয়ে হোটেলের বাইরে, ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়াল সে।

গেটম্যানকে বকশিশ দিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ল ওরা। ডাকারের দিকে ছুটল ট্যাক্সি।

ওরিয়েন্টালের বারে ঢুকে থমকে দাঁড়াল রানা। কে যেন ওর ছদ্মনাম ধরে ডাকছে। এদিক-ওদিক তাকাতে দেখতে পেল তাকে। একজন আফ্রিকান পেজবয়। চিৎকার

করে আবার বলল, 'মি. ফার্নান্দেজ, প্লীজ, আপনার টেলিফোন।'

এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার সামনে দাঁড়াল রানা, বলল, 'আমি।' তারপর তার হাতে দশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট গুঁজে দিল ও।

'বাঁ দিকের প্রথম বুদটা, স্যার,' বলল পেজবয়, হাত তুলে দেখাল।

বুদে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। ক্রেডল থেকে নামানো রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যালো, ফার্নান্দেজ বলছি।'

'মাসুদ রানা!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল চেস্টন পোলো। 'ভাবছিলাম, আপনাকে বোধহয় হারিয়েই ফেললাম। শুনুন, আপনার সাথে আরেকবার কথা বলতে পারলে মন্দ হয় না।'

'বেশ তো।'

'আপনার সাথে গাড়ি আছে?' জানতে চাইল পোলো।

'আছে।'

'দিউগবেল-এ আসতে পারবেন?'

'পারব।'

'চমৎকার,' বলল পোলো। 'কিন্তু সাবধানে আসতে হবে আপনাকে। কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? শহরে ঢোকার মুখে গাছ দিয়ে ঘেরা বড়সড় একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পাবেন, ওখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে গাড়ি। হলুদ রঙের একটা ফিয়াট। ন'টার সময় আপনাকে আশা করতে পারি, মি. রানা?'

'পৌঁছে যাব,' বলল রানা।

'ভেরি গুড, মি. রানা,' বলল পোলো। 'গুডলাক।'

বারে ফিরে এল রানা। কফির অর্ডার দিয়ে হাতঘড়ি দেখল। তাড়াহুড়ো করে ডিনারটা কোথাও থেকে সেরে নেয়া যায়।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, এই সময় আবার ওর নাম ধরে কে যেন ডাকল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। একেবারে কাছে চলে এসেছে ফচেট আর জ্যাসন। বো করল ফচেট, বলল, 'আবার দেখা হলো, গুরু! তবিয়ত ভাল তো?'

প্রমাদ গুণল রানা।

হোটেল ডি প্যালেস থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লুডলাম, ওকে পাশ কাটিয়ে কালো ক্যাডিলাকটা ঢুকল হোটেলের ভেতর। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করল লুডলাম। হাতঘড়ি দেখে একটা সিগারেট ধরাল।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, দেখল, পাপিতাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে ক্যাডিলাক। সন্ধে হয়ে এসেছে, পিছনের সীটে বসা পাপিতাকে ভাল করে দেখতে পেল না সে, কিন্তু মেয়েটা যে পাপিতা সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। মনে আছে, ক্যাডিলাক যখন হোটেলের ভেতরে ঢুকল, পিছনের সীটে কেউ ছিল না।

সিমকাকে পাশ কাটিয়ে অটোরুটের দিকে ছুটে চলল ক্যাডিলাক। স্টার্ট দেয়াই ছিল, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল লুডলাম।

অটোরুট ছেড়ে একটা শাখা-রোড ধরল ক্যাডিলাক। কাফসকুর দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। পিছনে ফেউ লেগেছে টের পেয়ে যেতে পারে পাপিতা, তাই মেইন রোড ধরে যেমন যাচ্ছিল তেমনি যেতে লাগল সে, তারপর ক্যাডিলাক চোখের আড়াল হতেই দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিয়ে আবার পিছু নিল সিমকা।

গাড়ি চালাতে চালাতে লুডলাম ভাবল, প্যারিসে ফিরে যাবার হুকুম হয়েছে এ-কথা কি বুলিনকে বলবে পাপিতা? যদি বলে, বুলিনের প্রতিক্রিয়া কি হবে?

বালি ঢাকা একটা পথে চলে এল সিমকা। ম্যাপে এই পথটাই তাকে দেখিয়েছিল লেফটেন্যান্ট পিটারসন। সামনে ধুলোর পাহাড়, ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসছে রাস্তার ওপর—দেখে বোঝা যায়, এই পথ দিয়ে খানিক আগে গাড়ি গেছে। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখল একবার। অকারণে ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। গাড়ি নিয়ে বাংলোর সামনে দিয়ে না যাওয়াই ভাল। তারচেয়ে অপেক্ষা করবে সে।

গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে এসে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল লুডলাম। রাত হয়ে গেছে, রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একটা গাছের গোড়ায় বসল সে। দেখা যাক কি হয়।

গাড়ির দরজা খুলে দিতেই নেমে পড়ল পাপিতা। সারাটা পথে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই প্রশ্ন করেছে সে—কেন ডেকেছে বুলিন? এর কোন উত্তর খুঁজে পায়নি সে। তাকে সন্দেহ করেছে বুলিন? রানার সাথে ঘন ঘন দেখা করছিল সে? বুলিন কি বুঝতে পেরেছে কাল সেনেগাল ছেড়ে চলে যাবার প্ল্যান করেছে সে?

দূর, এসব কিছু নয়। নিজেকে সান্ত্বনা দিল পাপিতা। হয়তো তার জন্যে অন্য কোন কাজ ঠিক করেছে বুলিন।

ধীর পায়ে হলে ঢুকল সে, সেখান থেকে বড় ঘরে।

ঘরে বুলিন একা, মস্ত একটা ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে রয়েছে। একটা সাদা শার্ট পরেছে সে, সুন্দর ফিট করা গ্রে রঙের ট্রপিক্যাল স্যুটে দারুণ মানিয়েছে তাকে। তার পাশেই একটা সাদা টেবিল, তাতে অনেকগুলো কেবল। সেগুলোরই একটার কোড ভাঙছিল সে। পাপিতার পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল। চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি, চেহারা ভাবলেশহীন।

'এই হয়ে এসেছে,' বলল সে।

হাত ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল পাপিতা। মিনিটগুলো এক দুই করে পেরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত কাজ করছে বুলিন, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। অবশেষে কোড ভাঙা শেষ করল সে। ইজি চেয়ার থেকে নেমে একটা কাঠের চেয়ারে বসল। তারপর তাকাল পাপিতার দিকে। 'আরে, দাঁড়িয়ে কেন? বসো।' চোখ-ইশারায় একটা চেয়ার দেখাল সে।

কয়েক পা এগিয়ে এসে চেয়ারটায় বসল পাপিতা।

'টেলিফোনে কি যেন বললে?' জানতে চাইল বুলিন, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না। 'রানার সাথে দেখা করেছ, কিন্তু তোমার সাথে আসতে রাজি হয়নি

সে। কেন? কেন আসতে রাজি হলো না?'

'তাও বলেছি তোমাকে,' বলল পাপিতা। 'বলল, তার একটা বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'সেই বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কি, আন্দাজ করতে পেরেছ?'

'চেস্টন পোলো?'

'একশো বার। রানা জানে, কাল রাতে এখানে নিয়ে আসার জন্যে তাকে তুমি পাবে না। কারণ, তার আশা, ততক্ষণে ওয়েন প্যাকারের উদ্দেশে তাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে পোলো।'

পাপিতা কোন কথা বলল না।

'তবে, ওয়েন প্যাকারের কাছে পৌঁছুতে হবে না রানাকে,' বলল বুলিন। 'তার পেছনে চারজনের একটা গ্রুপ লাগিয়েছি আমি। সুযোগ পাওয়া মাত্র খুন করবে।'

রানা খুন হবে, শুনেই বুকটা টন টন করে উঠল পাপিতার। কয়েক সেকেন্ড এমন দিশেহারা বোধ করল, সামনে বসে থাকা বুলিনকে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পেল না সে। তবে মনের ভেতর যা-ই ঘটুক, চেহারাটা সরল, নির্বিকার করে রাখতে পারল।

'তুমি কি দুঃখ পাবে?' জিজ্ঞেস করল বুলিন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাপিতার দিকে।

চমকে উঠল পাপিতা। 'দুঃখ পাব? দুঃখ পাবার আমার কি দায় পড়েছে!'

হঠাৎ করে বুলিনের চোখে অশুভ একটা আলো ঝিক্ করে উঠতে দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল পাপিতার।

'না, এমনি ভাবছিলাম আর কি,' বলল বুলিন। 'কেন যেন মনে হলো, রানা মারা গেলে তুমি দুঃখ পাবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গিয়ে থামল একটা কাবার্ডের সামনে। ভেতর থেকে একটা টেপ-রেকর্ডার বের করল সে। সেটা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর প্লাগটা ঢোকাল সুইচবোর্ডের একটা সকেটে।

টেপ-রেকর্ডারের সুইচ অন করার আগে পাপিতার দিকে তাকাল বুলিন। মুচকি হাসল একটু। বলল, 'তোমার লাগবে কিনা জানি না, আমার কিন্তু ভারি মজা লেগেছে।' বলে সুইচ অন করে দিল।

রেকর্ডারের স্পীকার থেকে বেরিয়ে আসা নিজের গলা শুনতে পেল পাপিতা, 'তুমি কে আমি জানি। তুমি মাসুদ রানা।'

চোখ বন্ধ করল পাপিতা। অনুভব করল, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে যাচ্ছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান দুটো, ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে শরীর। 'ঠিক আছে, আমি ধরা পড়ে গেছি, এবার দয়া করে বন্ধ করো ওটা! আমি শুনতে চাই না।'

বুলিনের চেহারায় নিষ্ঠুর কৌতুক ফুটে উঠল। বলল, 'কিন্তু আমি চাই তুমি শোনো।'

টেপ-রেকর্ডার থেকে রানার গলা বেরিয়ে আসছে এখন, 'থামলে কেন? আমি কিছু বলার আগে তোমার সব কথা শুনতে চাই।'

'বন্ধ করো, প্লীজ!'

'না, আমরা শুনব,' বলল বুলিন। 'শেষ দিকে দারুণ মজা আছে। তোমার চিৎকার, গোঙানি, রানা-রানা করে কান্নাকাটি, উহু, তুলনা হয় না!'

এখানেই পথের শেষ, ভাবল পাপিতা। কি বোকা সে! কপালে মরণ থাকলে বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়। কামরাটা পরীক্ষা করার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি তার। এই গাফিলতির ক্ষমা নেই। হাত তুলে কান দুটো ঢাকল সে, শুনতে চায় না কিছু। মৃত্যু আসছে, মনে হতেই শিউরে উঠল সে। আজ হঠাৎ করে মনে হলো, জীবন তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। মরতে তার ভয় করে। কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে, এমন এক লোকের হাতে এসে পড়েছে সে, যার মনে দয়া বলে কিছু নেই, যে ক্ষমা করতে জানে না।

কখন থেমে গেছে রেকর্ডার, বলতে পারবে না পাপিতা। হঠাৎ খেয়াল হলো, ঘরের ভেতর জমাট বেঁধে রয়েছে নিস্তব্ধতা। কান থেকে হাত দুটো নামাল সে। দেখল, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুলিন, হাত দুটো কোমরে, সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে।

'সত্যি অবাক হয়েছি,' বলল বুলিন। 'তোমার মত বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে এমন একটা লোকের প্রেমে কি করে পড়ো, পরিবর্তে যে ভালবাসতে জানে না?' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বুঝতেই পারছ, তুমি শেষ হয়ে গেলে। একদিক দিয়ে বিচার করলে, তোমাকে আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস তুমি কখনোই অর্জন করতে পারোনি। তুমি আসলে একটা বেশ্যা। এর আগেও যে-সব লোকের সাথে শুয়েছ তুমি, তাদের একটা তালিকা আছে আমাদের কাছে। আমরা জানতাম, আগে হোক পরে হোক, বোকার মত কারও না কারও প্রেমে পড়বে তুমি, এবং নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে। ঠিক তাই ঘটেছে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'এসো আমার সাথে।'

প্রতিবাদ করবে, সে-শক্তি নেই পাপিতার। খেলনা পুতুলের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। বিড় বিড় করে জানতে চাইল, 'আমাকে নিয়ে কি করার কথা ভেবেছ তুমি?'

'দেখতে পাবে। এসো।' ঘুরে দাঁড়াল বুলিন, দরজার দিকে এগোল।

মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠল পাপিতা, ইচ্ছে হলো দৌড় দেয়, বুলিনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় কামরা থেকে, তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু জানে, তা সম্ভব নয়। দরজা পর্যন্তও পৌঁছুতে পারবে না সে। ধরতে যদি নাও পারে, গুলি করে থামাবে বুলিন।

তারচেয়ে, যদি মরতেই হয়, মর্যাদার সাথে মরবে সে।

হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে বুলিনের পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে এল পাপিতা। হল পেরিয়ে এসে ছোট একটা বেডরুমে ঢুকল ওরা। পাপিতাকে ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়াল বুলিন।

ঘরের মাঝখানে বিছানা, আর দেয়াল ঘেঁষে খাড়া পিঠের একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই কামরায়। জানালায় কাঠের শাটার, তালা দেয়া।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাপিতা, থরথর করে কাঁপতে থাকা পায়ের পেশীগুলোকে স্থির করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। হাত দুটো পিছনে লুকিয়ে রাখল, বুলিন যাতে দেখতে না পায় ওগুলো কাঁপছে।

দরজা বন্ধ করে কবাটের গায়ে হেলান দিল বুলিন। 'যা বলব তা যদি করো, তোমার মঙ্গল হবে,' বলল সে। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না, প্লীজ।' একটু থামল সে, তারপর ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'তোমার পরনের কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলো।'

শিউরে উঠল পাপিতা, ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'না!'

'বাগানে কাজ করে পাঁচজন আফ্রিকান,' বলল বুলিন, চেহারায় ক্লান্তি। 'কথা না শুনলে ওদেরকে ডাকতে বাধ্য হব। তোমার কাপড় খোলার অর্ডার পেলে হাতে স্বর্গ পাবে ওরা। নিশ্চয়ই তুমি সেটা চাও না? তারচেয়ে যা বলছি, শোনো। সব খুলে ফেলো, প্লীজ।'

মাড়ির সাথে সেঁটে থাকা কাঁচের ক্যাপসুলে জিভের ডগা ঠেকাল পাপিতা, ইতস্তত করতে লাগল। কাঁচ ভেঙে তরল বিষটুকু গিলে ফেলবে এখুনি? নাকি আরও একটু দেখবে? এমন কি নিস্তার নেই বুঝতে পারার এই মুহূর্তেও তার মনে হলো, জীবন বড় আনন্দময়, সে মরতে চায় না।

প্রাণের মায়া কার না আছে! সম্ভ্রম, মর্যাদা এসব কথা ভুলে গিয়ে কাঁপা হাতে কাপড় খুলতে শুরু করল পাপিতা। কাপড় খুলছে আর মাঝে মধ্যে মুখ তুলে তাকাচ্ছে বুলিনের দিকে।

বুলিনের চেহারায় নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ভাব দেখে আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠল পাপিতা। বুলিনের চোখে না আছে কোন কৌতূহল, না আছে কোন লালসা। ডাক্তার যেমন রোগীকে পরীক্ষা করার সময় নির্বিকার থাকে, বুলিনও সেই রকম বিকারহীন।

সব কাপড় খুলে ফেলল পাপিতা, ঠাণ্ডায় সারা শরীরে কাঁটা দিল। ওর দিকে তাকাতেই একটা হাত তুলে বিছানাটা দেখাল বুলিন, বলল, 'ওখানে শুয়ে পড়ো।'

বিছানায় বসে পড়ল পাপিতা, দু'হাত দিয়ে বুক ঢেকে আবেদন ভরা চোখে তাকাল। 'গুলি করে মেরে ফেলতে পারো না? আমার সাথে এই আচরণটা না করলেই কি নয়? এক সময় আমি তোমাদের কাজে লেগেছি। আমি…'

'শোও, প্লীজ।'

বালিশে মাথা দিল পাপিতা। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল বুলিনের শরীরে। কি ঘটছে কিছু বুঝতে পারার আগেই পাপিতার পা জোড়া দুটো হ্যান্ডকাফের ভেতর আটকে দিল সে। খাটের পায়ার সাথে আটকানো রয়েছে হ্যান্ডকাফ জোড়া, আগে লক্ষ্য করেনি পাপিতা।

ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর চিৎকার জুড়ে দিল পাপিতা, ওকে ছুঁতে নিষেধ করছে বারবার। উঠে বসার চেষ্টা করল সে, পারল না। বিছানার মাথার দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বুলিন। পাপিতার কব্জি দুটো আরেক জোড়া হাতকড়ার সাথে আটকে দিল।

পিছিয়ে এল বুলিন। সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকাল। বিছানার ওপর হাত-পা

মেঝে পড়ে আছে পাপিতা।

'তোমাকে এখানে রেখে চলে যাচ্ছি আমি,' বলল সে। 'জরুরী একটা কাজে যাবার কথা, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আমার চাকর-বাকরদের বলেছি, আমার অনুপস্থিতিতে ওরা যেন তোমাকে যেভাবে খুশি কাজে লাগায়। এতে তোমার দুঃখ পাবার কিছু নেই—একজন বেশ্যার জীবনযাপন করেছ, কাজেই সেভাবেই মরতে হবে তোমাকে।'

অসহায় অবস্থায় শুয়ে থাকল পাপিতা। হাঁপাচ্ছে আর গলায় উঠে আসা চিৎকারটাকে চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'তুমি যদি বোকা হতে, তাহলে হয়তো তোমার ওপর এতটা রাগতাম না আমি,' বলল বুলিন। 'তুমি অতি চালাক, কাজেই তোমার শাস্তি একটু মজার, একটু ব্যথার, একটু অবমাননাকর হওয়া উচিত। যাই বলো, এর জন্যে কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারো না তুমি। ভেবে দেখো, আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে? তাহলে হয়তো একটু সান্ত্বনা পাবে।'

পাপিতার চোখের কোণ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'প্লীজ, তারচেয়ে আমাকে গুলি করো, প্লীজ!'

মুচকি হাসল বুলিন। 'তা হয় না, পাপিতা। তুমি আমার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছ।'

ফুঁপিয়ে উঠল পাপিতা।

'সংখ্যায় ওরা সাতজন,' আবার বলল বুলিন। 'সবাই ওরা স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন যদি নাও হয়। তবে, কেউই তেমন পরিষ্কার নয়, দুঃখিত। ওরা জানে, আজ রাতে এখানে আমি আর ফিরব না। সন্দেহ নেই, ওরা ওদের ভাই-বেরাদার আর বন্ধু-বান্ধবদের বলবে, এই ঘরে কি পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাতটা তোমার খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। একজন বেশ্যা এরচেয়ে ভাল আর কিভাবে মরতে চাইতে পারে! আশা করি তুমি আমার সাথে একমত হবে।'

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল পাপিতা। চোখ থেকে পানি গড়ানো বন্ধ হলো। চিৎকারটাকে চেপে রাখার জন্যে এখন আর নিজের সাথে যুদ্ধ করছে না। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করল সে।

ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই। তারপর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনল সে। চোখ মেলে দেখল, বুলিন চলে গেছে।

শেষ একটা চেষ্টা করল পাপিতা। কিন্তু হাতকড়া খোলার জন্যে মোচড় দিতে গিয়ে আরও শক্তভাবে আটকে ফেলল সেগুলো।

কয়েকজন লোকের অস্পষ্ট গলা পেল পাপিতা। একটু পর ক্যাডিলাক স্টার্ট নেবার আওয়াজ ভেসে এল। তারপর সব চুপচাপ।

দু'মিনিট পর ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল দরজা। একটু ফাঁক হলো কবাট। সরু, ছুঁচোর মত একটা মুখ উঁকি দিল ঘরের ভেতর। সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল পাপিতা।

কামড় দিল কাঁচের ক্যাপসুলে।

সাত

মনে মনে প্রমাদ গুণলেও, নিঃশব্দ হাসিতে চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার। চেয়ারে হেলান দিল ও, উরুর ওপর চটাস করে চাপড় দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল, বলল, 'আরে, তোমরা কোত্থেকে!' জ্যাসনকে এড়িয়ে গেল ও, ওর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে পাথরের মূর্তিটা। 'সব খবর ভাল তো? নিশ্চয়ই এইমাত্র এসে পৌঁছুলে?'

রানার পাশে একটা চেয়ারে বসল ফচেট, ইঙ্গিতে বারম্যানকে ডাকল। 'স্কচ হুইস্কি,' দরাজ গলায় অর্ডার দিল সে। তারপর ফিরল রানার দিকে। 'বসের ট্রাউজারে পিঁপড়ে ঢুকে পড়েছে, অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। জানতে চান, কি করছ তুমি এখানে।' ওয়েটারের হাত থেকে ড্রিঙ্ক নিয়ে সশব্দে চুমুক দিল সে। 'আসলেও, ঠিক কি করছ তুমি এখানে, রানা?'

দ্রুত চারদিকে একবার চোখ বুলাল রানা। জানতে চাইল, 'এখানে আলাপ করাটা কি ঠিক হবে?'

রানাকে অনুসরণ করে ফচেটও চারদিকে তাকাল একবার। এক কোণে একটা খালি টেবিল রয়েছে, সেদিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইল, 'চলো তাহলে, ওখানে গিয়ে বসি।'

কথা না বলে কফির কাপ হাতে নিয়ে উঠে পড়ল রানা, ওরা দু'জন অনুসরণ করল ওকে। কোণের টেবিলে এসে তিনজন তিনটে চেয়ার দখল করল।

'মি. হফারকে কমপ্লিট রিপোর্ট দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেবলে তা সম্ভব নয়। টেলিফোনে যে কথা বলব, সেটাও নিরাপদ নয়।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে গলার আওয়াজ আরও খাদে নামাল রানা। 'রাশিয়ানরা এর সাথে জড়িত, তা জানো? শুধু এই ডাকারেই তাদের দু'জন এজেন্ট রয়েছে, সারাক্ষণ নজর রাখছে আমার ওপর। ওদের চোখে ধরা না পড়ে কাজ করছি আমি, কিন্তু সেজন্যে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে।'

ফচেটের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বলল, 'ওরা জানে তুমি কে?'

'তা তো জানেই, এমন কি আমি যে মি. হফারের হয়ে কাজ করছি তা-ও জানে। আরেকটা ব্যাপার। সীন ওয়াটও তার একজন লোককে এখানে পাঠিয়েছে। সে-ও আমার পেছনে লেগে আছে।'

'তার মানে খুব মজায় আছ দেখছি!'

'বুঝে নাও। গোটা সেট-আপটাই জটিল। ওয়েন প্যাকারের কন্ট্যাক্টকে আমি পেয়েছি। একজন পর্তুগীজ। তার ধারণা, আমি সীন ওয়াটের হয়ে কাজ করছি। আজ রাতে তার সাথে আমার ডেট আছে, আমার ধারণা সে আমাকে ওয়েন প্যাকারের কাছে নিয়ে যাবে।'

'বলো কি!' খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠল ফচেট। 'তাহলে তো অর্ধেক কাজ

সেরেই ফেলেছ হে! বস্ তো তাই চান!'

'কিন্তু ব্যাপারটা একা আমার সামলাতে হবে, ফচেট। পোলো যদি তোমাদের দু'জনকে আমার সাথে দেখে, স্রেফ বেঁকে বসবে। এমনিতেও আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি সে।'

'তাহলে?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল ফচেট।

'তোমরাই ঠিক করো,' বলল রানা। 'পরামর্শ চাইলে আমি বলব, পোলোর চোখে পড়ো না তোমরা। আমি যাই, কথা বলি পোলোর সাথে, সে আমাকে ওয়েন প্যাকারের কাছে নিয়ে যাক। মি. হফার যেটা চান, সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব আমি।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে ইতস্তত করতে লাগল ফচেট। বলল, 'কি করা যায় বুঝতে পারছি না। বস্ বলেছেন···'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিয়ে ফচেটকে থামিয়ে দিল জ্যাসন। রানার দিকে তাকাল সে। তার সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করল রানা। 'আমরা তোমার সাথে থাকব। বস্ বলেছেন, এখন থেকে তিনজনকে একসাথে কাজ করতে হবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই। বস্ ওই কথাই বলেছেন, গুরু,' দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ফচেট। 'আমরা না হয় পোলোর চোখের আড়ালে থাকলাম, কিন্তু তুমি আমাদের চোখের সামনে থাকবে। এতে তোমার আপত্তি করার কথা নয়।'

'আমাকে চোখে চোখে রাখবে, অথচ পোলো তোমাদের দেখতে পাবে না, কিভাবে তা সম্ভব?' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'বললাম না, পোলো তোমাদেরকে দেখতে পেলে বেঁকে বসবে, সাহায্য করতে রাজি হবে না।'

'সেক্ষেত্রে ওকে আমি বাধ্য করব,' বলল জ্যাসন।

কড়া ভাষায় কিছু বলতে গিয়েও বলল না রানা। ভাবল, হফার যা বলে দিয়েছে এরা তা করবেই। ঠিক আছে, থাকুক সাথে। হঠাৎ করে যদি উদয় হয় বুলিন, এরা তখন কাজে লাগবে। তারপর এদেরকে যখন ফাঁকি দেবার দরকার হবে, কি করা যায় দেখা যাবে তখন। বলল, 'বেশ, তোমাদের কথাই থাক। দিউগবেলে ন'টায় দেখা হচ্ছে আমার সাথে পোলোর। এখান থেকে গাড়ি পথে এক ঘণ্টা লাগবে। তোমরা যদি একান্তই আমার সাথে যাও, ওর সাথে আমি যখন দেখা করব তোমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। সম্ভব কিনা তোমরাই জানো। কিন্তু আমার কথা বুঝতে পেরেছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল ফচেট। 'এর মধ্যে বোঝার কিছু নেই। কাজের কথা অনেক হয়েছে, এবার ক্ষান্ত দাও। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে আমার, এদিকে কোথাও ভাল হোটেল আছে কিনা জানো?'

'হাতে আর বেশি সময় নেই,' বলল রানা। 'খেতেই যদি চাও, হালকা কিছু খেতে হবে। এসো, সামনের মোড়েই একটা কাফে-বার আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তার ওপারে রোগা-পাতলা একজন আফ্রিকান দাঁড়িয়ে ছিল, পরনে ঢিলেঢালা ইউরোপিয়ান স্যুট। লোকটা ওদের পিছু

নিল।

কাফে-বারে ঢুকল ওরা তিনজন। রোগা-পাতলা আফ্রিকান সেটা দেখল। কয়েক পা এগিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল সে। সামনেই পুরানো একটা বুইক দাঁড়িয়ে আছে।

বুইকের ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে জাহের। ঠোঁটে সিগারেট। পিছনের সীটে রয়েছে আরও দু'জন আফ্রিকান, তারাও স্যুট পরে আছে। রোগা-পাতলা আফ্রিকান জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিতে এরা সবাই তারদিকে তাকাল।

দ্রুত কথা বলল পাতলা লোকটা। সে থামতেই সবিস্ময়ে জানতে চাইল জাহের, 'বলো কি! তিনজন!' পিছনে বসা সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'ব্যাপারটা কি? রানার সাথে ওরা দু'জন কোত্থেকে এল? ওরা কারা?'

'নিশ্চয়ই রানাকে নিয়ে যাবার জন্যে জাহান্নাম থেকে এসেছে,' খিক খিক করে হেসে উঠে বলল একজন, তার নাকের পাশে চওড়া একটা শুকনো ক্ষতের দাগ। 'তিনজন কেন, ত্রিশজন হলেও চিন্তা করি না, এটা যতক্ষণ হাতে আছে।' উরুর ওপর ফেলে রাখা সাব-মেশিনগানের গায়ে হাত বুলাল সে।

'উঠে পড়ো,' রোগা-পাতলাকে বলল জাহের।

স্টার্ট নিল গাড়ি। তারপর বেরিয়ে এল গলি থেকে। কাফের সামনে দিয়ে এগোল ওরা। ভেতরে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল রানাকে, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্যান্ড-উইচে কামড় দিচ্ছে। ওর সাথে আরও দু'জন লোক রয়েছে, কিন্তু তাদেরকে ভাল করে দেখার সুযোগ হলো না জাহেরের।

আরও খানিক সামনে রাস্তার ধারে পাওয়া গেল গাড়ি পার্ক করার জায়গা। পাতলা মিঞা নেমে গেল গাড়ি থেকে। ফিরতি পথে হাঁটা ধরে কাফের উল্টোদিকের ফুটপাথে পৌঁছে থামল সে। পাঁচিলে হেলান দিয়ে পকেট থেকে একমুঠো বাদাম বের করল।

পৌনে আটটায় স্যান্ড-উইচের দাম মিটিয়ে দিয়ে ফচেটের দিকে তাকাল রানা। 'চলো। কাছেই আমার গাড়ি।'

কাফে থেকে বেরিয়ে এসে সিট্রনের দিকে হাঁটছে ওরা, তাড়াহুড়ো করে বুইকের কাছে ফিরে এল পাতলা। গাড়িতে উঠে বসল সে, সাথে সাথে বুইক ছেড়ে দিল জাহের। বাঁক নিতে শুরু করেছে সিট্রন, সেটার পিছু নিল সে। রাস্তায় যানবাহন খুব কম নয়, সিট্রনের আরোহীরা সহজে বুঝতে পারবে না তাদের পিছু নেয়া হয়েছে। কিন্তু ফাঁকা রাস্তায় এই সুযোগ পাওয়া যাবে না।

চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল রানা। অটোরুটে পৌঁছে বলল, 'পেছনে লক্ষ্য রেখো। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে আগে তাকে খসাতে হবে।'

চওড়া শরীর নিয়ে সীটের ওপর খানিকটা ঘুরে বসল ফচেট, ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিনটে প্রাইভেট কার আর একটা ট্রাক রয়েছে পেছনে।'

সিট্রনের স্পীড কমিয়ে আনল রানা। 'কারগুলোকে ওভারটেক করতে দেয়া যাক।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সগর্জনে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল দুটো গাড়ি।

'ট্রাক আর একটা কার,' বলল ফচেট। 'কারটা ট্রাকের পেছনে।'

'লক্ষ্য রাখো,' বলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল রানা।

এক মিনিট পর ফচেট বলল, 'ট্রাকের পেছন থেকে সামনে চলে আসছে কার। হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে, মনে হচ্ছে আমাদের পেছনে আসতে চায়।'

পরবর্তী দশ মিনিট খুব জোরে গাড়ি চালাল রানা, তারপর আবার গতি কমিয়ে আনতে শুরু করল। 'বাঁকের কাছে আসছি আমরা,' বলল ও। ব্রেকে সামান্য একটু চাপ দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রুফিস্কু-দিউগবেল রোডে ঢুকে পড়ল।

মিনিট কয়েক পর ফচেট বলল, 'আর বোধহয় কোন সন্দেহ নেই, গুরু। বাঁক নিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসছে কারটা।'

গতি মন্থর করে আনল রানা।

'ওটাও স্পীড কমাচ্ছে,' বলল ফচেট। 'ঠিক ক'জন লোক বোঝা যাচ্ছে না, তবে আছে বেশ কয়েকজন।'

'রুফিসকু-তে থামব আমরা। দেখা যাক কি করে ওরা।' আবার স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা।

'রুফিসকুর ব্যস্ত মেইন রোডে পৌঁছে গাড়ি থামাল রানা। দরজা খুলে নেমে পড়ল ও। শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল একটা সিগারেটের দোকানের সামনে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনছে, দেখল, ধুলো মাখা একটা বুইক দ্রুত বেগে চলে গেল। গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে ভেতরে চারজন লোককে বসে থাকতে দেখল ও।

সিট্রনে ফিরে এসে জানতে চাইল রানা, 'ওই গাড়িটাই?'

'হ্যাঁ।'

'হাতে সময় কম। তবু মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে দেখা যাক। গাড়িটাতে ওরা সবাই আফ্রিকান, আমাদেরকে অনুসরণ করছে তা না-ও হতে পারে।'

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রইল রানা, শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে গরম বাতাস নিল বুকে। ফচেট আর জ্যাসন গাড়ি থেকে নামল না।

'আফ্রিকা কালো, আফ্রিকা অসভ্য,' বলল ফচেট, 'চিরকাল এই সব কথা শুনে এসেছি। কিন্তু আফ্রিকার মেয়েরা যে কেমন খাসা জিনিস, কই, সে-কথা তো কারও মুখে শুনিনি।'

'ওদের কাছে পাত্তা না পেলে তোমার মুখেও কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না,' বলল রানা।

'যদিও, মরদগুলোকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারছি না,' বলল ফচেট। 'ওগুলো ওরা কি চিবাচ্ছে, বলতে পারো?'

'ব্যামবু স্টিক,' বলল রানা। 'দাঁত পরিষ্কার করছে।'

গাড়িতে উঠল ও। গিয়্যার এনগেজ করে বলল, 'লক্ষ্য রেখো।' ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল ও। ঘোড়া-টানা গাড়ি, আনাড়ী সাইকেল-আরোহী আর মন্থরগতি পথিকদের পিছনে ফেলে এসে গতি বাড়িয়ে দিল ও।

'এরপরের শহর থেই, তারপর দিউগবেল।'

থেই পেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ফচেট বলল, 'আমাদের পেছনে ফিরে এসেছে সেই গাড়িটা!'

'ওরা জানে আমরা দিউগবেল যাব,' বলল রানা। 'তোমাদের কাছে গান আছে?'

'তোমার কি ধারণা?' এই প্রথম কথা বলল জ্যাসন।

'কাছে চলে আসছে,' বলে হোলস্টার থেকে একটা কোল্ট অটোমেটিক বের করল ফচেট। 'ওদের মতলব ভাল নয়। খুব স্পীডে আসছে।'

বার বার মিররে তাকাল রানা। হেডলাইট জ্বালল বুইক। রাস্তার মাঝখান থেকে স্যাঁৎ করে একধারে সরে এল সিট্রন, অফসাইড টায়ার টারমাক ছেড়ে নেমে পড়ল বালির ওপর।

সগর্জনে পাশ কাটিয়ে গেল বুইক। গাড়ির ভেতর চারজন লোকের কায়া দেখল ফচেট, কেউ তারা ওদের দিকে তাকাল না। এক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের সামনে চলে এসেছে কার, ঘণ্টায় কম করেও একশো আশি কিলোমিটার স্পীডে ছুটছে। পিছনের লাল আলো দ্রুত হারিয়ে যেতে শুরু করল অন্ধকারে।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করে হোলস্টারে অটোমেটিকটা ভরে রাখল ফচেট। 'ফলস অ্যালার্ম?'

'হতে পারে,' বলল রানা। হেডলাইট জ্বালল ও। 'তাই বলে গা ছেড়ে দিয়ো না। সামনে কয়েক মিটার রাস্তাটা সরু আর সোজা। আরও আগে কোথাও অ্যামবুশ পাতার মতলব করে থাকতে পারে ওরা।'

'তাহলে এত জোরে গাড়ি চালিয়ো না,' বলে হোলস্টার থেকে আবার কোল্টটা বের করল ফচেট। 'হঠাৎ ওদের মাঝখানে পড়তে চাই না।'

এক দুই করে দশ মিনিট কেটে গেল। ওঠা-নামা নেই, ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। তারপর হঠাৎ করেই সিট্রনের আলোয় ওদের সামনের রাস্তায় কি যেন দেখতে পাওয়া গেল।

'কি ওটা?' চাপা গলায় জানতে চাইল ফচেট।

সিট্রনের আলো জিনিসটার ওপর ভাল ভাবে গিয়ে পড়ার আগেই ওটাকে চিনতে পারল রানা। রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি, সম্ভবত বুইকটাই।

ব্রেক কষল রানা, টায়ারের তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে স্থির হয়ে গেল সিট্রন।

'আউট!' বলেই দরজা খুলল রানা। ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নরম বালিতে কাঁধ দিয়ে পড়ল ও। কাত হয়ে শুয়েই হোলস্টার থেকে এক ঝাঁকিতে বের করে আনল রিভলভার।

ফচেট আর জ্যাসন, ওরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। মাথা নিচু করে ছুটল আড়ালের সন্ধানে। রাস্তার ধারে শুয়েছে মাত্র, এই সময় চালু হলো মেশিনগান। চুরমার হয়ে গেল সিট্রনের উইন্ডস্ক্রীন।

জ্যাসনের হাতে গর্জে উঠল পয়েন্ট ফোর-ফাইভ। রাস্তার ওদিক থেকে গুড়িয়ে

উঠল একজন লোক। বুইকের আড়াল থেকে অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর গোড়া কাটা গাছের মত দড়াম করে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

মেশিনগানের বুলেট রাস্তার ওপর পড়তে শুরু করল। ক্রল করে সামনে এগোল রানা। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় কি যেন নড়তে দেখেই গুলি করল। ফ্রেঞ্চ ভাষায় অশ্রাব্য একটা খিস্তি করে সটান উঠে দাঁড়াল একজন লোক, ডান হাত দিয়ে বামবাহুটা আঁকড়ে ধরে আছে। আবার গর্জে উঠল জ্যাসনের অটোমেটিক, রাস্তার ওপর পড়ে গেল লোকটা।

বাকি দু'জন লোকের লারনিং কমপ্লিট। সব বোঝা হয়ে গেছে। লেজ দাবিয়ে পালাবার সিদ্ধান্ত নিল তারা। রাস্তার ওপর তাদের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল রানা। তারপর ঝোপ নড়ে ওঠার শব্দ এল। ঘন ঝোপ, এই অন্ধকারে ওদের খুঁজে বের করা অসম্ভব।

অত্যন্ত সাবধানে উঠে দাঁড়াল রানা, দেখাদেখি জ্যাসনও দাঁড়াল। দু'জন এগোল কার লক্ষ্য করে। একটা গাছের আড়ালে শুয়ে আছে ফচেট, ওদেরকে কাভার দিচ্ছে। ঘাম মাথার চুল ভিজিয়ে দিয়েছে তার, কপাল বেয়ে নেমে আসছে। এইটুকুতেই সাংঘাতিক হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

বুইকের কাছে পৌঁছে পড়ে থাকা সাব-মেশিনগানের সাথে পায়ে ধাক্কা খেলো রানা। ঝুঁকে সেটা তুলে নিল ও। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোক দু'জনকে পরীক্ষা করল জ্যাসন। তারপর সিধে হলো। তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'ওরা আমাদের গাড়ি নষ্ট করেছে,' বলল ও। 'ওদেরটা আমরা নেব। ইগনিশন কী আমার কাছে, তবু শিওর হওয়ার জন্যে সিট্রনের গোটা কয়েক তার-টার ছিঁড়ে ফেলা দরকার।' মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল জ্যাসন সিট্রনের দিকে। হাতে রিভলভার, চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

পরিস্থিতি এখন নিরাপদ, বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল ফচেট, এক ছুটে কাছে চলে এল। এখনও হাঁপাচ্ছে সে। 'গড! একটুর জন্যে বেঁচে গেছি! এখন কি করব আমরা?'

বুইকে চড়ল রানা। 'জলদি! আবার ওরা ফিরে আসতে পারে।'

লাফ দিয়ে গাড়িতে চড়তে গিয়ে ফ্রেমের সাথে মাথায় বাড়ি খেলো ফচেট, উহ্ করে উঠে মাথায় হাত দিল সে।

কাজ সেরে পিছনের সীটে উঠে বসল জ্যাসন। খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকার ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গাড়ি সোজা করে নিয়ে স্পীড বাড়াল রানা। 'চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি ওরা,' বলল ও। 'এখন আর পিছু নিতে পারবে না।' হাতঘড়ি দেখল। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছুতে হবে দিউগবেলে। গ্যাস পেডালে চাপ বাড়াল আরও।

মাথা ডলতে ডলতে ফচেট জানতে চাইল, 'সামনেও ওদের লোক আছে বলে মনে হয়? আরিব্বাপ! সাব-মেশিনগান···ভাবাই যায় না!'

'তোমারই বা গাফলতি হলো কেন?' জবাব চাইল জ্যাসন। 'ও জিনিস তো আমাদের কাছেও একটা থাকা উচিত ছিল।'

'জেট আর ফাইটার প্লেন, মর্টার, রকেট, বাজুকা—এসবও তো থাকা উচিত ছিল,' ঝাঁঝের সাথে বলল ফচেট। 'কিন্তু কাস্টমসের বেড়া ডিঙাতে কি করে শুনি?'

ওদের কথায় কান নেই রানার। ভাবছে, পালিয়ে যাওয়া লোক দু'জন গাড়ি না থাকায় বুলিনকে রিপোর্ট করতে পারবে না। অন্তত বেশ কিছুক্ষণ। ভাগ্য ভাল হলে পোলোকে নিয়ে ওয়েন প্যাকারের কাছে পৌঁছুতে আর কোন বাধার মুখে পড়বে না ও। সামনে দিউগবেলের রাস্তার আলো দেখা গেল, একটু পর গাড়ির গতি কমিয়ে আনল ও। বলল, 'তোমরা গাড়ি নিয়ে এখানেই থাকো। লোকটার সাথে আমি একা দেখা করব।'

'আমাদের সাথে নিতে চাইছ না, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ,' বলল ফচেট। 'যাও, একঝাঁক গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ো।'

জ্যাসন বলল, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, রানা। আমাকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করলে ঠিক মারা পড়বে।'

'যা খুশি করো, কিন্তু চোখে পড়ে যেয়ো না।' দুটো লাইটপোস্টের মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। দরজা খুলে নেমে পড়ল ও। 'আর মনে রেখো, ওয়েন প্যাকারের এই কন্ট্যাক্টকে তোমরা যদি আমার কাছ থেকে ভাগিয়ে দাও, মি. হফার একটা একটা করে হাড় ভাঙবে তোমাদের।'

হাঁটতে শুরু করল রানা। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না। বেশ খানিকটা আসার পর বাঁদিকে ফাঁকা একটা জায়গা দেখল ও। জায়গাটা পোলোর বর্ণনার সাথে মিলে যায়। এদিক ওদিক ভাল করে তাকাতে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় এক সারি গাছের সামনে গাঢ় রঙের একটা কাঠামো দেখল ও। মনে হলো একটা গাড়িই হবে।

সাবধানে এগোল রানা। আরও কাছে এসে দেখল, গাড়িই। রিভলভার ধরা হাতটা পকেটে রয়েছে, হাঁটার গতি আরও কমিয়ে আনল ও। অত্যন্ত সতর্ক আর উত্তেজিত হয়ে আছে।

গাড়িতে যে-ই থাকুক, দেখতে পেয়েছে ওকে। দরজা খুলে গেল, নেমে দাঁড়াল একজন লোক। পোলো নয়। এই লোকটা একটু রোগা, ততটা লম্বা নয়। দেখে মনে হলো, অল্প বয়স।

দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে আসছে। ফাঁকা জায়গায় মুখোমুখি হলো ওরা।

লোকটা আফ্রিকান কিনা ঠিক বোঝা গেল না, তবে গায়ের রঙ কালোই বলা চলে। আঠারো থেকে বিশের মধ্যে হবে বয়স।

বলল, 'আমার কাকা আপনার সাথে এখানে দেখা করতে বলেছেন।' করমর্দনের জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি এজিয়ো।'

রানার শরীরে ঢিল পড়ল। হ্যান্ডশেক করে বলল, 'রাস্তায় একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। দেরি হয়ে গেল পৌঁছুতে।'

'বিপদ?'

'তোমার কাকাকে জানাব। কোথায় তিনি?'

চার দিকে চোখ বুলাল এজিয়ো। তারপর রানার দিকে ফিরল, বলল, 'মাফ

করবেন। আপনার গাড়ি দেখছি না। একা এসেছেন?'

'না,' বলল রানা। 'একা থাকলে এখানে আর পৌঁছুতে হত না।'

'ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'দু'জন লোক আছে আমার সাথে,' বলল রানা। 'রাস্তার মোড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।' এর বেশি কিছু বলল না ও।

কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল এজিয়ো। রানার মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা। 'তুমি ইতস্তত করছ কেন?'

'কিন্তু কাকা বলেছেন, আপনি একা আসবেন।'

'একাই তো এসেছি,' একটু বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'ওদেরকে আমি রেখে যাচ্ছি এখানে।' জ্যাসন ওর পিছু পিছু এসে থাকলে গোটা ব্যাপারটাই কেঁচে যাবে। এজিয়োর চোখে পড়ে গেলেই সর্বনাশ।

আরও কয়েক সেকেন্ড কি যেন ভাবল এজিয়ো, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আসুন।' হলুদ ফিয়াটের দিকে পা বাড়াল সে।

এজিয়োর পিছু নিয়ে জানতে চাইল রানা, 'অনেক দূর নাকি?'

'না।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা, স্টার্ট দিল এজিয়ো। ফিয়াট ঘুরিয়ে নিয়ে মেইন রোডের দিকে ছুটল ওরা। বুইকটা ওদেরকে অনুসরণ করছে কিনা দেখার ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমন করল রানা।

'ডাকারের চেয়ে গরম এখানে বেশি,' বলল ও।

'ভেতরের দিকে কিনা,' জানাল এজিয়ো। মন্থর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে সে। রাস্তায় আফ্রিকানদের ভিড়, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই সাথে খই ফুটছে মুখে। খাবার আর ফলের দোকানে আলোগুলোকে ঘিরে ভন ভন করছে রাজ্যের মাছি।

মিনিট দুয়েক গাড়ি চালাবার পর বাঁক নিয়ে বালিময় একটা রাস্তায় চলে এল এজিয়ো, থামল সাদা একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। ঠিক সময় মত ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়েছিল বলে, বুইকটাকে দেখতে পেল রানা। রাস্তার মুখ থেকে ধীরগতিতে সরে গেল সেটা।

এজিয়োর পিছু পিছু ছোট একটা বাগানে ঢুকল রানা। সামনে কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ দেখা গেল। দরজার সামনে থেমে পকেট থেকে চাবি বের করল এজিয়ো। তালা খুলে হলঘরে ঢুকল।

হলঘরের ভেতর আলো খুব কম। আরেকটা দরজার পাশে থামল এজিয়ো। ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল রানাকে।

ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, কামরাটা বেশ বড়। টেবিলের ওপর একটা মাত্র লাল শেডের ল্যাম্প, ঘরের শেষ প্রান্তটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে।

টেবিল সামনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছে চেস্টন পোলো, টেবিলে কনুই রাখা হাতের আঙুলে জ্বলন্ত চুরুট। আলোর দিকে এগোবার সময় ঘরে আরও

একজনের উপস্থিতি অনুভব করল রানা। কামরার শেষ প্রান্তের গাঢ় অন্ধকারে কেউ একজন লুকিয়ে আছে।

'কেমন আছেন, মি. পোলো?' জানতে চাইল রানা। পকেটের ভেতর রিভলভারের বাট ধরে আছে ডান হাত। 'পথে বাধা দেয়া হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।'

ঘরের অন্ধকার অংশে কি যেন নড়ে উঠল, তারপর আলোয় এসে দাঁড়াল একটা মেয়ে। দীর্ঘাঙ্গী, পাঁচ ফিট দুই হবে। চোখ, নাক, ঠোঁট, কপাল কোথাও কোন খুঁত নেই। গায়ের রঙ বেদানার মত। আঠারো থেকে বিশের মধ্যে বয়স, চেহারায় রাগের সাথে খানিকটা উদ্বেগের ভাবও ফুটে আছে। রানার মনে হলো, আকাশ থেকে পরী নেমে এসেছে। বুশ শার্ট আর স্ল্যাকস পরে আছে সে, পিঠ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল। হাতে চকচকে একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট, রানার পেটের দিকে তাক করা।

'আপনি সর্বনাশ করেছেন!' চেস্টন পোলোকে উদ্দেশ্য করে বলল মেয়েটা। 'এ লোক সে লোক নয়···এ রানা নয়!'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। চিনতে পেরেছে ও। আলোয়, চেস্টন পোলোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই রহস্যময়ী মেয়ে—লুনা।

আট

এজিয়োর হাতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা রিভলভার। স্যাাৎ করে একপাশে সরে গিয়ে রানাকে কাভার করল সে। লুনার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা।

'হ্যালো, লুনা,' বলল রানা। 'আমার অপেক্ষায় থাকবে বলে কথা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে যে? এখন আবার টুপ করে হাজিরই বা হলে কোত্থেকে?'

তীক্ষ্ণ হলো মেয়েটার দৃষ্টি, চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠতে শুরু করল।

'আমার ছদ্মবেশে খুঁত আছে এ-কথা কেউ বলতে পারবে না,' আবার বলল রানা। মুখের দুটো প্যাড সরিয়ে ফেলল ও। 'চুলের সোনালি রঙ আর গোঁফ জোড়া তুলে ফেললেই আবার আমি তোমার বয়-ফ্রেন্ড হতে পারি। কি, বিশ্বাস হয় না?'

ধীরে ধীরে হাতের রিভলভার নিচু করল লুনা। 'আরে, তাই তো! এখন তোমাকে চেনা যাচ্ছে।' মুখে বললেও, চেহারা দেখে মনে হলো এখনও তার সন্দেহ পুরোপুরি কাটেনি। 'কিন্তু তুমি ছদ্মবেশ নিয়ে আছ কেন?'

এগিয়ে গিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসল রানা, পায়ের ওপর পা তুলে দিল। 'আমার আসল চেহারা রাশিয়ানদের জানা আছে, তাই। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বলো দেখি? এসবের মধ্যে তুমি কোথায় খাপ খাও?'

আলোর দিকে খানিক সরে এসে টেবিলের পাশে কাঠের খাড়া একটা চেয়ারে বসল লুনা। চেস্টন পোলোর দিকে তাকাল একবার, জবাবে মোটা একটা কাঁধ

সামান্য একটু ঝাঁকাল সে।

'আমি লুনা প্যাকার,' বলল লুনা। 'ওয়েন প্যাকারের মেয়ে।'

অবাক হলো রানা। জানতে চাইল, 'কথাটা প্যারিসে থাকতে তুমি আমাকে বলোনি কেন?'

'কারণ আছে। তখন আমি তৈরি ছিলাম না।'

'আমার অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করেছ তুমি। কেন?'

'তোমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম,' বলল লুনা। 'যখন বুঝলাম বাবা যার সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে বলেছে তুমি সেই লোকই, তখন আর হাতে সময় ছিল না আমার, চলে আসতে হলো। পোলো কাকু একটা তার পাঠান, সাথে সাথে এখানে চলে আসতে বলেন আমাকে।'

রানার চেহারায় আবার বিস্ময়ের ছাপ পড়ল। 'তোমার বাবা, মি. প্যাকার তোমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। মি. সীন ওয়াট তাকে সাহায্য নাও করতে পারেন, এই রকম একটা ধারণা ছিল বাবার। বিকল্প হিসেবে আপনার নাম বলেছিল বাবা।'

বুলিনের কথা মনে পড়ে গেল রানার। জানতে চাইল, 'তুমি এখানে আছ রাশিয়ানরা জানে?'

'মনে হয় না।'

'কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

'বাবা অসুস্থ, আমি তার দেখাশোনা করছি।'

'রাশিয়ানদের কয়েকজন এজেন্ট কাজ করছে এখানে,' বলল রানা। 'তাদের একজনের নাম বুলিন। শোনা যায়, কিছু পাবার জন্যে, তা সে যত সামান্যই হোক, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারে লোকটা, একটুও বাধে না। সে যদি জানে তুমি এখানে আছ, কিংবা সে যদি তোমাকে ধরতে পারে, তোমার আর তোমার বাবার অবস্থা কি হবে কল্পনা করতে পারো?'

লুনার চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ ফুটল না। বলল, 'বাবার কাছে একজনকে থাকতে হবে তো!'

'কেন, কি হয়েছে তার?'

'বাবা খুব অসুস্থ...' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল লুনা, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।

পোলোর দিকে ফিরল রানা। 'কি হয়েছে?'

'সঠিক জানি না, তবে সিরিয়াস কিছু তাতে সন্দেহ নেই,' বলল পোলো। 'দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে সে। তার কাছে একজন ডাক্তারকেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মত দিচ্ছে না।'

'আর কি জঘন্য পরিবেশে আছে!' বলল লুনা। 'ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরের ভেতর রাত-দিন আটকা পড়ে থাকলে এমনিতেও মানুষের মরে যাবার কথা। রাশিয়ানরা কিছু আফ্রিকানকে টাকা দিয়েছে, বাবাকে খুঁজছে তারা। এটা শুরু হয়েছে আজ প্রায় এক মাস হয়ে গেল। প্রতিদিন কাছে সরে আসছে তারা।'

ঘাড়ের পিছনটা ডলতে শুরু করল রানা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'তাঁর

কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো?'

পোলোর দিকে ফিরল লুনা। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল পোলো, কি যেন চিন্তা করছে।

'কিন্তু তোমার এই ছদ্মবেশ তাহলে বাদ দিতে হবে,' বলল লুনা। 'আমিই তোমাকে চিনতে পারিনি, বাবা তো আরও চিনতে পারবে না।'

'হেয়ার ডাই জোগাড় করে দিতে পারলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার আসল চেহারা দেখতে পাবে,' বলল রানা।

'আজ কোত্থেকে দেব! কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। দেরি হয়ে যাবে। আমাকে একটা হ্যাট আর পোড়া কর্ক দাও, ডাইয়ের বদলে দেখি ওগুলো দিয়ে কাজ চালানো যায় কিনা।'

কেউ অনুরোধ করার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল এজিয়ো। কয়েক মিনিট পর একটা স্ট্র-হ্যাট, একটা বোতল আর একটা কর্ক, একটা মোমবাতি আর দিয়াশলাই নিয়ে ফিরে এল সে।

'আগে গোঁফ জোড়া খসাই,' বলল রানা। 'বাথরুমটা কোন্ দিকে?'

দশ মিনিট পর, হ্যাট পরে থাকায়, মোটামুটি চেনা গেল রানাকে। 'এখন ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল ও।

বড় ঘরের সব ক'টা আলো জ্বেলে নিয়ে রানাকে পরীক্ষা করল লুনা। 'হ্যাঁ, চলবে। বাবা চিনতে পারবে তোমাকে।'

'যদি আমার চেহারা এখনও তার মনে থাকে,' বলল রানা।

'তোমার কথা যখন মনে রেখেছে, চেহারাও মনে আছে,' বলল লুনা।

'রাস্তায় আমরা একটু অসুবিধেয় পড়েছিলাম...'

চমকে উঠল লুনা। 'আমরা মানে? তুমি একা আসোনি?'

'মি. ওয়াট আরও দু'জন লোককে পাঠিয়েছেন এখানে,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল রানা, জানে মিথ্যে কথা না বলে উপায় নেই। 'কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান তিনি। ওদের কথা ভাবতে হবে না তোমার। ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে। ওরা না থাকলে এখানে পৌঁছুতে পারতাম না আমি।'

'কেন, কি ঘটেছে রাস্তায়?'

সংক্ষেপে বলল রানা। বলার সময় লক্ষ্য করল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পোলোর চেহারা। শেষের দিকে ঘাম দেখা দিল তার কপালে।

'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না,' বলল পোলো, এই প্রথম কথা বলল সে। 'তোমাকে এখানে আমার নিয়ে আসা উচিত হয়নি, লুনা। আমরা কেউ এখন নিরাপদ নই। এই রাশিয়ানদের আমি চিনি।'

'সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না,' বলল রানা। 'তোমার বাবার কাছে যেতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের, লুনা?'

'ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।'

'তাহলে আমরা দেরি করছি কেন!' উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, বেরিয়ে পড়া

যাক।' পোলোর দিকে তাকাল ও। 'আপনি আসছেন?'

ভারী শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল পোলো, এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল, 'না।' এজিয়োর দিকে তাকাল সে। 'তুমিও যাচ্ছ না।'

এজিয়ো ইতস্তত করতে লাগল। 'কিন্তু কাকা...আমার মনে হচ্ছে, ওদেরকে একা ছাড়া ঠিক হবে না। পথে ওদের যদি কোন বিপদ হয়? দু'জনের চেয়ে তিনজন ভাল নয়?'

'তাহলে আমার কি হবে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল পোলো। 'আমি এখানে একা থাকতে পারব না। ঝুঁকি তো আর কম নিইনি। আর কত? কেউ থাকলে তবু একটু ভরসা।'

'কাকার সাথে থাকো তুমি,' এজিয়োকে বলল রানা, তাকাল লুনার দিকে। 'তোমার গাড়ি আছে?'

'পেছনের উঠানে। ওখানে আমার আফ্রিকান গাইড অপেক্ষা করছে।'

'ওকে না নিলে হয় না?'

'না নিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পথ হারাব। বাবার বিশ্বস্ত লোক ও, ওই তো বাবাকে লুকিয়ে রেখেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, বলল, 'তাহলে ঠিক আছে। চলো।'

'এক মিনিট,' বলল লুনা। 'তোমার লোকদের কি হবে?'

'মেইন রোডের ওপর নজর রাখছে ওরা। ওখানেই থাকতে দাও ওদের। তোমার বাবা যদি সত্যি গুরুতর অসুস্থ হন, এই দু'জন সেখানে না গেলেই ভাল। তোমার বাবাও সেটা চাইবেন না। চলো, চলো।'

কিচেনের ভেতর দিয়ে পিছনের অন্ধকার উঠানে পৌঁছুল ওরা। ভাঙা গেট পেরিয়ে আসতেই গাড়িটাকে দেখা গেল, একটা দিউ সিভু। দরজা খুলে নিচে নামল একজন লোক। কোঁকড়া চুল মাথা কামড়ে আছে। লুনাকে বো করল সে। লোকটা একটু কুঁজো।

'এ মোহার,' বলল লুনা। 'মোহার, ইনি মাসুদ রানা। বাবার বন্ধু।'

কালো লোকটা চোখে সন্দেহ নিয়ে নিরীক্ষণ করল রানাকে, তারপর লুনার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি যখন বলছ, তাহলে ঠিক আছে।' গাড়ির পিছনের সীটে উঠে বসল সে।

লুনা গাড়িতে চড়তে যাবে, কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই যে, গুরু, হচ্ছেটা কি জানতে পারি?'

চরকির মত আধপাক ঘুরল লুনা, দেখল অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে চওড়া একটা লোক।

'কে ও?' জানতে চাইল ফচেট। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'জ্যাসন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। লম্বা কয়েক কদম ফেলে ফচেটের সামনে চলে এল ও। হাত ধরে ঘোরাল তাকে, টেনে নিয়ে চলল লুনার কাছ থেকে দূরে।

'সামনের দিকে নজর রাখছে সে,' বলল ফচেট। 'দাঁড়াও এখানে। আমাকে

তুমি ঠেলছ কেন? মতলব কি তোমার?'

'সব দেখছি ভেস্তে দেবে তুমি!' চাপা সুরে বলল রানা। 'আস্তে কথা বলো!' আরও ঠেলে ফচেটকে অন্ধকারে নিয়ে এসে দাঁড় করাল ও। 'তোমাদের আমি আগেই সাবধান করে দিইনি, আমার কন্ট্যাক্ট যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মি. হফারকে বলে দেব আমি?'

'ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছ তুমি!' প্রতিবাদ করল ফচেট। 'এই রকম তো কথা ছিল না। তোমাকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু তারমানে এই নয় যে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। যাই ঘটুক না কেন, তিনজন আমরা একসাথে থাকব। বুঝতে পারছ? মেয়েটা কে?'

জায়গা পাওয়ার জন্যে সামান্য একটু পিছিয়ে এল রানা, পরমুহূর্তে চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল ফচেট। গুঙিয়ে উঠে পড়ে যাচ্ছে সে, আবার মারল রানা। তারপর অচেতন শরীরটা ধরে ফেলে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল মাটির ওপর। একছুটে গাড়ির কাছে ফিরে এসে নিচু গলায় বলল, 'এসো, তাড়াতাড়ি করো!'

স্টার্ট দিল লুনা। 'কি ঘটল ওখানে? কে লোকটা? ওকে তুমি মারলে নাকি?'

'বাদ দাও! গাড়ি ছাড়ো!'

গতি সঞ্চার হলো গাড়িতে। উঁচু-নিচু মাটি, এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়তে লাগল দিউ সিভু। সমতল জায়গায় উঠে এসে গতি বাড়িয়ে দিল লুনা। রাস্তার কোন নাম-নিশানা নেই, নিচু ঝোপ আর ঝুরো বালি। হেডলাইট জ্বালার জন্যে সুইচের দিকে হাত বাড়াল লুনা, খপ্‌ করে তার কব্জি ধরে ফেলল রানা, বলল, 'না!' ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল ও। অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

'কোথায় যাচ্ছি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বলল লুনা। 'চাঁদটাও লুকিয়েছে। গাছ বা আর কিছুর সাথে যে-কোন মুহূর্তে ধাক্কা লাগতে পারে।'

'লাগলে দেখা যাবে,' বলল রানা। 'চালিয়ে যাও, থেমো না।'

গাড়ির গতি কমিয়ে আনল লুনা। সামনেটা ভাল করে দেখার জন্যে উইন্ডস্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। গাছগুলোকে এড়িয়ে লম্বা ঝোপের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। এইভাবে, অত্যন্ত সাবধানে মিনিট দশেক গাড়ি চালাবার পর আফ্রিকান বুশ-এর মেইন রোডে উঠে এল।

'দেখলে তো, একটা গাছের গায়েও আঁচড় লাগেনি,' বলল রানা। 'এখন তুমি হেডলাইট জ্বালতে পারো।'

গাড়ি থামিয়ে রানার দিকে ফিরল লুনা। 'কে ছিল লোকটা? ওকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কে ও?'

'মি. ওয়াটের লোক,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তোমার বাবাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা জানার জন্যে পাঠানো হয়েছে ওকে। বললাম তো, ও না আসায় ভাল হয়েছে। গাড়ি ছাড়ো, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি।'

'কিন্তু কোথাও ওকে দেখেছি আমি...প্যারিসে!'

'তাতে হলোটা কি? প্যারিসেই তো থাকে ও। গাড়ি ছাড়ো।'

চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল লুমা। মেইন রোড মানে বালির একটা লম্বা বিস্তৃতি, গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা, তারই ভেতর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি।

বাড়ির সামনে থেকে গাড়ি স্টার্ট নেবার আওয়াজ পেল জ্যাসন। কি করবে বুঝতে না পেরে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে, তারপর ছুটল।

বাড়ির পিছনে পৌঁছে দেখল, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে একটা গাড়ি। অটোমেটিক তুলে গুলি করতে যাবে, কিন্তু করল না। ভাবল, হয়তো কোন বেখেয়াল আফ্রিকান বাড়ি ফিরছে।

কিন্তু ফচেট, সে কোথায়?

গোঙানির অস্পষ্ট শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাসন। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না, কিন্তু মাটির ওপর কি যেন একটা পড়ে থাকতে দেখল সে। এগিয়ে এসে ফচেটের সামনে দাঁড়াল। বুঝল, জ্ঞান ফিরে আসছে তার।

অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে ফচেটের পাঁজরে লাথি মারল জ্যাসন। 'শালা ডুবিয়েছে!'

'চোয়াল ভেঙে দিয়েছে রে, ভাই!' প্রলাপ বকছে ফচেট। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। 'কপালে দুর্ভোগ থাকলে কি আর করা! শালা আমাকে কোন চান্সই দিল না!'

লাথি দেয়ার জন্যে আবার পা তুলল জ্যাসন। চমকে উঠে সরে গেল ফচেট, তারপর টলতে টলতে দাঁড়াল। 'সরে যাও, ছুঁলে খারাপ হয়ে যাবে!' একরোখা ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। 'প্রথমে রানা, তারপর তুমি—আমাকে তোমরা পেয়েছটা কি?'

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার বুশের দিকে তাকাল জ্যাসন। দেখা গেল না, কিন্তু গাড়ির শব্দ এখনও পাচ্ছে সে। 'কোথায় গেল রানা?' এগিয়ে এসে ফচেটের শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকি দিল সে।

'আমি কি করে বলব কোথায় গেল! ওর সাথে একটা মেয়ে আছে। গাড়িতে ওঠার সময় আমার চোখে ধরা পড়ে যায় ওরা। কিন্তু তারপর রানা একহাত দেখিয়ে দেয় আমাকে।'

'মেয়ে?'

'ভাল করে দেখতে পাইনি, তবে মেয়ে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'বানচোত, এর মানে কি জানিস?' রাগে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল জ্যাসন। 'রানা প্যাকারের কাছে যাচ্ছে। আর তুই তাকে ফাঁকি দেবার সুযোগ করে দিয়েছিস! এই বুশে ওদের পিছু নেব, তাও সম্ভব নয়।' হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল তার। 'কুত্তার বাচ্চা, তোকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে!'

'দেখো, গালাগাল দেবে না,' একটা গাছের গায়ে হেলান দিল ফচেট। 'রানা পালিয়েছে, সেটা আমার দোষ নয়। আমার সাধ্যমত আমি তাকে বাধা দেবার

চেষ্টা করেছি।'

'গুলি করলি না কেন?'

চোয়ালে হাত দিল ফচেট, সাথে সাথে উহ করে উঠে নামিয়ে নিল হাত, যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছে।

সাদা বাড়িটার দিকে তাকাল জ্যাসন। বন্ধ একটা জানালার ফাটল দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা বেরিয়ে আসতে দেখল সে। 'বাড়িতে লোক আছে,' গলা খাদে নামিয়ে বলল সে। 'দেখতে হবে।'

ফচেটের অপেক্ষায় না থেকে হাঁটতে শুরু করল জ্যাসন, নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির সামনের দিকে চলে এল সে। চলমান কালো একটা ছায়ার মত বাগানে ঢুকল, তারপর ধাপ ক'টা টপকে দাঁড়াল দরজার সামনে।

ফচেটও জ্যাসনের পিছু পিছু এল, তার রিভলভার হাতের ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

আস্তে করে ধরে হাতলটা ধীরে ধীরে ঘোরাল জ্যাসন, তারপর একটু একটু করে চাপ দিল। কবাট সামান্য ফাঁক হতে থামল সে, কান দুটো সজাগ। কারা যেন কথা বলছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফচেটের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, তারপর ঢুকে পড়ল হলঘরে। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল ফচেট।

দরজা বন্ধ করে দিল জ্যাসন।

একজন লোকের গলা পেল ওরা, বলছে, 'কাজটা উচিত হলো না, কাকা। ওদের সাথে গেলেই ভাল করতাম।'

'প্যাকারের জন্যে অনেক করেছি আমি,' এই গলাটা ভারী। 'তাকে আমি সাহায্য করতে রাজি হয়েছি, সেটাই তো বেশি। এত ঝুঁকি আছে জানলে নিশ্চয়ই মাফ চাইতাম। এখন যখন মেয়েটা তার ওপর নজর রাখছে, এসবের মধ্যে আমরা নেই আর।'

হলঘর পেরিয়ে আধখোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল জ্যাসন। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল ফচেট তৈরি হয়েছে কিনা। তারপর উদ্যত রিভলভার নিয়ে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর।

জ্যাসন, আর তার পিছনে ফচেটকে দেখে পাথর হয়ে গেল পোলো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে ফিরল এজিয়ো। চমকে উঠল সে।

আর্ম-চেয়ারে বসে আছে পোলো। চুরুটের ছাই ঝাড়ার জন্যে অ্যাশট্রের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, সেভাবেই রয়ে গেল সেটা। টেবিলের ওপর বসে আছে এজিয়ো, ঘাড়টা ওদের দিকে ফেরানো।

চুরুটটা পোলোর হাত থেকে অ্যাশট্রেতে পড়ে গেল। তার মাংসল মুখ ঝুলে পড়ল। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে এজিয়োর রিভলভার, কিন্তু এজিয়ো তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে রিভলভারের দিকে একটু একটু করে হাত বাড়াল এজিয়ো।

'উঁহুঁ, ফিরিয়ে আনো হাত,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জ্যাসন। 'ফচেট, নিয়ে এসো ওটা।'

সাবধানে এগোল ফচেট। টেবিল থেকে রিভলভারটা তুলে পকেটে ভরল সে।

'বেশি কথার মানুষ নই আমি,' বলল জ্যাসন। 'যা জিজ্ঞেস করব, চটপট জবাব চাই। মিথ্যে বললে ধরতে পারব, গুলি করতে একটুও হাত কাঁপবে না। রানার সাথে যে মেয়েটা গেল, কে সে?'

যেমন বসেছিল তেমনি বসে থাকল ওরা, কথা বলল না। দু'জনেই জ্যাসনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'চাও মেরামত করি?' জিজ্ঞেস করল জ্যাসন। 'এই মোটু, কথা কানে যাচ্ছে না?' ওদের দিকে এগোল সে। হাতের রিভলভারটা উল্টো করে ধরল। শিউরে উঠল পোলো, অপলক চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

'বলছি, সব বলছি!' নিজের সামনে হাত তুলে আত্মরক্ষার ভঙ্গি করল পোলো। 'ও···মানে মেয়েটা···প্যাকারের মেয়ে ও।'

পোলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাসন। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে থাকা পোলো মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। 'প্যাকারের মেয়ে? ওরা তাহলে তার কাছেই গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সে?'

'ঝোপে···মানে, বুশে।'

'জানি! আমি জিজ্ঞেস করছি, কোথায়?' পোলোর ভাঁজ করা হাঁটুতে রিভলভারের বাট দিয়ে বাড়ি দিল জ্যাসন। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল পোলো, কিন্তু নড়ল না। 'কোথায়?'

'আমি বলছি,' জবাব এল এজিয়োর কাছ থেকে। 'আমার কাকাকে কিছু না বললে আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি। বলে দিলেও সে-জায়গা তোমরা খুঁজে পাবে না। আফ্রিকান মরু-ঝোপ সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই। গাড়ি করে এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ।'

ফচেট আর জ্যাসন দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন। 'ঠিক আছে, আমাদের নিয়ে চলো।' পোলোর দিকে তাকাল সে, ডান হাত দিয়ে আহত হাঁটু ডলছে সে। 'তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি ঠিক, কিন্তু এখানে বসে আমাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল যদি নাড়ো, তোমার ভাতিজাকে আমরা জ্যান্ত কবর দেব। মনে থাকবে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল পোলো, 'থা-থাকবে।' এজিয়োর দিকে তাকাল সে। শান্ত, নির্লিপ্ত চেহারা এজিয়োর।

এজিয়োর পাঁজরে রিভলভারের আগা দিয়ে খোঁচা দিল ফচেট। 'এসো হে। গাড়ি আছে তো?'

'আছে, কিন্তু পেট্রলে হবে না,' মৃদু কণ্ঠে বলল এজিয়ো। দেখে মনে হলো, এতটুকু ঘাবড়ায়নি সে। 'এদিকে কোথাও পেট্রল কিনতে পাওয়া যায় না। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমরা বুইক নিয়ে যাব,' ফচেটকে বলল জ্যাসন। 'যাও, নিয়ে এসো।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ফচেট।

দু'জনের কাছ থেকে পিছিয়ে এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল জ্যাসন। তিনজনের কেউ নড়ল না বা কথাও বলল না। খানিক পর আওয়াজ পাওয়া গেল গাড়ির। এজিয়োর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন। কাকার দিকে একবার তাকিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে একটু হাসল এজিয়ো, তারপর বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

'কি বলেছি মনে আছে তো?' পোলোকে জিজ্ঞেস করল জ্যাসন। 'আমাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল-ও যদি নাড়ো, জ্যান্ত কবর দেয়া হবে ওকে।'

বাইরে বেরিয়ে বুইকের পাশে এসে দাঁড়াল সে। এরই মধ্যে গাড়িতে ফচেটের সাথে সামনের সীটে উঠে বসেছে এজিয়ো। পিছনের সীটে বসল জ্যাসন।

'কোন্‌দিকে?' স্টার্ট দিয়ে জানতে চাইল ফচেট।

'মেইন রোড ধরে তিন কিলোমিটার, তারপর বাঁ দিকের প্রথম রাস্তা ধরতে হবে,' বলল এজিয়ো।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তার দিকে তাকাল ফচেট। 'কিন্তু ওরা তো সেদিকে যায়নি!'

'ওদের গাড়ি হালকা। আমাদের বুশ রোড ধরে যেতে হবে। ওদের মত আমরাও যদি বালির ওপর দিয়ে যেতে চাই, চাকা আটকে যাবে।'

যুক্তিটা মেনে নিল ফচেট। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মেইন রোডের দিকে চলল সে।

রিভলভারের মাজল দিয়ে এজিয়োর ঘাড় স্পর্শ করল জ্যাসন। 'কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে, ফুটো করে দেব।'

রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়, সাবধানে গাড়ি চালাতে হলো ফচেটকে। কয়েকজন হাসি-খুশি আফ্রিকান যুবক বিরাট আশা নিয়ে হাত তুলে গাড়ি থামাতে চেষ্টা করল, একটু যদি বেড়ানো যায়, কিন্তু থামল না সে। দিউগবেল পেরিয়ে আসার পর ফাঁকা রাস্তা পাওয়া গেল আবার।

'সামনেই,' বলল এজিয়ো। 'বাঁদিকে ঢুকতে হবে। গাড়ির স্পীড কমালেই বিপদ, বালিতে ডেবে যাবে চাকা। ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটারের নিচে নেমো না।'

হেডলাইটের আলোয় সরু রোডটা দেখতে পেল ফচেট। রাস্তা মানে সাদা শুকনো বালি। তিনদিকে দিগন্তরেখা পর্যন্ত সমতল মরু-ঝোপ।

প্রথম কিছুদূর ভালই এগোল ফচেট। তারপর লক্ষ্য করল, গাড়ির পিছনের চাকা দুটো মাঝেমধ্যে স্লিপ করছে। রাতের বাতাস আগের চেয়ে গরম লাগল, হুইল ধরা হাতের তালু ঘামে ভিজে গেছে। কঠিন কাজ এড়িয়ে চলে সে, কাজেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল তার। কিন্তু জ্যাসনের ভয়ে অভিযোগ করতে সাহস হলো না।

কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল, সেই সাথে ভৌতিক একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে গায়ে কাঁটা দিল ফচেটের। স্পীড মিটারের কাঁটা আশির ঘরে কাঁপছে, অথচ মনে হচ্ছে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তারা, একচুল নড়ছে না গাড়ি। ব্যাপারটা অনেকটা যেন এই রকম—দ্রুতগতি একটা

বেল্টের ওপর রয়েছে ও, ছুটছে উল্টোদিকে, কিন্তু বেল্টের নিজস্ব গতির কারণে সামনের দিকে একটুও এগোনো হচ্ছে না তার। বালি, ঝোপ, গাছ আর সমতল ভূ-প্রকৃতি সবখানে হুবহু একই রকম, দৃশ্যটা কখনও কোথাও বদলাচ্ছে না। অজানা একটা ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তার।

ঘন্টাখানেক এগোবার পর এজিয়ো বলল, 'এবার আমাদের রাস্তা ছাড়তে হবে। ড্রাইভার কিভাবে গাড়ি চালাবে এখন সেটার ওপর নির্ভর করছে সব। হঠাৎ করে স্পীড বাড়ানো যাবে না, কমানো যাবে না। সমান গতি টিকিয়ে রাখতে না পারলে আটকা পড়ব আমরা।' সামনেটা ভাল করে দেখার জন্য উইন্ডস্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'এখানেই বাঁক নাও। স্পীড কমিয়ো না, সাবধান।'

বিড়বিড় করতে করতে হুইল ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে মরু-ঝোপে গাড়ি নামাল ফচেট। পিছনের চাকা দুটোকে বাঁ দিকে পিছলে যেতে দিল সে, স্পীড বাড়াবার ঝোঁকটাকে দমিয়ে রাখল। থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়ি, মন্থর হলো গতি, তারপর আবার ফিরে পেল আগের গতি, ঘাসের শক্ত চাপড়ার ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল। এটা সেটা ধরে সীটের ওপর শক্ত হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করল বাকি দু'জন।

প্রকাণ্ড একটা মহীরুহ হঠাৎ করেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হেডলাইটের আলোয়, লম্বা শাখাগুলো বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আঁতকে উঠে হুইল ঘোরাতে শুরু করল ফচেট, নিজের অজান্তেই তার পা চাপ দিয়ে বসল ব্রেকের ওপর। শ্লথ হয়ে গেল গাড়ির গতি, ইঞ্জিন ইতস্তত করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর থেমে গেল।

'শালার ফাটা কপাল!' অসহায় দেখাল ফচেটকে।

'চালাও!' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাসন।

আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গিয়ার এনগেজ করল ফচেট, ক্লাচ দিয়ে আস্তে করে চাপ দিল অ্যাকসিলারেটরে। পিছনের চাকা বালির ওপর ঘুরতে লাগল, কিন্তু গাড়ি নড়ল না।

'ধাক্কা দিই,' বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল জ্যাসন। বুইকের পিছনে গিয়ে বুটের ওপর দু'হাত রাখল সে। 'নাও!'

আবার ক্লাচ দিল ফচেট, সেই সাথে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ধাক্কা দিল জ্যাসন। কিন্তু ভারী গাড়িটার চাকা বালির ভেতর আরও ডেবে গেল। শুকনো, ঝুরঝুরে বালি, জ্যাসনের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেছে।

'এই,' এজিয়োকে বলল ফচেট, 'যাও সাহায্য করো ওকে।'

গাড়ির পিছনে এসে এজিয়ো দেখল, জ্যাসন হাঁপাচ্ছে। দু'জনের কারও হাতেই রিভলভার নেই এখন, সুযোগটা নেবে নাকি? কিন্তু একা ওদের দু'জনের সাথে পারা সম্ভব নয় ভেবে চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল সে।

দু'জন একসাথে ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করল এবার, কিন্তু তাতেও বুইককে বালির ভেতর থেকে তোলা গেল না। চাকার অর্ধেকই এখন ডুবে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে এল জ্যাসন, শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছল সে।

'এভাবে হবে না,' বলল এজিয়ো। 'পাতা আর ডালপালা জোগাড় করে

খানাতে হবে। চাকার চারদিকে সমান করতে হবে বালি, তারপর সেখানে পাতা আর ডাল ফেলে চেষ্টা করতে হবে।'

গাড়ি থেকে নেমে এল ফচেট। বালির ভেতর চাকা অর্ধেকই ডুবে গেছে দেখে ভয়ে শুকিয়ে গেল চেহারা। তার ধারণা হলো, অত নিচে থেকে কোন ভাবেই চাকা তোলা সম্ভব নয়।

'দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? কি বলল শুনলে না!' ফচেটকে ধাক্কা দিয়ে এগোল জ্যাসন। একটু এগিয়ে ঝোপ থেকে ডাল আর পাতা ছিঁড়তে শুরু করল সে।

দেখতে দেখতে ডালপালা আর পাতার একটা স্তূপ তৈরি হলো গাড়ির পাশে। জ্যাসনকে ফেলে আরও সামনে এগিয়ে গেল ফচেট, বালির ওপর ছড়িয়ে থাকা ভাঙা, শুকনো ডাল সংগ্রহ করছে।

বড় গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল এজিয়ো, নিচু হয়ে থাকা ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ছে।

দশ মিনিট কাজ করল ওরা। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল জ্যাসন। অন্ধকারে বাকি দু'জনের একজনকেও দেখতে না পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। পরমুহূর্তে ভাবল, আছে কোথাও, ডাকলেই চলে আসবে। নিজেকে একটু তিরস্কার করল সে, এতটা মগ্ন হয়ে পড়া উচিত হয়নি তার।

'এই, ফচেট, শুনতে পাচ্ছ?'

'আসছি,' বলে অন্ধকার থেকে একগাদা ডালপালা নিয়ে বেরিয়ে এল ফচেট।

চারদিকে তাকাল আবার জ্যাসন। 'সেটা কোথায়?'

হাঁ হয়ে গেল ফচেটের মুখ। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? সে তো তোমার সাথে ছিল।'

'অসম্ভব! তোমার সাথে ছিল!' মারমুখো হয়ে এগিয়ে এল জ্যাসন।

ঝগড়া শুরু করে দিল ওরা। কিন্তু কোন মীমাংসা হচ্ছে না দেখে দু'জনই এক সময় থামল। জ্যাসনের বিশ গজ ডানদিকে বড় গাছ, সেদিকে তাকাল ও। 'শেষবার ওদিকে দেখেছি। গেল কোথায়?'

হাতের ডালপালা ফেলে দিয়ে এক ছুটে গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল ফচেট। কিন্তু কোথাও দেখল না এজিয়োকে। 'ওহে, গেলে কোথায়?' গলা ছেড়ে ডাকল সে। 'আমরা এখানে, ফিরে এসো।'

হাতের রিভলভার নিয়ে ফচেটের পাশে এসে দাঁড়াল জ্যাসন। 'পালিয়েছে। কিন্তু এখনও খুব বেশি দূর যেতে পারেনি। এসো!' বলেই ছুটল সে।

তাকে অনুসরণ করল ফচেট। গরম বালিতে পা দেবে গেল ওদের। ফলে দ্রুত এগোতে পারল না ওরা।

'শালাকে একবার পেয়ে নিই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জ্যাসন। 'কাপড়ে পেশাব করিয়ে তবে ছাড়ব।'

শুকনো ঘাসের শক্ত চাপড়ায় হোঁচট খেয়ে বারবার পড়ে যাবার উপক্রম করল ফচেট। জুতোর ভেতর পা দুটো থেঁতলে গেল তার। মনে মনে চাইল, জ্যাসন

দাঁড়িয়ে পড়ুক, তা নাহলে থামতে পারছে না সে। তারপর আবার ভাবল, এজিয়ো কি সত্যি পালিয়েছে? গাড়িটাকে যদি বালি থেকে তোলা না যায়?

এভাবে কতক্ষণ ছুটেছে ওরা, বলতে পারবে না। ফচেটের মনে হলো একযুগ। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সে। জ্যাসনকে এখন তার আর ভয় করছে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ খুলে হাঁপাতে লাগল। ওর মনে আর কোন সন্দেহ নেই, পালাতে পেরেছে এজিয়ো।

ফচেটের চেয়ে শারীরিক অবস্থা ভাল জ্যাসনের, তার চেয়ে আরও কয়েক মিটার বেশি ছুটতে পারল সে। তারপর সে-ও থামল।

কান খাড়া করে কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা শোনার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু নিজেদের হার্টের ধড়াস ধড়াস ছাড়া আর কিছু ঢুকল না কানে।

ক্লান্ত পায়ে ফচেটের কাছে ফিরে এল জ্যাসন। কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না কেউ। তারপর মুঠো করা হাত দুটো মাথায় তুলে জ্যাসন বলল, 'কুত্তার বাচ্চা ভেগেছে! ওদের বাড়িতে ফিরে যাব আমরা, মোটুর গলা কাটব। এসো…গাড়িটাকে তুলি আগে।'

হাঁটার আর শক্তি নেই ফচেটের, তবু ক্লান্ত পা তুলে জ্যাসনের পিছু নিল সে। অন্ধকারকে তার ভয় করতে লাগল। খুব বেশি হলে সামনে এক মিটার দেখতে পাচ্ছে। দেখেশুনে সমতল বালিতে পা ফেলছে, কিন্তু তবু যেন সদ্য মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা শক্ত ঝোপের সাথে হোঁচট খাচ্ছে পা।

একটা বড় গাছকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। আরও কয়েক গজ এগিয়েও গাড়িটাকে দেখতে পেল না। দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে তাকাল।

তারপর পরস্পরের দিকে ফিরল ওরা।

'গাড়ি?' ফিস ফিস করে জানতে চাইল ফচেট, আতঙ্কে কেঁপে গেল তার গলার আওয়াজ।

'এখানেই তো ছিল!' জ্যাসনের গলাও কেঁপে গেল, এই প্রথম ভয় পেয়েছে সে।

'কিন্তু… নেই কেন?'

'কি জানি…বুঝতে পারছি না,' বলল জ্যাসন। ভয়ে ভয়ে চারদিকে আরেকবার তাকাল সে। 'তোমার ঠিক মনে আছে, এই জায়গাতেই ছিল গাড়িটা?'

'কি জানি…তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তোমার মনে হয়,' জানতে চাইল জ্যাসন, 'ফিরে এসে গাড়িটা নিয়ে গেছে?'

'তা সম্ভব নয়,' বলল ফচেট। 'আমরা সবাই মিলে বালি থেকে তুলতে পারিনি, ও একা পারবে কিভাবে? তাছাড়া, আওয়াজ হত না?'

'অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলাম আমরা,' বলল জ্যাসন। 'ফিরতে কতক্ষণ লেগেছে বলতে পারো? আধ ঘণ্টা?'

'কি জানি।'

বোকার মত এদিক ওদিক তাকাল ওরা। কিছুক্ষণ আর কেউ কথা বলল না। বড় গাছটার দিকে তাকাল জ্যাসন। তারপর জানতে চাইল, 'আমাদের ভুল হচ্ছে

না তো? এই গাছটা কিনা ঠিক জানো?'

'কি করে বলব! দেখে তো তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু সব গাছই তো এটার মত দেখতে।'

'হ্যাঁ।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা।

'দুনিয়ার বুকে এই রকম একটা জায়গা আছে বাপের কালেও শুনিনি,' বলল ফচেট। 'এখন কি হবে?'

'আমরা হারিয়ে যাইনি তো?' বিড় বিড় করে জানতে চাইল জ্যাসন। জিভের ডগা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে। টপ টপ করে ঘাম ঝরছে থুতনি থেকে।

ঢোক গিলল ফচেট। 'অন্ধকার যে, বুঝব কিভাবে!' জবাব দিল সে। 'তোমার কি মনে হয়?'

ভয়ের গ্রাস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল জ্যাসন, বলল, 'আমরা বাচ্চা ছেলে নই!'

'কিন্তু শুনেছি এই বুশে একবার পথ হারালে বাঁচার কোন উপায় থাকে না,' বলল ফচেট। 'স্থানীয় অনেক লোকও নাকি এভাবে নিখোঁজ হয়েছে।'

'তোমার মত ভীতু লোককে নিয়ে চলা মুশকিল,' জ্যাসন বলল বটে, কিন্তু বলার মধ্যে যতটা ব্যঙ্গ আর ঝাঁঝ থাকার কথা তার ছিটেফোঁটাও থাকল না।

গাছের নিচে এসে বসে পড়ল সে। হেলান দিল গাছের গায়ে। 'ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এই আর কি!' একা থাকতে ভয় করছে ফচেটের, তাই সে-ও জ্যাসনের পাশে এসে দাঁড়াল। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আলো ফুটলে গাড়িটাকে দেখতে পাব। বালি থেকে তুলতে কষ্ট হবে, কিন্তু কাজটা অসম্ভব নয়। তারপর ফিরে গিয়ে মোটুর গলা যদি না কাটি তো আমার নাম জ্যাসন নয়।'

'গাড়িটাকে না হয় তোলা গেল,' জানতে চাইল ফচেট, 'কিন্তু পথ খুঁজে না পেলে তাতেই বা লাভ কি?'

'কেন, পথ খুঁজে পাব না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাসন। 'বালিতে আমরা চাকার দাগ রেখে আসিনি? ওই দাগ ধরে এগোলেই হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক, তাই তো!' হঠাৎ পরম স্বস্তি বোধ করল ফচেট। 'এটা আমার মাথায় আসেনি। তাহলে আর কোন চিন্তা নেই আমাদের।' একটু পর আবার বলল সে, 'ইস, এখন যদি এক ক্যান বিয়ার পেতাম!'

'শাট আপ!'

ভোর তিনটের দিকে বাতাস উঠল। প্রথমে মৃদুমন্দ, তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল তেজ। ঠিক ঝড় উঠল না, তবে ঝড়ের চেয়ে কোনদিক দিয়ে কমও গেল না। ঝাড়া দু'ঘণ্টা বইল এই বাতাস। বালির ওপর বুইকের চাকার দাগ সকাল হবার অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

নয়

ক্যাডিলাকের হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটা গাড়ি, পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপিয়ান পোশাক পরা ঝড়ো কাকের মত দু'জন আফ্রিকান।

দু'জনের একজনকে একটু চেনা চেনা লাগল বুলিনের, ড্রাইভারকে দ্রুত নির্দেশ দিল সে, 'থামো!' গাড়িটাকে কয়েক গজ ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাডিলাক, দরজা খুলে নেমে পড়ল বুলিন।

আফ্রিকানদের একজন এক ছুটে তার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে চিনতে পারল বুলিন। তারই লোক, জাহের।

'এখানে কি করছ তোমরা?' জবাব চাইল বুলিন। 'আর সবাই কোথায়?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত নেড়ে যা ঘটেছে সব বলতে শুরু করল জাহের। মাত্র কয়েকটা কথা শুনল বুলিন, রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল, কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখল সে। বাধা দিয়ে বলল, 'বুঝলাম, অ্যামবুশ ব্যর্থ হয়েছে। তোমার দু'জন লোক মারা গেছে। কিন্তু ওরা?'

'পা-পালিয়েছে, স্যার!' আতঙ্কে ঘন ঘন ঢোক গিলছে জাহের।

'কতক্ষণ আগে?'

'অনেকক্ষণ হলো, স্যার···ঘণ্টাখানেক।'

'রানার সাথে যারা ছিল, কি রকম দেখতে?'

জ্যাসন আর ফচেটের চেহারার বর্ণনা দিল জাহের। তারপর বলল, 'ওদের জন্যেই তো সব ভণ্ডুল হয়ে গেল, স্যার। ওরা না থাকলে রানাকে আমরা ঠিকই শেষ করতে পারতাম।' বুলিন যে অনেক কষ্টে রাগ চেপে রাখছে, চেহারা দেখেই টের পেল সেটা। 'দোষ আমাদের নয়।'

'গাড়িতে ওঠো।'

অপর লোকটার নাম দাউদ। নাকের পাশে পুরানো, শুকনো ক্ষত। ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে জাহেরের পিছু পিছু সামনের সীটে উঠে বসল সে। শোফার লোকটা ওদের দিকে তাকাল একবার, দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল তার।

পিছনের সীটে বসল বুলিন। 'দিউগবেল। কুইক।'

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিতে ঠাণ্ডা মাথায় পরবর্তী করণীয় বিবেচনা করতে শুরু করল বুলিন। পোলো গায়েব হয়ে গেছে। নিকোলাইয়ের রিপোর্ট, নিজের বাড়িতে ফেরেনি সে। নির্দেশ পেয়ে পোলোর বাড়ির সামনে থেকে সরে আসছে নিকোলাই, দিউগবেলে দেখা হবে ওদের।

রানা যে ওয়েন প্যাকারের সাথে দেখা করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে, সে-ব্যাপারে বুলিনের মনে কোন সন্দেহ নেই। নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, জিতে গেছে রানা। এত আটঘাট বেঁধে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও পোলোকে নিয়ে কেটে পড়েছে ও। এর আগে পর্যন্ত রানাকে ছোট করে দেখেছে বলে নিজেকে

তিরস্কার করল সে বারবার।

ওয়েন প্যাকারের সাথে দেখা করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে রানা, এই চিন্তাটা মাথা খারাপ করে দিল বুলিনের। একা গেছে, নাকি সাথে পোলোও আছে? কাফেতে কথা বলার সময়ই পোলোর কাছ থেকে প্যাকারের ঠিকানা পেয়ে থাকতে পারে রানা।

সব ঠিক থাকত, জাহের যদি মেরে ফেলতে পারত রানাকে। দেরি করে হলেও, বাড়িতে ফিরতেই হত পোলোকে। তার দেখা পেলে কথা আদায় করা কোন সমস্যাই হত না।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল বুলিন। পরিস্থিতি খারাপ বটে, তবু হতাশ হবার মত নয়। রানা মরু-ঝোপে যাচ্ছে, সেখানে ত্রিশজন লোক আছে তার। এরা প্যাকারকে খুঁজছে, এখন রানাকেও খুঁজবে। পালিয়ে যাবে, সে উপায় নেই রানার। এই ত্রিশজন মরু-ঝোপের প্রতিটা ইঞ্চি চেনে। রানা যদি প্যাকারকে পায়ও, ধরা না পড়ে প্যাকারকে নিয়ে মরু-ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

জ্যাসন, ফচেট আর এজিয়ো মরু-ঝোপে ঢোকার দশ মিনিট পর দিউগবেলে পৌঁছল ক্যাডিলাক। মেইন রোড থেকে খানিকটা দূরে ছোট একটা ভিলার সামনে থামল গাড়ি। ভাড়া নিয়ে এই ভিলাটাকে বিকল্প হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে বুলিন।

গাড়ি থেকে নেমে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। পিছু পিছু আসছে জাহের আর দাউদ। দরজার সামনে থেমে কপাটের গায়ে পরপর তিনটে টোকা দিল সে। দরজার গায়ে ছোট একটা জানালা, সেটা খুলে গেল। ভেতরে শুধু চোখ দেখা গেল এক জোড়া। এক সেকেন্ড পর খুলে গেল দরজা।

'রোমানভ আছে?' দরজার সামনে দাঁড়ানো প্রকাণ্ডদেহী আফ্রিকানকে জিজ্ঞেস করল বুলিন।

'ইয়েস, স্যার।'

খাড়া তর্জনী ঝাঁকিয়ে জাহের আর দাউদকে ওখানেই দাঁড়াবার নির্দেশ দিল বুলিন, তারপর আফ্রিকানকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। প্যাসেজ ধরে দ্রুত এগোল সে, খোলা দরজা দিয়ে মাঝারি একটা কামরায় পা রাখল।

ডেস্কের পিছনে বসে আছে একজন লোক। লোকটার মাথায় হেডফোন। তার সামনে একটা ওয়াকি-টকি, আঙুল দিয়ে ডায়াল ঘোরাচ্ছে সে। বাঘের মত রাগী চেহারা, চোখে-মুখে গভীর মনোযোগের ভাব ফুটে আছে। এরই নাম ভ্যাসিলি রোমানভ। বয়স চল্লিশ, শরীরের কোথাও এক ছটাক মেদ নেই, কিন্তু হাড়গুলো সাংঘাতিক চওড়া হওয়ায় তাকে রোগা বলার উপায় নেই। এই লোকের চোখের দৃষ্টি রোদ লেগে ঝিক্ করে ওঠা ছুরির ফলার মত, যার দিকে তাকায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার। কে.জি.বি.-র সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ-শিকারী বলে খ্যাতি আছে তার।

মুখ তুলে বুলিনকে দেখল সে, মুখভঙ্গি করে বোঝাল পরিস্থিতি গুরুতর, তারপর আবার মন দিল ডায়াল ঘোরাবার কাজে।

পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে সেটায় বসল বুলিন। ডেস্কের ওপর থেকে

ভোদকার বোতল তুলে নিয়ে খালি একটা গ্লাসে খানিকটা ঢালল সে, সবটুকু এক ঢোকে গলাধঃকরণ করল। ট্রের ওপর আর সব গ্লাসের পাশে নিজের গ্লাসটা রাখতে গিয়েও রাখল না, বোতল থেকে আরেকটু ভোদকা ঢালল তাতে।

নিঃশব্দে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল সে। তাকিয়ে আছে রোমানভের দিকে, সামনে মেলা বড় একটা স্কেল ম্যাপের ওপর চোখ বুলাচ্ছে রোমানভ।

'পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করো,' মাইক্রোফোনে বলল সে, তারপর অফ করে দিল সেট।

'বলো।'

'জাল ছোট হয়ে আসছে,' বলল রোমানভ। 'আমাদের সবচেয়ে কাছের লুক-আউট থেকে এইমাত্র একটা গাড়ির আলো দেখা গেছে, মাইল দশেক দূরে। লুক-আউটের লোকটা নিশ্চয়ই কোন গাছের ওপর ছিল, তা না হলে দেখতে পেত না। পুবদিকে যাচ্ছে গাড়িটা। আমার ধারণা, প্যাকারের সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছে ওটা।'

মাথা নাড়ল বুলিন। 'না,' বলল সে। 'প্যাকারের কাছে রানাকে নিয়ে যাচ্ছে।' উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রোমানভের পেছনে, তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল খোলা স্কেল ম্যাপের ওপর। 'কোথায় দেখা গেছে?'

ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল রোমানভ। 'এইখানে।' পেন্সিল তুলে নিয়ে কয়েক জায়গায় একটা করে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে। 'এখানে, এখানে, আর এখানে লোক রয়েছে আমাদের। গাড়িটা যাচ্ছে এদিকে।' পেন্সিল দিয়ে একটা রেখা আঁকল। 'এই রেখা পর্যন্ত একটা অর্ধবৃত্ত জুড়ে আমাদের লোককে পাবে তুমি, তারমানে,' ম্যাপের গায়ে পেন্সিল দিয়ে টোকা দিল সে, 'এই এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে প্যাকার।'

ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখে মাথা ঝাঁকাল বুলিন। 'হ্যাঁ, তাই। বৃত্তটাকে পুরো করার মত যথেষ্ট লোক আছে তোমার?'

'খুব বেশি ফাঁক ফাঁক করে ছড়িয়ে দিলে পুরো করা যায়,' বলল রোমানভ। 'কিন্তু প্যাকার যদি রাতের বেলা চেষ্টা করে, জাল গলে বেরিয়ে যেতে পারবে সে।'

'আরও লোক পেতে পারি আমরা?'

'এরই মধ্যে লোকের ব্যবস্থা হয়েছে,' জানাল রোমানভ। 'কাল সকালে পজিশন নেবে তারা।'

নিজের চেয়ারে ফিরে এলো বুলিন। গ্লাস তুলে চুমুক দিল।

'প্যাকার কোথায় আছে রানা তাহলে জানে?' গম্ভীর হয়ে উঠল রোমানভের চেহারা। 'রানা অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার মত বুদ্ধি, আর সাহস তার আছে। এই আফ্রিকানগুলো ফাইট দিতে জানে না।'

'নিকোলাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি,' বলল বুলিন। 'ও এসে পৌঁছলেই ঢুকে যাব আমরা। তুমিও যাচ্ছ। যে-কোন ঝুঁকি নিতে হবে আমাদের, কোথাও কোন ফাঁক রাখা চলবে না।'

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল রোমানভ। মেসেজ

শোনার সময় তার ভুরু কুঁচকে উঠল। মাইক্রোফোনে বলল, 'ধরে থাকো।' তাকাল বুলিনের দিকে। 'আরেকটা গাড়ি দেখা গেছে।' ম্যাপটা পরীক্ষা করল সে। 'দক্ষিণ-পুব দিকে যাচ্ছে ওটা। মিনিট দশেক আগে আমাদের একটা লুক-আউটকে পাশ কাটিয়ে গেছে ওটা। পুরানো একটা বুইক, ভেতরে তিনজন লোক।'

'ওতেই আছে রানা!' বলেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল বুলিন। 'জাহেরের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে ও।'

'ঠিক আছে, তাই যদি হয়, ভুল পথে যাচ্ছে সে,' শান্ত সুরে বলল রোমানভ। 'তাহলে প্রশ্ন হলো, প্রথম গাড়িটায় কে আছে? পথ ভুল হয়নি তার··· কে সে?'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বলল বুলিন। 'ওতে করে হয়তো প্যাকারের সাপ্লাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'রানার ব্যাপারে কি করা হবে?' জানতে চাইল রোমানভ, ভোদকার বোতলটা তুলে নিল সে।

'ওর কথা ভুলে গেলেই পারি আমরা,' বলল বুলিন। 'বোঝাই যাচ্ছে, তার সাথে গাইড নেই। হারিয়ে গিয়ে নিজেই আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে ও।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নিকোলাই।

'সময় মতই এসেছ,' বলল বুলিন। 'আমরা বুশে যাচ্ছি।'

'কিন্তু পোলো?'

'তাকে এখন আর না পেলেও চলবে। দশ মাইলের মধ্যে কোথাও আছে প্যাকার, এটুকু জানা গেছে। কাল সকালের মধ্যে তাকে আমরা পেয়ে যাব।'

মাইক্রোফোনে কথা শেষ করে সেটটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রোমানভ। বাইরে একটা জীপ অপেক্ষা করছে। তাকে অনুসরণ করে বুলিন আর নিকোলাইও বেরিয়ে এল।

'তোমরা দু'জনেই আমাদের সাথে যাবে,' জাহেরকে বলল বুলিন।

জাহের আর দাউদ পরস্পরের দিকে অস্বস্তির সাথে তাকাল। মরু-ঝোপে যাবার কোন ইচ্ছে নেই ওদের। কিন্তু বুলিনের কথার ওপর কথা বলার সাহসও নেই। বুকে ভয়ের কাঁপুনি নিয়ে বুলিনের পিছু পিছু এগোল ওরা।

প্রায় দু'ঘণ্টা হলো গাড়ি চালাচ্ছে লুনা। বালির ওপর গর্ত আর ঢালের সাথে মানিয়ে চলতে পারে, ছোট গাড়িটার স্প্রিং সেভাবে তৈরি করা হয়নি। গর্তগুলোকে এড়াবার চেষ্টা প্রায় কোনবারই সফল হলো না তার, একটাকে এড়ানো সম্ভব হলে আরেকটার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। গাড়ির মতিগতি হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ সাগরে খুদে একটা বোটের মত।

ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মত লাগল রানার। মরু-ঝোপে আগে কখনও আসেনি ও, পাঁচ সেকেন্ডে এই রকম দু'তিনবার করে ঝাঁকি খাওয়ার অভ্যেস নেই। কনুই, হাঁটু, খাড়, পাঁজর সব ব্যথা করতে শুরু করল। গাড়ির জানালার সাথে বাড়ি খেয়ে ফুলে গেল কপাল। শরীরের চামড়া ছড়ে গেল কয়েক জায়গায়।

কয়েকবারই বালিতে আটকে গেল গাড়ির চাকা। প্রতিবার নামতে হলো ওদেরকে। মোহারের সাথে নিচে নেমে বালি থেকে গাড়িটা ওপরে তুলে ধরল রানা, যতক্ষণ না আবার চলতে শুরু করল। ভাপসা গরমে অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা কাজ।

'আর কতদূর যেতে হবে?' শুকনো বালিতে আরেকবার গাড়ির চাকা ডেবে গেলে জানতে চাইল রানা।

'প্রায় আশি কিলোমিটার···আরও অন্তত এক ঘণ্টা,' গাড়ি থেকে নামার সময় বলল লুনা। নিচে নেমে আড়মোড়া ভাঙল সে। শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। টনটন করছে পেশীগুলো।

মোহারের সাহায্য নিয়ে গাড়ির চাকা শক্ত বালিতে তুলে ফেলল রানা। এগিয়ে এসে লুনার সামনে দাঁড়াল। 'হেডলাইট দুটোকে নিয়ে চিন্তায় আছি,' বলল ও। 'তোমার ধারণা যদি ঠিক হয়, মানে, বুলিনের লোকেরা সত্যিই যদি কাছাকাছি কোথাও তাদের লুক-আউটে থাকে, গাড়ির আলো তাদের চোখে না পড়েই পারে না। এক কিলোমিটার দূর থেকেও দেখতে পাবে।'

'কিন্তু হেডলাইট ছাড়া আমি গাড়ি চালাব কিভাবে?' জানতে চাইল লুনা।

'এক কাজ করলে পারা যায়,' বলল রানা। 'এখানে থেমেছি, আপাতত আর এগোবার দরকার নেই। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তখন হেডলাইট না জ্বেলেও গাড়ি চালানো যাবে।'

'উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়,' একটু জেদের সুরে বলল লুনা। 'বাবা সারারাত একা থাকবে।'

'বুলিনের লোকদের তার কাছে নিয়ে যাওয়ার চাইতে একা থাকা অনেক নিরাপদ,' যুক্তি দিয়ে লুনাকে বোঝাতে চেষ্টা করল রানা।

'কিন্তু···' প্রতিবাদ করে কিছু বলতে শুরু করল লুনা, রানা তাকে থামিয়ে দিল।

'আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক তাই করছি,' বলল ও। 'বুলিনের লোকদের নিয়ে যাচ্ছি তোমার বাবার কাছে। উঁচু একটা গাছের মগডাল থেকে একজন লোক সমতল জায়গার অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়।'

থমথমে চেহারা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল লুনা, তারপর মাথা কাত করে বলল, 'ঠিক এই কথাটা ভাবিনি। বেশ, তবে তাই হোক, আমরা অপেক্ষাই করি।' চোখের সামনে হাত তুলে লিউমিনাস ঘড়ির ডায়াল দেখল সে। 'কিন্তু আলো ফুটতে আরও ছ'ঘণ্টা।'

'তাহলে ছ'ঘণ্টাই অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' বলে বালির ওপর পা লম্বা করে বসে পড়ল রানা। 'গরমে গা একেবারে পুড়ে গেল! গলাটা যদি একটু ভেজাতে পারতাম!'

'মোহার, ওর কথা শুনতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল লুনা।

'আসছি,' গাড়ির ভেতর থেকে সাড়া দিল মোহার। এক সেকেন্ড পর হাতে বড়সড় একটা ফ্লাস্ক আর দুটো গ্লাস নিয়ে নেমে এল সে। ওগুলো ওদের সামনে

রেখে গাড়ির উল্টোদিকে চলে গেল বুড়ো, বালির ওপর শুয়ে খানিক বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার নাক ডাকার শব্দ শুনে হাসি পেল রানার।

রানার সামনে বসে ফ্লাস্ক থেকে ঠাণ্ডা অরেঞ্জ স্কোয়াশ ঢালল লুনা। ভরা একটা গ্লাস রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ঠাণ্ডা স্কোয়াশে কয়েকটা চুমুক দিতেই গা যেন জুড়িয়ে গেল। 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল ও। 'বুদ্ধি করে জিনিসটা এনেছ বলে।'

লুনা চুপ করে থাকল।

লুনার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল রানা, হালকা গলায় বলল, 'এত সুন্দর গাড়ি চালাতে জানো, শিখলে কোথায়?'

প্রশংসা শুনে হাসল লুনা। বলল, 'আমার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত দিউগবেলে মানুষ হয়েছি আমি। মোহারকে সাথে নিয়ে কতবার এই বুশের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া-আসা করেছি তার কোন হিসেব নেই। বালির ওপর গাড়ি চালাবার টেকনিক কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই যে-কেউ রপ্ত করে নিতে পারে।'

'তুমি এখানে মানুষ হয়েছ মানে?' অবাক দেখাল রানাকে। 'তোমার বাবা কি…?'

'না। আমার জন্মের তিন মাস আগে ফ্রান্সে চলে যান বাবা,' বলল লুনা। 'আমি মায়ের কাছে বড় হয়েছি।'

পারিবারিক অশান্তির আভাস পেল রানা। অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে বলে চুপ করে থাকল ও, কিন্তু জিজ্ঞেস না করেও লুনার কাছ থেকে কিভাবে সব কথা আদায় করা যায় তার একটা উপায় হাতড়াতে শুরু করল ও।

তার দরকার হলো না, লুনা নিজেই আবার বলতে শুরু করল, 'মায়ের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়নি বাবার। সেনেগালে বাবার ব্যবসা ছিল, সেখান থেকে যা আয় হত সব আমরা পেতাম, বাবাই সে-ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।'

'ফ্রান্সে কি করতেন তিনি?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা কেউ কিছু জানতাম না,' বলল লুনা। 'অনেক বছর পর একবার খবর পেলাম, আমেরিকায় গেছেন। খবরটা আমরা পাই পোলো কাকার কাছে থেকে। বাবার বন্ধু উনি, ব্যবসার পার্টনারও। তারপর, আমি যখন বড় হয়েছি, খবরের কাগজে একদিন ছাপা হলো, আমার বাবা একজন স্পাই। জানলাম, এতদিন তিনি আমেরিকার হয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু সবাইকে বোকা বানিয়ে দল বদল করে চলে গেছেন রাশিয়ায়।'

অস্বস্তি লাগল রানার। সবটা জানা নেই ওর, কাজেই কি বলে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না।

'ব্যাপারটা প্রচণ্ড এক আঘাত হয়ে দেখা দেয়,' নিচু গলায় বলল লুনা। 'সেটা আজ প্রায় চার বছর আগের ঘটনা। এর মাস দু'য়েক পরই মারা গেল মা। আমি চলে গেলাম প্যারিসে।'

'প্যারিসে কার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

'কারও কাছে না,' বলল লুনা। 'আমি একাই থাকতাম। কোথায় থাকি,

পোলো কাকা খবর রাখতেন। আমিও তাঁকে চিঠি-পত্র লিখতাম। টাকা-পয়সা নিয়মিত পাঠাতেন, আমাকে কখনও অভাবের মুখ দেখতে হয়নি। লেখাপড়া বেশ ভালই চলছিল। এক সময় হঠাৎ করে একদিন এখান থেকে গিয়ে হাজির হলো জেসমিন।'

'ওকে তুমি আগে থেকেই চিনতে?'

'চিনতাম মানে? ও তো স্কুলে আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিল। তবে উঁচু ক্লাসে ওঠার পর ওর সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। গরীবের মেয়ে, অল্প বয়সেই বখে গিয়েছিল। তাতেও কিছু এসে যেত না, কিন্তু পোলো কাকার সাথে ওর সম্পর্কটা দিনে দিনে লোকের চোখে খারাপ লাগতে লাগল, আমি নিষেধ করাতেও ক্ষান্ত হলো না। পোলো কাকা শ্রদ্ধাভাজন মানুষ, এ নিয়ে আমি তো আর তার সাথে ঝগড়া করতে পারি না!'

'তারপর?'

'ও প্রসঙ্গ থাক,' বলল লুনা। 'তারপর কি ঘটল সেটাই বরং বলি।'

'হ্যাঁ।'

'প্যারিসে গিয়ে জেসমিন আমাকে বাবার একটা চিঠি দিল,' বলল লুনা। 'জন্মের পর এই প্রথম বাবা আমার সাথে যোগাযোগ করল। কিন্তু জেসমিনের আচরণ কেমন যেন রহস্যময় লাগল আমার। কোন কথাই জানাতে চাইল না আমাকে সে। চিঠিটা দিয়েই চলে গেল।'

'ঠিক জানো ওটা তোমার বাবার চিঠি ছিল?'

'হ্যাঁ,' বলল লুনা। 'ওটার সাথে পোলো কাকারও একটা চিঠি ছিল।'

'কি লিখেছিলেন তোমার বাবা?'

'লিখেছিলেন, রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং সীন ওয়াটকে দেবার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আছে তাঁর কাছে,' বলল লুনা। 'সীন ওয়াট কে, আমি জানতাম না। চিঠিতে বাবা আরও জানালেন, ওয়াট বাবাকে বিশ্বাস না-ও করতে পারে। তাই আরেকজন লোকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে, তার নাম মাসুদ রানা। চিঠি পড়ে বুঝলাম, বাবা এই লোককে আর সবার চেয়ে একটু বেশি বিশ্বাস করেন।'

হেসে ফেলল রানা। 'তারপর?'

'মাসুদ রানাকে কোথায় পাওয়া যাবে,, চিঠিতে সে-কথা বলতে পারেননি বাবা,' বলল লুনা। এক মুঠো বালি তুলে নিল সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুর ঝুর করে পড়ে যেতে দিল। 'তবে জানালেন, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি নামে একটা ফার্ম আছে তার, প্যারিসেও এই ফার্মের শাখা আছে বলে শুনেছেন। চিঠিতে বাবা আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন, আমি যেন ঠিক লোকটাকে খুঁজে বের করি।'

'তুমি আমার খোঁজ পেলে কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'সে কথায় পরে আসছি,' বলল লুনা। 'এরপর পোলো কাকার চিঠি খুললাম। পোলো কাকা লিখেছেন, বাবা গুরুতর অসুস্থ। কি করব ভেবে পেলাম না। তারপর হাত দিলাম কাজে। টেলিফোন গাইড ঘেঁটে রানা এজেন্সির ঠিকানা

জোগাড় করলাম। অফিসেও গেলাম একদিন। তোমাকে পেলাম না, কিন্তু জানলাম তুমি প্যারিসে ছুটি কাটাতে এসেছ। এরপর তোমার ওপর আমি নজর রাখতে শুরু করি।'

'কেন?'

'বাবা বলে দিয়েছিলেন, ঠিক লোককে খুঁজে বের করতে হবে, তাই,' বলল লুনা। 'তাছাড়া, বাবা তোমার সম্পর্কে বিরাট একটা সার্টিফিকেট দিলেও, তোমাকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তুমি সত্যি বাবার চেনা মাসুদ রানা কিনা, তুমি লোকটা কেমন এই সব জানার জন্যে সেই পার্টিতে তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হই আমি···' হেসে উঠল লুনা। '···এবং আমার আবছা ইঙ্গিতের ফাঁদে ধরা পড়ো তুমি।'

'তারপর?' গম্ভীর হলো রানা।

'তারপর কি হয়েছে তুমিও তা জানো।'

'তোমার বাবা চিঠিতে আর কিছু লেখেননি?'

'কার্ল হফার নামে একজন লোকের কথা লিখেছিলেন,' বলল লুনা। 'লোকটা সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, আমার পরিচয় এই লোক যেন কোনমতেই জানতে না পারে। আমার এক বান্ধবী একটা দৈনিকে কাজ করে, তার কাছ থেকে জানলাম, লোকটা হিলটন হোটেলে থাকে। বাবা নিষেধ করলেও, তার মতিগতি বোঝার জন্যে একদিন সন্ধেবেলা হিলটনে গিয়েছিলাম। দেখা করিনি, আশেপাশে ঘুর ঘুর করে চলে আসি···' হঠাৎ চুপ করে গেল লুনা, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'চওড়া লোকটাকে কোথায় দেখেছি, এইবার আমার মনে পড়েছে! কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছ? যাকে তুমি মার-ধর করে ফেলে রেখে এলে। রোগা-পাতলা আরেকটা লোকের সাথে হিলটন হোটেলের বাইরে একটা গাড়িতে বসে ছিল সে।'

'তা হতে পারে,' বলল রানা। 'হফারের ওপর নজর রাখার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করে সীন ওয়াট। কেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। হফার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি সে, তবে আশাটা কখনও ত্যাগ করেনি।'

'এখন আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে,' বলল লুনা, 'গাড়িতে আরও একজন উঠেছিল—থুতনির কাছে একটু দাড়ি আছে। কারা ওরা?'

'ওরা সবাই ওয়াটের কাজ করে,' বলল রানা, তারপর প্রসঙ্গ বদলাল সে, জানতে চাইল, 'ওয়াটের জন্যে তোমার বাবা কি ধরনের ইনফরমেশন নিয়ে এসেছেন, সে-সম্পর্কে তুমি কিছু জানো? মানে, তোমার বাবা তোমাকে কোন ধারণা দিয়েছেন?'

'না। এসব বিষয়ে বাবা আমার সাথে কোন আলাপ করেননি।'

'আমাকে তুমি খুঁজে পেয়েছিলে, তিনি জানেন?'

'হ্যাঁ, বলেছি আমি।'

'শুনে কি বললেন?'

'রাগ করলেন। তোমাকে সব জানাইনি, তাই। আরেকটা কথা···'

'কি কথা?'

'জেসমিনকে সীন ওয়াটের সাথে যোগাযোগ করতে পাঠানো হয়, বলল লুনা। 'মেসেজে বাবা তাকে অনুরোধ করেন, ওয়াট যেন তার নিজের লোকদের কাউকে বাবার সাথে দেখা করার জন্যে না পাঠায়।'

'কেন?'

'ঠিক বলতে পারব না,' বলল লুনা। 'সম্ভবত ওয়াটের সব লোককে বাবা বিশ্বাস করেন না।'

'হুঁ,' গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'বিশ্বাস না করার কারণ আছে। ওয়াটের কিছু লোক ডাবল এজেন্ট, তোমার বাবা সম্ভবত সে-খবর রাখেন।'

'হতে পারে।'

বালির ওপর কাত হয়ে পড়ল রানা, ঘুম পাচ্ছে ওর। জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমাবে নাকি?'

অন্যমনস্ক দেখাল লুনাকে, বিড়বিড় করে বলল, 'একা একা বাবা কি করছেন কে জানে!'

'কি রকম অসুস্থ তিনি?' জানতে চাইল রানা। 'হাঁটাচলা করতে পারেন?'

'তা পারেন, কিন্তু ঘর থেকে বেরোন না বললেই চলে।'

'অসুখটা কি তা বলেননি?'

'না।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। তারপর জানতে চাইল রানা, 'শোবে?'

চমকে উঠল লুনা। 'কি বললে?'

'জিজ্ঞেস করছি, একটু ঘুমিয়ে নেবে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে লুনা বলল, 'ঘুম আসবে না।' কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'তারচেয়ে গল্প করি এসো। সময়টা কেটে যাবে।'

'কি গল্প?'

'তোমার জীবনের কথা বলো।'

'আমার আবার জীবন, তার আবার গল্প!'

'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?'

'বলার মত তেমন কিছু নেই, তাই,' বলল রানা।

'কিন্তু বাবার মুখে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যেবাদী তুমি।'

হেসে ফেলল রানা। 'শুনেই যদি থাকো, নতুন করে জানতে চাও কেন?'

'বাবা তোমার কর্ম-জীবনের কথা বলেছেন,' বলল লুনা। 'আমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে চাই।'

'ঠিক আছে, কি জানতে চাও জিজ্ঞেস করো।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে জানতে চাইল লুনা, 'বিয়ে…'

'না।'

'প্রেম?'

'হ্যাঁ।'

'কে সেই ভাগ্যবতী?'

'বেশ কয়েকজন। কারও সাথেই অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, কে কোথায় আছে ঠিক জানাও নেই…'

'এ আবার কি ধরনের প্রেম? যোগাযোগই নেই!'

'ইচ্ছে করলে যোগাযোগ করতে পারি, কিন্তু করি না।'

'জানতে পারি, কেন?'

'উত্তরটা আমার নিজেরই জানা নেই।'

'ঝগড়া, অভিমান, তারপর দূরে সরে যাওয়া—ব্যাপারটা কি এই রকম কিছু?' জানতে চাইল লুনা।

'না, আরও জটিল,' বলল রানা। 'কাউকে নিয়ে আমার ঘর বাঁধা হবে না কোনদিন।'

'সে কি! কেন?'

'ঘরের লোক আমি নই।'

'এ আবার কি পাগলামি!'

'পাগলামি নয়, সমস্যা। আমার পেশা আর প্রকৃতি, দুটোই ঘর বাঁধার শত্রু। আমি মুক্ত বিহঙ্গ। পিছুটান থাকলে পেশায় আমি খারাপ করব।'

'তাহলে প্রেমে পড়া কেন?' রেগে উঠল লুনা।

'ঠিক,' ম্লান হেসে সায় দিল রানা। 'উচিত নয়। কিন্তু কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে পড়ে যাই, কি করব!'

'তার মানে, এসব হালকা ব্যাপার, সত্যি সত্যিই গভীর কিছু না।'

'সব ক্ষেত্রে নয়, তা ঠিক। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সত্যিই গভীর। কষ্ট পাই না তা নয়, কিন্তু আমি নিয়তির নিরুপায় পুতুল। কপালের লেখনই আমার এরকম।'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল লুনা। ভাবছে।

'এবার তোমার কথা বলো।'

'আমার কথা?' অবাক হলো লুনা। 'আমার কোন কথা নেই।'

'তবু।'

'কি জানতে চাও?'

'বিয়ে হয়নি জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রেম?'

'সময় কোথায় পেলাম যে প্রেম করব?'

'কেন, ইউনিভার্সিটিতে ছেলের অভাব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওখানে শুধু লেখাপড়াই হয় এ-কথা বিশ্বাস করতে বোলো না।'

'কাউকে পছন্দ হয়নি।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'তা না হবারই কথা। তুমি যা সুন্দরী, তোমার সাথে মানাবে এমন ছেলে পাওয়া কঠিন।'

'তোমাকে কিন্তু আমার সাথে বেশ ভালই মানাত!'

কথাটা শুনে হাঁ হয়ে গেল রানা। শুনতে ভুল করেনি তো? 'কি বললে?'

'প্রথম বারই শুনেছ,' বলল লুনা। 'তুমি আর আমি, জোড়া ভালই মানাবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার সাথে প্রেম করব আমি। তোমার চেয়েও সুদর্শন পুরুষ আমি দেখেছি, কিন্তু তারা আমার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি। আমি চেহারা খুঁজছি না, ক্যারেক্টার খুঁজছি। পেলে প্রেম নিবেদন করতে দেরি করব না।'

'আরে, বেশ রীতিমত বক্তৃতা দিয়ে ফেললে দেখছি। তা, কি ধরনের ক্যারেক্টার খুঁজছ তুমি?'

'সাহস, বুদ্ধি, মহত্ত্ব, ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব, সততা ইত্যাদি গুণ...'

'কেউ কেউ বলে, এসব গুণ আমার নাকি আছে,' হাসি চেপে রাখল রানা। 'তুমি কি আমার প্রেমে পড়বে?'

'পড়ে গেছি,' হাসতে হাসতে বলল লুনা। 'তোমাকে দেখারও আগে। বাবার মুখে তোমার কথা শোনার পর থেকেই।'

হা-হা করে হেসে উঠল লুনা। তারপর রানার পাশে শুয়ে পড়ে বলল, 'আর কোন কথা নয়। আমি ঘুমাবার চেষ্টা করি, তুমি বাকি রাত বসে থেকে চিন্তা করো, আমার জাল থেকে বেরুবার উপায় কি!'

আর কোন কথা বলল না রানা। লুনার মাথায় একটা হাত রাখল ও। চুলে বিলি কাটতে শুরু করল। একসময় মনে হলো, লুনা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুতে যাবে রানা, কথা বলে উঠল সে।

'কি করি বলো তো? কোনমতেই ঘুম আসছে না!'

'কেন, ঘুম আসছে না কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বাবার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে,' বলল লুনা, উঠে বসল। 'ভাবছি, কাল কি ঘটবে? তোমার কি মনে হয়, এখান থেকে যাবার ব্যাপারে বাবাকে তুমি রাজি করাতে পারবে?'

'এখুনি রওনা হওয়াটা বোধহয় নিরাপদ হবে না।'

'কিন্তু ওই জঘন্য পরিবেশে আর কতদিন থাকবেন?'

ধীরে ধীরে বোঝাতে শুরু করল রানা, 'ইনফরমেশনগুলো আমাকে জানাবার পর হুফার বা রাশিয়ানদের কাছে তোমার বাবার আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। তখন তিনি বাইরে বেরিয়ে এলে কোন ঝুঁকি থাকবে না।'

'সত্যি?'

'তাই!'

'তাহলে আমি ঘুমাতে পারব বলে মনে হয়,' বলে আবার শুয়ে পড়ল লুনা। তার পাশে এবার রানাও শুলো। একটা হাত বাড়িয়ে রানার হাত ধরল সে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

রানার ঘুম এল আরও পরে।

দশ

আকাশে আলোর প্রথম আভাস ফুটতেই বাতাস ছাড়ল। ঘুম ভেঙে গেল রানার। সারা শরীরে বালি, মুখের ভেতরটা কিচকিচ করছে। উঠে বসে হাই তুলল ও।

ওর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল লুনা, ওর নড়াচড়াতে তারও ঘুম ভেঙে গেল। চোখ পিট পিট করল সে, মাথা তুলে চারদিকে তাকাল, তারপর উঠে বসল।

কাজের কথা তুলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু লুনার মুখের ওপর চোখ পড়তে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল ও। তাজা ফুলের মত সুন্দর লাগছে লুনাকে। শুধু সুন্দরী বললে মেয়েটার ওপর অবিচার করা হয়। সৃষ্টিকর্তা লম্বা ছুটি নিয়ে মনের আনন্দে শিল্প সৃষ্টির ইচ্ছে নিয়ে গড়েছেন ওকে—কথাটা আবার মনে হলো ওর।

'হেডলাইট না জ্বেলেও গাড়ি চালানো যাবে,' বলল রানা। হাতঘড়ি দেখল। চারটে পাঁচ। আবার একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়াল ও। 'ঘুম কম হওয়ায় ব্যথা করছে শরীর।'

শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বেলেছে মোহার। কফি তৈরি শেষ। ধূমায়িত কাপ দুটো ওদের সামনে রেখে ফিরে গেল সে। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা।

যে যার কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। ঠোঁট টেপা ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল লুনার মুখে।

'কি?' জানতে চাইল রানা। খালি হাতটা দিয়ে একদিন বয়েসী খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল।

'কাল রাতের কথা ভাবছি,' বলল লুনা। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। 'সব যদি ভালয় ভালয় শেষ হয়, তোমার সাথে আর কিছু না হোক, গল্প জমবে খুব। আমি তোমাকে বিরক্ত করে মারব।'

'কে কাকে বিরক্ত করবে বলা যায় না,' বলল রানা। 'চলো এবার।'

'মুখটাও ধোয়া হলো না!' রানার আগে আগে এগোল সে।

পিছনের সীটে এরই মধ্যে উঠে বসেছে মোহার। সামনের সীটে উঠল ওরা। কোন্‌দিক ধরে যেতে হবে তাই নিয়ে বুড়োর সাথে কিছুক্ষণ পরামর্শ করল লুনা। তারপর স্টার্ট দিল। আবার উঁচু-নিচু বালির ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। মরু-ঝোপের আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে ওরা।

কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে এসে বাঁশ আর খড়ের তৈরি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বড় একটা গ্রাম দেখল ওরা। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত চেহারার একজন আফ্রিকান, দেখে মনে হলো পাহারাদার। আলখাল্লার মত ঢোলা নীল রঙের পোশাক পরনে। ওদেরকে দেখল সে, কিন্তু চঞ্চল হলো না। গাড়িটা তাকে পাশ কাটাবার সময়ও তার নির্বিকার চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না।

'তুমি কি প্রায়ই এই পথে আসা-যাওয়া করো?' জানতে চাইল রানা।

'না। একই জায়গা দিয়ে দু'বার আসিনি কখনও। বাবার কাছে আসার পর থেকে দিউগবেলে গেছিই তো মাত্র দু'বার। তুমি ভাবছ, গ্রামের লোকেরা বলে দিতে পারে?'

'পারে না?'

'অন্যের ব্যাপারে এদের আগ্রহ কম,' বলল লুনা। 'যদি পিছু নেয় তবেই জানতে পারবে কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা। কিংবা এক গ্রামের লোক যদি আরেক গ্রামে গিয়ে খবর নেয়। অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ, কার এত দায় পড়েছে। দিউগবেলে না গিয়ে আমার কোন উপায়ও ছিল না, কত জিনিস লাগে!'

মরু-ঝোপের ভেতর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলেছে গাড়ি। এর চেয়ে একঘেয়ে ভ্রমণের কথা ভাবা যায় না। যেখানে, যতদূরেই যাও, দৃশ্যের কোন পরিবর্তন নেই, সব সেই একই।

একমাত্র বৈচিত্র্য যা চোখে পড়ল, রঙচঙে পাখির ঝাঁক। একসাথে এত জাতের পাখি আগে কখনও দেখেনি রানা। পাশ দিয়ে যেতে নিলেই ঝোপ থেকে দল বেঁধে আকাশে উড়ছে ওগুলো। নীল আর হলুদ রঙের খুদে তোতা আর শুক পাখিগুলো বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। বালির ওপর বসে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে, গাড়ি চাপা পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে উড়াল দেয়।

ওয়েন প্যাকারের কথা মনে পড়ল রানার। ওয়াশিংটন আর প্যারিসে বেশ কয়েকবারই ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছে। সিনিয়র লোক, সৎ, দুর্দান্ত সাহসী আর বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র—বেশ কিছু কাজ করে দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল রানা ওর সাথে কিছু শিখবে সেই আশায়। শিখেওছে। ওকে স্নেহ ও সমীহের চোখে দেখত ভদ্রলোক, ছোট করে দেখেনি কখনও। তখনই উপলব্ধি করেছিল রানা, ওর অন্তস্তল পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে লোকটা। রানাও তাকে চিনতে ভুল করেনি।

অনেক বছর দেখা নেই, তবু চেহারাটা এখনও পরিষ্কার মনে করতে পারে রানা। লম্বা, একহারা গড়ন, মাথা ভর্তি হালকা সোনালি চুল। এসপিওনাজ জগতে কত কী-ই না হয়, কিন্তু ওয়েন প্যাকারের মত একজন লোক নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করেছে, কথাটা কখনোই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি ও।

'কি ভাবছ?' গাড়ি চালাবার ফাঁকে মাঝেমধ্যে আড়চোখে রানাকে দেখছে লুনা।

'কই, না।'

পরবর্তী পঞ্চাশ কিলোমিটার পেরোতে গাড়ির চাকা চারবার আটকাল বালিতে। সূর্য উঠেছে, গাড়ি তুলে সামনের দিকে ঠেলা দেয়া অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। লুনাকে ধন্যবাদ জানাল ও, বুদ্ধি করে দুটো ফ্লাস্কে করে ঠাণ্ডা স্কোয়াশ নিয়ে এসেছে বলে।

চারবারের বার গাড়িতে চড়ে অকারণ ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল ও, 'আর কতদূর?' শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'এই তো এসে গেছি, আর মাত্র পাঁচ কিলোমিটার,' বলল লুনা।

খানিক পর ওদের সামনে তিনটে কুঁড়েঘর দেখা গেল। বাঁশ আর খড় দিয়ে

তৈরি ওগুলো। শুকনো ঘাস আর বাঁশ দিয়ে খাড়া করা হয়েছে পাঁচিল, বাতাস আর বালির হাত থেকে বাঁচার জন্যে। ঘরগুলোর ডান দিকে খড় আর লতাপাতার বিরাট একটা স্তূপ দেখা গেল।

'পৌঁছে গেছি,' বলল লুনা। 'ওই লতাপাতার ভেতর লুকিয়ে রাখব গাড়ি। বাইরে থেকে কেউ টেরই পাবে না। এটা মোহারের বাড়ি।'

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজন হাসি-খুশি আফ্রিকান। তাদের পিছু পিছু নাচতে নাচতে এল চারটে বাচ্চা ছেলে।

লোকগুলোর সাথে করমর্দন করল লুনা। তারপর তারা সবাই ঘিরে ধরল রানাকে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, যে যার নিজের হাত সাধছে রানাকে। এক এক করে সবার সাথে করমর্দন করল রানা। দ্রুত নির্দেশ দিয়ে ওদেরকে কাজে লাগিয়ে দিল মোহার, মাল-পত্র নামিয়ে গাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে।

'বাবাকে গিয়ে খবর দিই, তুমি এসেছ,' বলল লুনা। 'ছেলে-মানুষের মত খুশি হয়ে উঠবেন, আমি জানি। ছায়ায় বসে স্কোয়াশ খাও। জায়গাটা নোংরা, চারদিকে শুধু দুর্গন্ধ আর মাছি, কিন্তু এটাই আফ্রিকার আসল চেহারা। তবে লোক এরা আশ্চর্য রকম ভাল।'

লুনার শার্টে ঝাঁক ঝাঁক মাছি বসেছে, দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার। নিজের অজান্তেই একটা হাত চলে গেল পিঠে, ভন ভন আওয়াজ তুলে কয়েকশো মাছি শার্ট থেকে উঠে ওর মাথার চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করল, কালো একটা মেঘের মত লাগল ওগুলোকে। তারপর আবার তারা বসতে শুরু করল শার্টের ওপর।

লুনার পিছু পিছু গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। খোলা জায়গাটার বাঁ দিকে ছোট একটা ঘর। মুখ খোলা টিনের কৌটা, কাগজের তোবড়ানো বাক্স ছাড়াও দুনিয়ার আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে ঘরের সামনে। ডান দিকে, একটু দূরে, আরও একটা ঘর। এটা বেশ বড়।

উঠানে একজন মেয়েলোককে দেখা গেল। তেল চকচকে কালো চেহারা, সাংঘাতিক মোটা। ভারী একটা কাঠের পোল দিয়ে জোয়ার ভাঙছে। রানা আন্দাজ করল, নিশ্চয় মোহারের স্ত্রী হবে। একটা ঘরের কোণ থেকে দু'জন আফ্রিকান যুবতী উঁকি দিয়ে দেখল ওদের। সাথে সাথে টেনে নিল মাথা, কিন্তু আড়াল থেকে তাদের হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল।

উঠানের একধারে কয়েকটা গাছ, পাশে একটা দোচালা। দোচালার চারধারে দেয়াল নেই। সেটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দেখল, বড় ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল লুনা।

গ্লাস ভরে অরেঞ্জ স্কোয়াশ দিয়ে গেল মোহার। একটু পর খালি গ্লাসটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ দেরি করছে লুনা। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গেল রানার। যদিও সময়টা ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল—একটা সেকেন্ড ওকে স্থির থাকতে দিল না মাছির ঝাঁক।

দশ মিনিট পর বড় ঘরের দরজায় দেখা গেল লুনাকে, হাতছানি দিয়ে ডাকল

ওকে। এগোল রানা, উত্তেজনার একটা ঢেউ বয়ে গেল শরীরে। অনেক ঝামেলা আর বিপদ পেরিয়ে অবশেষে ওয়েন প্যাকারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ও।

একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল লুনা, বলল, 'যাও, বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

লুনাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল রানা। ভেতরে বাতাস নেই, ভাপসা গরম। প্রখর রোদ থেকে এসেছে বলে আবছা অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না ও। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো দৃশ্যটা।

স্ট্রেচারের মত একটা খাটিয়া, তার ওপর বসে আছে ওয়েন প্যাকার। ঘরে যেহেতু একজন মাত্র মানুষ, তাকেই ওয়েন প্যাকার বলে ধরে নিল রানা। পরিচিত চেহারা, কিন্তু দেখে চিনতে পারল না ও। উঁচু একটা কাঠের বাক্স রয়েছে খাটিয়ার সামনে, বোঝা গেল সেটাকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। চওড়া হাড়ের ওপর মাংস বলতে গেলে কিছুই নেই, গায়ের বুশ শার্টটা ঢল ঢল করছে। নোংরা একটা ট্রাউজার পরে আছে ওয়েন প্যাকার। টেবিলের ওপর, তার হাতে, শার্টের ওপর নির্বিঘ্নে বসে আছে রাজ্যের মাছি। মুখটা সরু হয়ে গেছে, চোখ দুটো গভীর গর্তে ঢোকা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরিচিত চেহারার সাথে কিছু কিছু মিল খুঁজে পেল রানা। জেসমিনের দেয়া ফটোগ্রাফের কথা মনে পড়ল ওর। ছবিটা তোলার পর এই অল্প ক'দিনেই আরও অনেক রোগা হয়ে গেছে মানুষটা।

'রানা?' গলার আওয়াজ দুর্বল আর কর্কশ শোনাল।

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বলল রানা, এগিয়ে গিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এসেছি আমি, মি. প্যাকার।'

হাড়-সর্বস্ব আঙুল দিয়ে রানার হাতটা মুহূর্তের জন্যে ছুঁলো ওয়েন প্যাকার, তারপর নিস্তেজ ভঙ্গিতে কোলের ওপর টেনে নিল নিজের হাত। বলল, 'বসো।'

চারদিকে তাকাল রানা, কাঠের একটা নিচু বাক্স দেখে সাবধানে বসল সেটার ওপর।

'তুমি আসবে, এটা আমি আশা করিনি,' বলল প্যাকার। 'লুনা যখন ফিরে এসে বলল, তোমার সাথে আমার ব্যাপারে কথা হয়নি ওর, ভাবলাম, তুমি আসছ না।' আধবোজা অসুস্থ চোখে নিস্তেজ দৃষ্টি, এই ক'টা কথা বলতেই হাঁপিয়ে উঠল।

'কিভাবে আসতে পারলাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে,' বলল রানা।

'ওয়াট তোমাকে পাঠিয়েছে, তাই না?'

'ওয়াট জেসমিনের সাথে দেখা করার কাজটা রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট আশরাফকে দিয়েছিল,' বলল রানা। 'সে খুন হয়ে যায়।'

'সে কি!'

'আশরাফ খুন হবার পর কাজটা আমি সিরিয়াসলি নিই।'

রানাকে বাধা দিল প্যাকার, বেঁকে থাকা শিরদাঁড়া একটু যেন সিধে হলো তার। 'কিভাবে মারা গেল সে?'

'নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়। ওর নিজের ঘরেই পড়ে ছিল লাশ।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে আবার বলল রানা, 'কাজটা কার্ল হফারের।'

'কার্ল হফার!' বিড় বিড় করে নামটা উচ্চারণ করল প্যাকার। 'তার সম্পর্কে কি জানো তুমি, রানা?'

'সে-কথায় পরে আসছি,' বলল রানা। 'তার আগে আমি কিভাবে এখানে এলাম সেটা আপনার জানা দরকার।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বলো।'

'আশরাফের বদলে জেসমিনের সাথে আমি দেখা করি...'

'জেসমিনের সাথে ওয়াটের তাহলে দেখা হয়নি?' জানতে চাইল প্যাকার।

'না। ওয়াটের সাথে দেখা আমারও হয়নি।'

'তাহলে?' বিস্মিত দেখাল ওয়েন প্যাকারকে। 'তোমাকে আমার দরকার, এ-কথা তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'জানিনি,' বলল রানা। 'আশরাফ আমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল, তার খুনের একটা কিনারা করব বলে প্রতিজ্ঞা করি আমি। জেসমিনের সাথে যে ক্লাবে কথা হয় সেখানে হফারের ভাড়াটে গুণ্ডারা আমাকে ধরে ফেলে। মেরেই ফেলত, কিন্তু হফারকে সাহায্য করব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে যাই। তারপর হফারের সাথে কথা হয় আমার। সে আমাকে টাকা সাধে। তার প্রস্তাব, আপনাকে আমার খুন করতে হবে। আমি রাজি হই। কারণ আপনার কাছে পৌঁছবার জন্যে সেটাই সহজতম পথ বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া হফার আর তার খুনীদের সাথে যোগাযোগ থাকলে প্রতিশোধ নেয়াটাও সহজ হবে মনে করেছিলাম।'

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েন প্যাকার। রানার দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। রানার ভয় হলো, বিছানার কিনারা থেকে পড়ে না যায়। 'ও!' শুধু এই একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল ওয়েন প্যাকার।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। অনেকক্ষণ।

তারপর ওয়েন প্যাকার জানতে চাইল, 'জেসমিন কি টাকা পেয়েছিল? পোলোকে আমি বলেছিলাম, ওয়াটের কাছ থেকে অত টাকা আদায় করতে পারবে না জেসমিন। ওয়াট একটা হাড়-কিপটে। তার সাথে তো ওর দেখাই হয়নি। কিন্তু হফার কি তাকে টাকা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমার হাত দিয়ে।'

'আমার মেসেজ তোমার কাছে পৌঁছায়নি, তবু তুমি আমার কাছে আসতে চাইলে... কি মনে করে, রানা?' অসুস্থ চোখে আশ্চর্য একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠল, হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করে বসল প্যাকার।

সত্যি কথাই বলল রানা। 'আমার আসার পেছনে দুটো কারণ কাজ করেছে। এক, আশরাফ কেন মারা গেল, কে দায়ী, গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে, এসব আমার জানার দরকার ছিল। দুই, যখন শুনলাম আপনি রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছেন, এবং আপনার সাহায্য দরকার, তখন মনে হলো, অতীতে আপনি যাই করে থাকুন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আগের মতই আছে। ঠিক করলাম, আপনাকে

সাহায্য করব।'

ওয়েন প্যাকারের নিস্তেজ চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হলো। মৃদু হাসল প্রবীণ স্পাই। 'ধন্যবাদ, রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'তোমার ওপর আস্থা আর বিশ্বাসের কোন অভাব নেই আমার। প্রশ্নটা করলাম বলে তুমি আবার কিছু মনে করলে না তো?'

মৃদু একটু হাসল রানা। বলল, 'প্রশ্নটা না করলেই বরং নিরাশ হতাম। আমি জানি, আপনি প্রফেশনাল।'

'মেয়েটা অতি চালাক,' বলল প্যাকার। 'জেসমিনের কথা বলছি। তবে সাহসী। আফ্রিকান মেয়েদের এত সাহস দেখা যায় না। আরও কম টাকা দাবি করতে বলা হয়েছিল ওকে। কিন্তু রাজি হলো না। হফার ওকে টাকা না দিলে তোমাকে ও আমার কথা কিছু বলত না। একটু বেশি লোভী আর কি।'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোমার সাথেই ফিরে এসেছে?'

'তাই আসছিলাম আমরা,' বলল রানা। 'কিন্তু এয়ারপোর্টে, প্লেনে চড়ার আগেই, গুলি করা হয় তাকে।'

মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল ওয়েন প্যাকার। অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না। তারপর বলল, 'প্রথমে আশরাফ, তারপর জেসমিন! হফার দেখছি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'জেসমিনকেও হফার খুন করিয়েছে, আপনি ধরে নিচ্ছেন কিভাবে?'

'এভাবে আর কেউ খুন করতে পারে না,' বলল প্যাকার। 'এমন কি রাশিয়ানরাও নয়। হফারের ব্যাপারটা কি, সীন ওয়াট জানে না? তুমিও জানো না?'

'হপ্তা দুয়েক আগে পর্যন্ত তার নামও শুনিনি আমি। ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'তোমাকে তাহলে বলেনি সে?'

'না।'

'তার সাথে আমার একটা চুক্তি হয়।' ওয়েন প্যাকারের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল, পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল সেটা। 'চুক্তি ভাঙার চুক্তি আর কি। কাজ উদ্ধার হলে প্রথম যে সুযোগ পাবে সে-ই ভাঙবে। কিন্তু সেটা আমাদের মনের গোপন কথা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল, তারপর আবার বলল, 'হফার কাউকে কোনদিন বিশ্বাস করেনি। তার ভয়, আমিও তাকে ব্ল্যাকমেইল করব।'

'সবটা বলবেন আমাকে, নাকি আমার নাক গলাবার ব্যাপার নয়?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই বলব তোমাকে,' বললেন প্যাকার। 'আমি চাই গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে, কোত্থেকে এর শুরু আর কোথায়-ই বা এর শেষ, সব তুমি বোঝো।'

নড়েচড়ে বসল রানা।

'তুমি জানো, পাঁচ বছর আগে, আমি একজন সফল এজেন্ট ছিলাম, কাজ করছিলাম আমেরিকার হয়ে,' শুরু করল প্যাকার। 'হঠাৎ করে একদিন ঊর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষের একজন চতুর একটা ধারণা নিয়ে হাজির হলো, বলল, দল বদলে রাশিয়ায় চলে যাওয়া উচিত আমার। সেখানে গিয়ে টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন জানতে হবে আমাকে, তারপর সুযোগমত আবার দল বদলে পালিয়ে আসতে হবে রাশিয়া থেকে। দেখেশুনে মনে হলো একমাত্র আমি ছাড়া বাকি সবার সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার ওপর। তাদের ধারণা, এই কাজ যদি কারও দ্বারা সম্ভব হয় তো সে আমি। আমি নাকি ভাল অভিনেতা, ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করি না, বুদ্ধি-শুদ্ধির কোন অভাব নেই, ইত্যাদি।'

'শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি রাজি হলেন,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আমাকে ওরা বোঝাতে পারল। আমি রাশিয়ায় পালাব, এই খবরটা জেনে ফেলল হফার। এমন একজন প্রভাবশালী লোক সে, রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য অনায়াসে জোগাড় করতে পারে। যেদিন মস্কোর উদ্দেশে রওনা হব, সেদিন রাতে আমার বাড়িতে এসে হাজির হলো সে।' এই পর্যায়ে এসে ওয়েন প্যাকারের গলা একেবারে খাদে নেমে গেল, শোনার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হলো রানাকে। 'কিছু কাগজ-পত্র নিয়ে এসে দেবার অনুরোধ করল হফার। মস্কোয়, কে. জি. বি.-র সদর দফতরে কোথাও আছে সেগুলো। কাগজগুলো হেনরিক ডুমান নামে এক লোক সম্পর্কে একটা গোপন রিপোর্ট। তার ধারণা, মস্কোয় আমি একবার পৌঁছুতে পারলে কাগজগুলো হাত করতে পারব। বিনিময়ে সে আমাকে দশ মিলিয়ন ডলার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ থাকল প্যাকার, তারপর গলা আরও একটু খাদে নামিয়ে শুরু করল, 'দশ মিলিয়ন ডলার অনেক টাকা। ভেবে দেখলাম, এই টাকা না নিলে রাশিয়ানরা জেনে যাবে আমার আসল উদ্দেশ্য। তাছাড়া এই রকম লাভজনক একটা চুক্তি না করারও কোন মানে হয় না। রাজি হলাম। মতলব খারাপ নয় এটা প্রমাণ করার জন্যে আমার নামে ব্যাংকে এক মিলিয়ন ডলার জমা দিল সে। জানাল, বাকি টাকা দেবে কাগজগুলো নিয়ে আমি ফিরে আসার পর।'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে বাইরে থেকে ঘরের ভেতর উঁকি দিল লুনা, হাত-ইশারায় তাকে সরে যেতে বলল প্যাকার।

'তারপর?' জানতে চাইল রানা।

'কাগজগুলো উদ্ধার করতে চার বছর লেগে যায় আমার,' বলল প্যাকার। 'ওগুলো হাতে পেয়ে জানতে পারলাম কি ভয়ঙ্কর লোকের সাথে চুক্তি করেছি আমি। জানলাম, হেনরিক ডুমান আর কার্ল হফার একই লোক। জানলাম, তার মত পিশাচ সারা দুনিয়ায় আর একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কি রকম?'

'কাগজগুলো রিপোর্ট নয়, একটা চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় হফার ওরফে ডুমানের সাথে নাজী জার্মানীর মধ্যে এই চুক্তি হয়। হফারকে ফরমাশ দেয়া হয় গান পাউডার, সাবান আর ফার্টিলাইজার তৈরি করে সাপ্লাই দেবার। এর মধ্যে কোন অন্যায় নেই, তাই না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কিন্তু চুক্তির মধ্যে দেখলাম, নাজীরা এইসব জিনিস তৈরির জন্যে যেসব কাঁচামাল লাগবে তার সবই জোগাবে বলে কথা দিয়েছে। কাঁচামালগুলো কি শুনবে?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'মানুষের হাড়, চুল, চর্বি আর দাঁত,' বলল প্যাকার। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে প্যাকার। 'এইসব আসবে শত শত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ইহুদি খুন হচ্ছে নাজীদের হাতে।'

'মাই গড!' শিউরে উঠল রানা।

'যুদ্ধের পর চুক্তির কাগজ-পত্র সব রাশিয়ানদের হাতে চলে আসে,' বলল প্যাকার।

'সেই থেকে রাশিয়ানরা তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। অত্যাধুনিক ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতির ফর্মুলা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অর্থ লেনদেনের গোপন তথ্য সব তারা জেনে নিচ্ছে হফারের কাছ থেকে। সব দেশের সরকারের ভেতর নিজের লোক আছে হফারের, এসব তথ্য জোগাড় করা তার পক্ষে তেমন কঠিন হয়নি। কিন্তু এটাই হফারের একমাত্র অপরাধ নয়।'

'আরও আছে?' চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অনেক,' বলল প্যাকার। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার। প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে উচ্চারণ করছে। 'কাগজগুলোর মধ্যে হেনরিক ডুমানের ডোশিয়ারও আছে। সেটা পড়ে জানলাম, সে-ই ভিয়েৎনামে অস্ত্র বিক্রি করেছিল, যার ফলে ওই জঘন্য যুদ্ধটা বেধে যায়। কঙ্গো যুদ্ধের জন্যেও সে দায়ী। তালিকাটা লম্বা, রানা। চুক্তি আর ডোশিয়ার দুটোই আমি মাইক্রোফিল্ম করে নিয়ে এসেছি। মস্কো থেকে চলে আসার সময় আসলটা রেখে এসেছি। আমি এখন চাই, মাইক্রোফিল্মটা যেন ওয়াটের হাতে পৌঁছায়। তাতেই হফারের কবর খোঁড়া হয়ে যাবে। পারবে তো, রানা?'

'কেন পারব না,' বলল রানা। 'আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই তো এসেছি আমি।'

'ধন্যবাদ।'

'মস্কো থেকে আর কিছু নিয়ে আসেননি আপনি?' খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল রানা।

দম নেবার জন্যে খানিক চুপ করে থাকল প্যাকার, তারপর বলল, 'আনিনি মানে? ওখানে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম নাকি? অনেক কিছু এনেছি। তার মধ্যে একটা হলো, রাশিয়ান এজেন্টদের লম্বা এক তালিকা। ফ্রান্স আর আমেরিকায় কাজ করছে এরা। মোট তিনশো জন। ওয়াটের বিশেষ প্রিয়পাত্রী জেনি পাপিতা, ওই তালিকায় তার নামও আছে।'

'এসব আপনি জেসমিনকে দেননি কেন?' জানতে চাইল রানা। 'সে-ই তো ওয়াটের হাতে তুলে দিতে পারত।'

'রাশিয়ানদের মত হফারও জানে সেনেগালের কোথাও লুকিয়ে আছি আমি।

জেসমিনকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হফারের মোটা টাকার লোভ সামলাতে পারত না সে। তুমি এসেছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, রানা। অন্তর থেকে জানি, টাকা দিয়ে তোমাকে কিনতে পারবে না হফার।'

'তা পারবে না, ঠিক। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এ-ও জানেন, রাশিয়ানদের গোপন তথ্য ফাঁস করার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশের বন্ধু। আমেরিকা-রাশিয়ার গোলমালে আমি নিজেকে...'

'জড়াবে না। জানি।' মাথা ঝাঁকাল ওয়েন প্যাকার। 'সেইজন্যে পরের তথ্যগুলো থাকবে লুনার কাছে। ও-ও যাচ্ছে তোমার সাথে। তুমি শুধু একটু লক্ষ্য রেখো ওর নিরাপত্তার দিকে। পারবে না?'

'প্যারিসে ফিরে যাওয়া সহজ হবে না,' বলল রানা। 'হফার তো সব জানেই, রাশিয়ানরাও জানে আপনি এই মরু-ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।'

মাথা ঝাঁকাল প্যাকার। 'হ্যাঁ, জানি। প্রতিদিন কাছে চলে আসছে ওরা। প্রায় এসে গেছে। যত তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারো তোমরা ততই নিরাপদ। তোমার ফিরে যাবার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। মোহার তোমাকে গাইড করে বুশ থেকে বের করে নিয়ে যাবে। মার্কিন দূতাবাসে একবার যদি পৌঁছুতে পারো, ওরা তোমাদের নিরাপদে প্যারিসে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করে দেবে।'

'কিন্তু আপনি? আপনি যাবেন না?'

'না। আমি এখানে একটু শান্তিতে থাকতে চাই। এই ধকল আমার সইবে না।'

'কিন্তু তা কি করে হয়!' প্রতিবাদ জানাল রানা। 'আপনাকে নেবার জন্যেই তো এসেছি আমি। এখন আপনি...'

'সম্ভব নয়, রানা,' এমন দৃঢ়তার সাথে বলল প্যাকার, রানা বুঝল, তর্ক করা বৃথা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরেকটা প্রশ্ন তুলল রানা, 'আপনি না গেলে লুনা যেতে রাজি হবে বলে মনে করেন?'

'হ্যাঁ, যাবে সে,' বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ছাড়ল প্যাকার। 'একটা কথা, রানা। হফার বা রাশিয়ানদের হাতে ওকে পড়তে দিয়ো না। তারচেয়ে একটা বুলেট অনেক বেশি সহজ। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে রানা বলল, 'আপনি আমার ওপর অনেক দায়িত্ব চাপাচ্ছেন। আমি বরং একাই ফিরে যাই।'

'তাহলে লুনাকে নিয়ে যাবে কে? আমি তোমার ওপর ভরসা করছি, রানা।' বিছানা থেকে নামতে গিয়ে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল ওয়েন প্যাকারের, রানার মনে হলো নড়াচড়া করলে ব্যথা পাচ্ছে লোকটা। ঘরের এক কোণে গিয়ে থামল। 'আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। ফিল্মগুলো এখানে পোঁতা আছে। জায়গাটা নিরাপদ নয়, কিন্তু এত কষ্টের জিনিস চোখের আড়াল করতে পারিনি।'

তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। শুকনো, আলগা খানিকটা বালি দেখাল প্যাকার। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত দিয়ে সেই বালি সরাতে শুরু করল রানা।

মিনিটখানেক পর গর্ত থেকে ছোট একটা টিনের বাক্স তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও।

'চার চারটে বছর বিপজ্জনক কাজ করার পর বাক্সটাকে ছোট বলে মনে হতে পারে,' বলল প্যাকার। 'কিন্তু বিচারটা হবে মান দিয়ে, আকার দিয়ে নয়।' রানার হাত থেকে বাক্সটা নিজ হাতে নিল সে। 'আমেরিকার নিরাপত্তার জন্যে জরুরী তথ্য আছে এতে, রানা। আর আছে কার্ল হফারের মৃত্যু পরোয়ানা।'

বাক্স খুলে একটা থলে বের করে নিল প্যাকার। 'এটা লুনার জন্যে। আলাদা করেই রেখেছিলাম।' বাক্সটা রানার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'আমি জানতাম, রাশিয়ার বিরুদ্ধে এধরনের কাজ করতে তোমার বাধবে।'

চুপ করে রইল রানা।

'আর দেরি করা উচিত হবে না তোমাদের,' বিছানায় ফিরে এসে বলল প্যাকার, রানা সাহায্য করতে চাইলে হাত নেড়ে বাধা দিল। 'লুনাকে যদি ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করো, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব। তাকে বলো, আমি চাই সে তোমার সাথে যাক। বুঝবে। ও বুদ্ধিমতী।' একটু থামল, তারপর আবার বলল, 'আমার সময় হয়ে এসেছে, রানা।' নিজের বুকে আঙুল দিয়ে টোকা দিল। 'ক্যান্সার। হফারের চেয়ে অনেক বেশি নির্দয়। লুনাকে বোলো কথাটা। খুব বেশি হলে আর এক হপ্তা, তারপর আমি আর থাকব না। ও বুঝবে।'

'বলতে হবে আপনাকে,' বলল রানা। 'ও গেলে ওকে আমার নিয়ে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু জোর করতে পারব না। বোঝাবার দায়িত্ব আপনার। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হব আমি।'

'বেশ। তাই হওয়া উচিত, ঠিক আছে। আমিই বোঝাব।' রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল প্যাকার। হাড়ের সাথে শুধু লটকে আছে ঢিলেঢালা চামড়া। হাতটা খুব যত্নের সাথে ধরল রানা। 'গুডবাই, রানা। অ্যান্ড গুডলাক।'

'হফারের সাথে আমিও একটা চুক্তিতে এসেছিলাম, সেই ভাঙারই জন্যে,' বলল রানা। 'অন্তত এই একটি ব্যাপারে আমি-আপনি একদলে।'

মৃদু হাসল প্যাকার। 'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। পোলোর ভাইপো আজ সকালে এখান থেকে হয়ে গেছে। শর্টকাট পথে এসেছিল। দু'জন লোকের কথা শুনলাম ওর মুখে। চেহারার বর্ণনা শুনেই বুঝলাম, একজন জ্যাসন। হফারের পুরানো লোক। ওরা খুঁজছে তোমাকে।'

'গুডবাই,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা।

চোখ ধাঁধানো রোদে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। দেখল, গাছতলার নিচে একটা কাগজ বিছিয়ে বসে আছে লুনা। ধীর পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল ও। 'যেজন্যে এসেছি তা পেয়ে গেছি আমি,' লুনাকে বলল। 'যাও, তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন।'

'বাবাকে রাজি করাতে পেরেছ?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল লুনা। 'রাজি করাতে পেরেছ?'

'আলাপ করে দেখো,' বলল রানা।

উঠে দাঁড়াল লুনা। হন হন করে এগোল ঘরের দিকে। দরজা দিয়ে ঢুকতে

যাবে, এমনি সময়ে ঘরের ভেতর থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ এল পিস্তলের। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লুনা। দেখল, দরজা দিয়ে ধোঁয়ার সরু একটা রেখা বেরিয়ে আসছে।

এগারো

আধ ঘণ্টা হলো গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছে ওরা। দু'এক মিনিট পরপরই লুনার দিকে তাকাচ্ছে রানা। তার মুখের পাথুরে ভাব আর চোখের আহত দৃষ্টি কথা বলতে নিষেধ করে দিল ওকে।

গুলির আওয়াজ শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল লুনা, তারপর ঘর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখেই ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে তার পাশে চলে এসেছে রানা, ওর হাত ধরে ফেলে বাধা দিল। 'যেয়ো না!' তীক্ষ্ণ সুরে লুনাকে বলল ও। 'উনি যা করেছেন ভালই করেছেন। এমনিতেও মারা যাচ্ছিলেন, এতে শুধু মৃত্যুটা তাড়াতাড়ি হলো। আমি দেখছি।'

ঘরের খোলা দরজা থেকে চোখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল লুনা, চোখে আতঙ্ক। 'তবে কি বাবা···বাবা আত্মহত্যা করেছেন?'

'এখানে দাঁড়াও। দেখি।'

কড়া রোদে লুনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা। কয়েক মিনিট পরই বেরিয়ে এল ও, হাতে লুনার জন্যে আলাদা করে রাখা থলে, আর ওয়েন প্যাকারের পাশ থেকে পাওয়া পিস্তল। যতদিন বেঁচে ছিল যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে মানুষটা; মরণের মুহূর্তেও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়নি। জীবনের শেষ আচরণেও ভুল করেনি।

লুনার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। একবার শুধু নিঃশব্দে ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল লুনা।

আফ্রিকান লোকগুলো তাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অস্বস্তির সাথে তাকিয়ে ছিল রানার দিকে। বুড়ো মোহার ধীর পায়ে উঠান পেরিয়ে বড় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল, উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করল, তারপর মাথা নিচু করে ফিরে গেল নিজের ছেলেদের কাছে। তাদের সাথে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল সে।

তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'এখুনি রওনা হতে চাই আমরা,' মোহারকে বলল রানা। 'মাদামোয়াজেলের এখানে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গাড়িটা বের করতে বলুন, আপনিও তৈরি হয়ে নিন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হব আমরা।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে সমর্থন করল মোহার। হন হন করে গাড়ির দিকে চলে গেল সে।

বড় ঘরের সামনে তখনও দাঁড়িয়ে আছে লুনা। খোলা দরজার দিকে বিহ্বল

চোখে তাকিয়ে আছে। তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'আমাদের যাবার সময় হলো,' নরম সুরে বলল ও। থলিটা ধরিয়ে দিল ওর হাতে। 'এটা পৌঁছে দিতে হবে তোমার প্যারিসে, সীন ওয়াটের হাতে। উনি তোমাকে আমার সাথে যেতে বলে গেছেন। ওর ব্যবস্থা এরাই করবে।' ও জানে, লুনা যাতে যায় সেজন্যেই নিজের মৃত্যুকে এত কাছে এগিয়ে আনল ওয়েন প্যাকার। কিন্তু কথাটা লুনাকে জানাল না ও। 'এসো... দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ভারী দুটো চামড়ার ব্যাগ নিয়ে একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল মোহারের স্ত্রী। একটাতে পানি, আরেকটায় খাবার। বুড়ির দু'চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে। কেউ কোন কথা বলল না। তার হাত থেকে ব্যাগ দুটো নিল রানা, আরেক হাতে ধরল লুনার কব্জি। ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোল ওরা। গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে মোহার।

কয়েক পা এগিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল লুনা, তবে রানার সাথে সাথে হাঁটতে থাকল। গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, গেটের কাছ থেকে খানিকটা দূরে, একটা গাছের নিচে, মোহারের ছেলেরা কবর খুঁড়ছে। লুনা যখন গাড়িতে উঠছে, তার দিকে তাকাল না ওরা।

এরই মধ্যে গাড়ির ব্যাক সীটে উঠে বসেছে মোহার, ব্যাগ দুটো তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। তারপর সে-ও উঠে বসল লুনার পাশে।

আধ ঘণ্টা গাড়ি চালাবার পর, একটা ঝর্ণার কাছে পৌঁছেছে ওরা। সেটাকে ঘিরে ভিড় করে আছে প্রায় দুশো ছাগল আর ভেড়া।

সামনের দিকে ঝুঁকে মোহার বলল, 'লোকগুলোর সাথে কথা বলব আমি।'

গাড়ি থামাল লুনা, মোহারকে নামতে দেয়ার জন্যে রানাকেও নামতে হলো। হন হন করে এগিয়ে গিয়ে তিনজন আফ্রিকানের সামনে দাঁড়াল মোহার, কপালে হাত তুলে সালাম দিল। তারপর শুরু হলো কথাবার্তা। একজন বয়স্ক আফ্রিকান কথার মাঝখানে থেমে একটা হাত তুলে পুব দিকটা দেখাল। লোকটাকে উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো।

ফিরে এল মোহার। তার মুখের টান টান ভাব দেখে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'কি ব্যাপার?'

'তিনজন সশস্ত্র লোক দেখেছে ওরা,' বলল মোহার। 'প্রত্যেকের কাছে একটা করে রাইফেল ছিল। এদেশী, কিন্তু এরা কেউ তাদের চেনে না।'

'কোথায়?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'মাইল দুই পুবে। ওটাই আমাদের পথ।'

'রাইফেল? দেখতে ভুল করেনি তো?'

'না।'

'ওদেরকে এড়িয়ে যেতে হবে,' বলল রানা। 'কিভাবে সম্ভব?'

'পুব দিকটা সবচেয়ে সহজ পথ। উত্তর দিকে যেতে পারি আমরা, তারপর একটা চক্কর দিয়ে পৌঁছতে পারি পুবে, কিন্তু তাতে সময় লাগবে অনেক বেশি, রাস্তার অবস্থাও ভাল না।'

'তবু তাই ভাল,' বলল রানা। 'যেভাবে হোক ওই তিনজনকে এড়াতে হবে।' রিভলভার নিয়ে তিনটে রাইফেলের সাথে লাগতে রাজি নয় ও।

তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে চড়ল ওরা।

'এরা কি রাশিয়ানদের লোক?' জানতে চাইল লুনা।

'নিশ্চয় তাই। কাজেই আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। ছাড়ো।'

লুনাকে পথ বলে দিল মোহার। আবার বালির ওপর ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল গাড়ি।

রাস্তার অবস্থা ভাল না, মোহারের এই কথার সত্যতা একটু পরই হাড়ে হাড়ে টের পেল ওরা। দশ কিলোমিটারও এগোয়নি, এমন আলগা বালির মধ্যে এসে পড়ল যে পিছনের চাকা পিছলে যেতে শুরু করল, স্টিয়ারিং সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল লুনা।

'আমাকে দেবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখুনি নয়,' বলল লুনা। স্টিয়ারিং হুইলের সাথে কসরৎ করছিল ও, এইসময় হঠাৎ ঘড়ঘড় করে উঠে প্রতিবাদ জানাল ইঞ্জিন, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। 'ধেত্তেরি!'

রানা, তারপর মোহার নামল। পিছনের চাকা দুটো অর্ধেকই দেবে গেছে বালির নিচে। দু'জনের মিলিত চেষ্টায় তোলা হলো গাড়ি, একটু কম আলগা বালিতে আবার নামানো হলো সেটাকে, এরপর ধাক্কা দেয়ার পালা। ওদের দু'জনকে দেখে মনে হতে পারে, এইমাত্র নদী থেকে উঠে এল, এমন ঘেমেছে। গাড়ি একবার চলতে শুরু করতে সেটাকে আর থামাতে সাহস হলো না লুনার, ওদের দু'জনকে পিছু পিছু ছুটতে হলো।

একশো মিটার সামনে আবার পাওয়া গেল নিরেট জমি, এখানে নির্ভয়ে থামল লুনা। গাড়ির দিকে আসছে রানা, মাথার ওপর দিয়ে কি যেন চলে গেল। মৌমাছির গুঞ্জনের মত শোনাল শব্দটা। কিন্তু পরমুহূর্তে দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের আওয়াজ। চরকির মত আধপাক ঘুরল রানা, হাত চলে গেছে রিভলভারের বাটে। আধমাইল ডানদিকে পাশাপাশি কয়েকটা মাথা উঁচু গাছ দেখা গেল। একটা গাছে সাদা কি যেন দেখল ও। পরমুহূর্তে আগুনের ক্ষীণ একটু ঝলক চোখে পড়ল। গাছের ওপর কিছুটা গা ঢাকা দিয়ে আছে রাইফেলধারী, আবার গুলি করল সে। এবারে মৌমাছির গুঞ্জন শুনল না রানা। রিভলভার তুলল ও, কিন্তু আবার নামিয়ে নিল—দূরত্বটা অনেক বেশি।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ শুনে ঝট্ করে ফিরল রানা। দেখল, গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে ছুটে আসছে লুনা।

'মোহার!' চেঁচিয়ে বলল লুনা। 'ওদিকে!'

রানার পিছনে একটু বাঁ দিকে ছিল মোহার, সেদিকে তাকাতেই তাকে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখল রানা।

লুনা আর রানা দু'দিক থেকে ছুটে একসাথে মোহারের কাছে গিয়ে পৌঁছুল। মোহারকে ধরে ওল্টাল রানা, তারপর নিষ্প্রাণ দেহটা ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো।

আবার রাইফেলের আওয়াজ। লুনার কাছ থেকে আধ হাত দূরে লাফিয়ে উঠল খানিকটা বালি। নিশানা প্রায় নির্ভুল, লক্ষ্য করে ভয় ধরে গেল রানার মনে। লুনার হাত ধরে গাড়ির দিকে ছুটল ও।

'ওকে ফেলে যাব না!' হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল লুনা। 'আমাদের জন্যে অনেক করেছে ও, ওকে আমরা এভাবে···'

'চুপ করো!' ধমক দিল রানা। প্রায় ধাক্কা দিয়ে গাড়ির ভেতর তাকে তুলে নিল ও। তারপর ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন, সতর্কতার সাথে এনগেজ করল গিয়ার। ক্লাচ ছেড়ে দিতে প্রথমে পিছলে গেল চাকা, কিন্তু তারপর কামড় বসাল। ধীরে ধীরে এগোল গাড়ি। গ্যাস পেডালটাকে এমন ভাবে ব্যবহার করল রানা, ওটা যেন কাঁচের তৈরি। একটু একটু করে স্পীড বাড়িয়ে চলল ও। আবার ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে শুরু করল ওরা।

আরও একবার রাইফেলের আওয়াজ হলো। রানা দেখল, দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে লুনা।

মরু-ঝোপ এতটা সমতল হওয়ায় বিপদ আরও বেড়েছে, ভাবল রানা। গাছের মাথা থেকে রাইফেলধারী লোকটা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত দেখতে পাবে ওদেরকে। গাড়িটা কোন্ দিকে যাচ্ছে, রিপোর্ট করবে সে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। শিরদাঁড়ার কাছে ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করল ও। কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা? খানিক আগে পর্যন্ত মোহার পথ দেখিয়ে এসেছে লুনাকে, তখন মোহারের নির্দেশ অন্ধের মত অনুমোদন করেছে ও। কিন্তু এখন লক্ষ্য করল, প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঘেসো জমি একই রকম দেখতে। রাস্তা বা পথ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এতক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছে ও, হয়তো একটা বৃত্ত ধরে ঘুরছে শুধু।

'লুনা!' তীক্ষ্ণ সুরে ডাকল ও। 'আমার দিকে তাকাও! তোমার সাহায্য দরকার! কান্না থামাও, বিপদ!'

সীটের ওপর সিধে হলো লুনা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। গাড়ির সামনে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। বলল, 'ওর মত ভালমানুষ আমি আর দেখিনি, রানা। আমাকে কি রকম ভালবাসত, সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। ওরা নরকে যাবে!'

'এখনও আমরা যদি সাবধান না হই, আমাদের অবস্থাও মোহারের মত হবে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি কি জিজ্ঞেস করছি মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো।'

নড়েচড়ে বসল লুনা। 'বলো।'

'আমরা কোথায়, তুমি জানো?'

'না, তবে সূর্যটাকে সব সময় আমাদের ডানদিকে রাখতে হবে,' বলল লুনা। 'এই ঝোপে হারিয়ে গেলে বাঁচার ওটাই একমাত্র উপায়। তা না হলে একই জায়গায় চক্কর খেয়ে মরতে হবে।'

পেট্রল গজের দিকে তাকাল রানা। চার ভাগের তিন ভাগ ভরা। এদিক থেকে অন্তত ভয়ের কোন কারণ নেই। পানি আর খাবার, তাও আছে। বিপদটা কাটিয়ে

[illegible] বোধহয় অসম্ভব হবে না।

'তাহলে সূর্যের ওপর নজর রাখো,' বলল ও। 'কিন্তু যাচ্ছি উত্তরে, যেতে চাই পুবে···গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পুব দিকে যাবার সময় হয়নি এখনও?'

'সামনে কোথাও একটা রাস্তা আছে···আর হয়তো দশ কিলোমিটার। মোহার সেদিকেই যাচ্ছিল। ওটা যদি পাই, তাহলে একটা গ্রামে পৌঁছুনো যাবে। সেখানে আমরা গাইড পাব।'

আরও পনেরো মিনিট গাড়ি চালাবার পর রানা ধারণা করল, রাস্তাটাকে কোথাও ফেলে এসেছে ওরা। একটা গাছের নিচে গাড়ি দাঁড় করাল ও। 'তুমি কি বলো, পিছনে ফিরে যাওয়া উচিত?'

কিছু না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল লুনা, তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকাল সে। সীমাহীন সমতল ভূমি, বালি ছড়িয়ে আছে, বালির ওপর শুকনো ঘাসের চাপড়া, ঝোপ-ঝাড় আর গাছ। যেদিকে তাকাও, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। 'ফিরে গিয়ে কোন লাভ হবে না,' বলল সে। 'রাস্তাটাকে আমরা হয়তো এক কিংবা বিশ কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটিয়ে এসেছি। ফিরে গেলেও সেটা পাবার আশা করা যায় না। উল্টে হয়তো রাইফেলের মুখে গিয়ে পড়তে হবে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে দশটা। মাত্র এই ক'ঘণ্টায় এত কিছু ঘটে গেছে বিশ্বাস করা যায় না। 'সামনে আর কোন গ্রাম আছে বলে মনে করো?'

'ঝোপের সব জায়গাতেই গ্রাম আছে। চলো দেখা যাক, কপালে কি আছে।'

'যাব,' বলল রানা। 'তার আগে গলা ভিজিয়ে নেয়া যাক।' পানির ব্যাগ আর ভ্যাকিউম ফ্লাস্ক নিয়ে গাড়ি থেকে নামল ও। খুব সাবধানে ফ্লাস্কের ক্যাপে ব্যাগ থেকে পানি ঢালল। দাঁতের নিচে বালি কিচকিচ করছে, দু'জনেই কুলকুচো করল।

পানি খাওয়া শেষ হতে ব্যাগ আর ফ্লাস্ক গাড়ির পিছনে রাখল রানা, উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। তার পাশে বসল লুনা। এবড়োখেবড়ো বালির ওপর দিয়ে আবার ছুটল গাড়ি।

দশ মিনিট পর মাঙ্কিব্রেড গাছের একটা বৃত্তের কাছে চলে এল ওরা। এগুলোকে বেওব্যাব গাছও বলে।

'এই জায়গাতেই ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করত ওরা,' বলল লুনা। 'এই গাছের একটা বৃত্ত লাগত সেজন্যে। যাদু বা তুকতাক করার জন্যে এইসব জায়গাকে এখনও মাঝেমধ্যে ব্যবহার করা হয়। গাছগুলো ভেতরে ফাঁপা। মারা গেলে বৈদ্য বা গুণিনকে এই গাছের ভেতর কবর দেয়া হত—যাতে এলাকাটাকে তারা অপবিত্র করতে পারে।'

'আমাকে কেউ ওই গাছের ভেতর কবর না দিলেই হলো,' বলল রানা। পেট্রল গজের ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল ও। সেই সাথে ধড়াস করে উঠল বুক। গজের কাঁটা বলছে, ট্যাংকের চার ভাগের তিন ভাগই খালি হয়ে গেছে। তা কি করে সম্ভব! 'লুনা!' আতঙ্কিত শোনাল ওর গলার আওয়াজ। 'এত গ্যাস কখন খরচ হলো!' ব্রেক করে গাড়ি থামাল ও। দরজা খুলে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। পিছনে গিয়ে পেট্রল ট্যাংক পরীক্ষা করতে দেখল নিচের দিকে একটা ফুটো রয়েছে। বুঝল,

শেষ যে রাইফেলের আওয়াজটা শুনেছিল সেটাই এই সর্বনাশটা ঘটিয়েছে।

পাশে এসে দাঁড়াল লুনা।

চেহারা এবং কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল রানা, লুনাকে ভয় পাইয়ে দিলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। বলল, 'কি কাণ্ড দেখো দেখি, মাত্র সিকি ভাগ আছে। এতে কত দূর যেতে পারব বলে মনে করো?'

'ত্রিশ কিলোমিটার,' বলল লুনা।

পয়েন্ট ফোর-ফাইভের একটা বুলেট তৈরি করেছে গর্তটা, রুমাল পাকিয়ে সেটা গর্তের মুখে গুঁজে দিল রানা। 'ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে একটা গ্রাম পেয়ে যাব, কি বলো?'

'নাও পেতে পারি,' বলল লুনা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, লুনা তাকে বাধা দিল। বলল, 'আমি যাতে ভয় না পাই সে-চেষ্টা করছ তুমি। তার কোন দরকার নেই।'

'তুমি তাহলে ভয় পাওনি?'

রওনা হবার পর এই প্রথম একটু হাসল লুনা। 'ভয় পেয়ে কোন লাভ আছে? যা হবার তা তো হবেই। খাবার আর পানি, দুটোই প্রচুর আছে আমাদের। গ্যাস শেষ হয়ে গেলে ছায়ায় আশ্রয় নেব আমরা, যতক্ষণ না সূর্য ডোবে। এই গরমে হাঁটা সম্ভব নয়।'

কিন্তু তারপর? প্রশ্নটা করার সাহস হলো না রানার। আবিষ্কার করল, লুনার চেয়ে সে-ই ভয় পেয়েছে বেশি।

'ঠিক,' বলল ও। 'আবার তাহলে গাড়ি ছাড়া যাক।'

গাড়ির ভেতরটা গনগনে তন্দুরের মত তেতে উঠেছে। উঠে বসে স্টার্ট দিল রানা।

বুলিনের হাঁটুর ওপর ম্যাপ। রোমানভের পাশে বসে আছে সে। রোমানভ ওয়াকি-টকি অপারেট করছে। নিকোলাইকে পাশে নিয়ে জীপ চালাচ্ছে জাহের। চামড়া-পোড়ানো রোদের মধ্যে, গাড়ির ছাদে বসে আছে দাউদ। তার হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে রয়েছে একটা রাইফেল।

অনেকক্ষণ হলো গাড়ি চালাচ্ছে ওরা। এতক্ষণে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওয়াকি-টকি।

হেডফোনে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যে-ই কথা বলুক, অনেক কথা অল্প সময়ে বলতে চেষ্টা করছে সে। অধৈর্যের সাথে বার বার রোমানভের দিকে তাকাচ্ছে বুলিন।

অবশেষে যান্ত্রিক গলাটা থামাল। রোমানভ বলল, 'তিন নম্বর পোস্টকে সতর্ক করে দাও।' মাথা থেকে হেডফোন নামাল সে।

'কি খবর?' দ্রুত জানতে চাইল বুলিন।

'একটা মেয়ে, একজন বিদেশী লোক, আর একজন আফ্রিকানকে দেখা গেছে,' বলল রোমানভ। 'একটা দিউ সিভু গাড়ি চালাচ্ছে ওরা। তোমার ম্যাপে স্কয়ার

টেন কোথায় দেখো, ওখানেই দেখা গেছে ওদেরকে।' বুলিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল সে। 'এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার মত হবে। পোস্ট থেকে গুলি চালায় ওরা, আফ্রিকানটাকে মেরে ফেলে।'

'ভেরি গুড!' আনন্দে চকচক করে উঠল বুলিনের চোখ।

'ওদের গাইড নেই,' বলল রোমানভ। 'কাজেই বেশি দূর যেতে পারবে না।'

'আফ্রিকান লোকটার পরিচয় জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করল বুলিন।

'হ্যাঁ,' বলল রোমানভ। 'তোমার ম্যাপের স্কয়্যার নাইনে ছোট একটা গ্রাম আছে, দু'একটা কুঁড়েঘর, এই লোক সেখানে থাকত।'

'তুমি কি মনে করো...?'

'হ্যাঁ। ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে প্যাকার।'

'কোন্ দিকে যাচ্ছে দিউ সিভু গাড়িটা?' জানতে চাইল বুলিন।

'আমাদের সেরা তিনজন স্নাইপারের দিকে। ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আমরা কি করব এখন—পিছু নেব?'

'মেয়েটা কে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল বুলিন। 'লোকটা কে? প্যাকার?'

উত্তর করল না রোমানভ। সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব বুলিনের।

'আমরা প্রথমে ওই ছোট গ্রামে যাব,' সিদ্ধান্ত দিল বুলিন। 'আগে জানতে হবে ওখানে প্যাকার আছে কিনা।' সামনের দিকে ঝুঁকে জাহেরকে নতুন পথ নির্দেশ দিল সে।

আবার ছুটল জীপ। পিছনে উঠল বালির পাহাড়।

'তিন নম্বর পোস্টকে ডাকো,' হঠাৎ নির্দেশ দিল বুলিন। 'বলো, লোকটাকে খুন করা চলবে না। সে যদি প্যাকার হয়, তার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

ওয়াকি-টকি অন করে তিন নম্বর পোস্টের সাথে যোগাযোগ করল রোমানভ। বুলিনের নির্দেশ প্রচার করল সে।

'গাড়িটাকে অচল করে দিক, কিন্তু ওদেরকে আমি জ্যান্ত পেতে চাই,' নির্দেশটা শেষ করল বুলিন।

দশ মিনিট গাড়ি চালাবার পর সামনে দেখা গেল তিনটে কুঁড়েঘর। খড় আর বাঁশের তৈরি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা আফ্রিকান গ্রাম। গেটের সামনে থামল জীপ। হাতে রিভলভার নিয়ে নিকোলাইয়ের পিছু পিছু খোলা উঠানে এসে দাঁড়াল বুলিন।

চেহারায় অস্বস্তি আর আড়ষ্ট ভাব নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াল তিনজন আফ্রিকান যুবক। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আত্মরক্ষার একটা ভাব আছে। অন্ধকার ঘরের ভেতর বউ-ছেলে-মেয়েরা গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হাসছে না, কোথাও কোন শব্দ নেই।

'আমরা বিদেশী একজন লোককে খুঁজছি,' মোহারের বড় ছেলে গাফুরকে বলল বুলিন। 'কোথায় সে?'

সবুজ চোখের অশুভ দৃষ্টি ভয় পাইয়ে দিল গাফুরকে। মশিয়ে প্যাকার এই শয়তান লোকগুলোর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। কাজেই মিথ্যে কথা বলার

আর কোন দরকার আছে বলে মনে হলো না তার। 'তিনি মারা গেছেন, মশিয়ে। আমরা এইমাত্র তাঁকে কবর দিয়েছি।'

বুলিনের মুখের পেশীতে টান পড়ল। 'কোথায়?'

এগিয়ে গিয়ে গেটের বাইরেটা দেখাল গাফুর। 'ওখানে, গাছের নিচে।'

'জাহের!' হুঙ্কার ছাড়ল বুলিন।

আর কিছু বলতে হলো না, তীরবেগে গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল জাহের। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা কোদাল, সেটা তুলে নিয়ে কবরটা নতুন করে খুঁড়তে শুরু করল সে।

বড় ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে নিকোলাই, একটু পর বেরিয়ে এসে বুলিনের সামনে দাঁড়াল সে। ইঙ্গিতে বড় ঘরটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানেই লুকিয়ে ছিল প্যাকার। মেঝেতে ছোট একটা গর্ত রয়েছে, কিছু বোধহয় পুঁতে রাখা হয়েছিল।'

'হুঁ।' গেট পেরিয়ে বাইরে, গাছের নিচে এসে দাঁড়াল বুলিন। জাহেরকে এখন সাহায্য করছে দাউদ। কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। উঁকি দিয়ে ওয়েন প্যাকারের মুখ দেখল বুলিন। পাশে এসে দাঁড়াল নিকোলাই।

'আত্মহত্যা করেছে,' বলল বুলিন। 'শালা পালিয়ে গেল। বানচোত সব সময় আমাদের চেয়ে এক পা এগিয়েই থাকল।' আরও একটু ঝুঁকে লাশের মুখে থু থু ছিটাল সে।

'তার মানে,' বলল নিকোলাই, 'গাড়ি করে যারা যাচ্ছে, ওদের কাছেই ফিল্ম আছে!'

'রোমানভকে বলো, তিন নম্বর পোস্টকে আবার ডাকুক। যে-কোন মূল্যে থামাতে হবে গাড়িটাকে,' বলল বুলিন। 'গাড়ি যদি থামাতে না পারে, গুলি করে মেরে ফেলুক সবাইকে। যাও!'

জীপ লক্ষ্য করে ছুটল নিকোলাই। লম্বা পা ফেলে উঠানে ফিরে এল বুলিন। গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'আরেকজন বিদেশী লোক ছিল এখানে। কে সে?' গাফুরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

এক পা পিছু হটল গাফুর। 'আমি জানি না, মশিয়ে।'

রিভলভারের বাট দিয়ে গাফুরের চোয়ালে ধাঁই করে এক ঘা বসিয়ে দিল বুলিন। পড়ে যাচ্ছিল সে, টলতে টলতে কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকল। চোয়ালের মাংস থেঁতলে গেছে।

'কে সে?' আবার জিজ্ঞেস করল বুলিন। ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

'আমি জানি না, মশিয়ে।'

ঘাড় ফিরিয়ে জাহেরের দিকে তাকাল বুলিন। 'ঘরের ভেতর ঢোকো, খুঁজে দেখে একটা বাচ্চা ধরে নিয়ে এসো। এই হারামজাদা কথা না বললে তার গলায় ছুরি চালিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে দেবে মুণ্ডু।'

ঘরের ভেতরে মেয়েদের কান্নার রোল পড়ে গেল। ভেতর ঢুকতে গিয়ে বাধা

পেল জাহের। মেয়েদের চুল ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করল সে। ছোট একটা বাচ্চাকে ধরে নিয়ে আসতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল।

বাচ্চা ছেলেটাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে জাহের, তার দিকে ছুটে গেল মোহারের ছোট ছেলে, হাতে একটা গাছের ডাল। রিভলভার তুলে তার মাথায় গুলি করল বুলিন।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই। জাহেরের হাতে ধরা বাচ্চাটাও এখন আর কাঁদছে না। তারপর ছেলে-মেয়ে সবাই একসাথে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। গুলি খাওয়া লাশের ওপর আছড়ে পড়ল একটা মেয়ে। লাশের চারদিকে গড়াগড়ি খেতে লাগল সে, তার কাপড়চোপড় ঠিক থাকল না।

এসব দিকে বুলিনের কোন খেয়াল নেই। তার দৃষ্টি গাফুরের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'মেয়েটা কে?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে গাফুর বলল, 'মশিয়ে প্যাকারের মেয়ে।'

'আর লোকটা?'

'তার নাম বলছিল ওরা মশিয়ে মাসুদ রানা।'

ইঙ্গিতে বাচ্চা ছেলেটাকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিল বুলিন। জাহেরের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই একছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল ছেলেটা। তার মা তাকে বুকে তুলে নিল।

ছুটল বুলিনও। গেট পেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে জীপে চড়ল সে। 'গাড়িতে ওরা রানা আর প্যাকারের মেয়ে। তিন নম্বর থেকে কিছু এল?'

রেডিওর ডায়াল অ্যাডজাস্ট করছিল রোমানভ, একটা হাত তুলে বুলিনকে চুপ থাকতে বলল সে। কয়েক সেকেন্ড পর ওয়াকি-টকিতে কথা বলল, 'গুলি করো! থামাতেই হবে ওদের।'

হেডফোন খুলে বুলিনকে বলল সে, 'ওদেরকে দেখা গেছে। তিন নম্বর পোস্ট থেকে এখনও দুই কিলোমিটার দূরে, সোজা ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।'

সীটের ওপর থেকে ছোঁ দিয়ে ম্যাপটা তুলে নিল বুলিন। 'কোথায় ওরা?'

'স্কয়্যার ইলেভেন। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার।'

গেটের ভেতর দিয়ে উঠানে তাকাল বুলিন। 'পুলিসী ঝামেলায় পড়তে চাই না,' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে। গেট দিয়ে উঠানে ঢুকে নিকোলাইয়ের সামনে দাঁড়াল। 'এদের খতম করো। তা না হলে বিপদ হতে পারে। কুইক!'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল নিকোলাই। এই ধরনের অর্ডারই পছন্দ তার, যোগ্যতা দেখাবার এরচেয়ে ভাল সুযোগ আর হয় না। হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে এগোল সে।

জীপে ফিরে এল বুলিন। এরই মধ্যে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে জাহের। দাউদও গাড়ির ছাদে চড়েছে। গোলাগুলি শুরু হতে দু'হাতে নিজেদের চোখ-কান ঢাকল তারা।

গায়ে ধুলো-বালি মাখা একটা ছেলে, আট-নয় বছর বয়স হবে, আতঙ্কে

বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ, একছুটে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। জীপটাকে পাশ কাটিয়ে গেল সে।

হাত তুলল বুলিন, নিঃশব্দ হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে। ট্রিগার টেনে দিল।

বালির ওপর আছাড় খেলো ছেলেটা। খুলি উড়ে গেছে।

'গুড শূটিং,' রোমানভের গলায় প্রশংসা ঝরে পড়ল। 'তোমার এই রিভলভার একটু বাঁ দিক ঘেঁষে মারে, তাই না?'

'সেটা মনে রেখে একটু ডাইনে মারি,' বলে রিভলভারটা পকেটে ভরে রাখল বুলিন।

হাতে ধূমায়িত রিভলভার নিয়ে ছুটে এল নিকোলাই, লাফ দিয়ে জীপে উঠে বসল সে। চেহারায় কোন বিকার নেই তার। সম্পূর্ণ শান্ত আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাকে।

জীপ ছেড়ে দিল জাহের। গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল।

নিঃসঙ্গ একটা শকুন গোত্তা খেয়ে নেমে এল নিচে, একটা গাছের ডালে আড়ষ্ট ভাবে বসল সে। জ্বলজ্বলে চোখে দৃশ্যটা পরীক্ষা করল কিছুক্ষণ। আকাশে আরও শকুন জুটছে, চক্কর দিচ্ছে। তারপর এক এক করে মরু-ঝোপে নামতে শুরু করল তারা।

পায়ে হেঁটে সাবধানে এগোল ওরা। ধীরে ধীরে গেট পেরিয়ে ঢুকল খোলা উঠানে।

বারো

ড্রাইভিং সীটে বসেছে লুনা। গাড়ি নিয়ে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। গাড়িটাকে সচল রাখার জন্যে তার সমস্ত নৈপুণ্য আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হচ্ছে। পাশে বসে ধুলো মাখা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে রানা। মাঝেমধ্যে পেট্রল গজের ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও। বারবার শূন্যের ঘর ছুঁয়ে সামান্য ওপরে উঠছে কাঁটাটা। যে-কোন মুহূর্তে কেশে উঠে ইঞ্জিন থেমে যাবে বলে আশঙ্কা করছে ও।

ওরা যে হারিয়ে গেছে সে-ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। তবে এইটুকু জানে যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বার বার চক্কর খাচ্ছে না। দিক বদলে এখন পুবে এগোলেও, জানে, এখান থেকে দিউগবেল আর নিরাপদ আশ্রয় অনেক কিলোমিটার দূরে।

মাথার ওপর শকুনদের উপস্থিতি আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। ওগুলো যেন জানে, এখন না হলেও পরে, ওদের একটা ভোজের ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে।

যাবে না বলে গোঁ ধরে বসল গাড়ি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগোল খানিক, পিছনের চাকা বন বন করে ঘুরতে লাগল, তারপর স্থির হয়ে গেল দিউ সিভ়।

এবার নিয়ে আলগা বালি থেকে সাতবার তুলতে হলো গাড়িটাকে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কথা না বলে দু'জনই দীর্ঘশ্বাস চাপল। নিচে নেমে পিছনে চলে এল ওরা। মুহূর্তের জন্যে থামল রানা, আকাশের দিকে মুখ তুলে শকুনগুলোকে দেখল। তারপর রিয়ার বাম্পার ধরে লুনার সাথে চেষ্টা করল গাড়িটাকে শূন্যে তুলতে।

শক্ত বালির ওপর তোলা হলো গাড়ির চাকা। 'আমি চালাব?' লুনাকে জিজ্ঞেস করল রানা। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

'থাক,' ক্লান্ত সুরে বলল লুনা। 'একটু পর থেকেই তো হাঁটতে হবে।'

'পানি?'

'ব্যাগের মুখ এখন না খোলাই ভাল,' বলল লুনা। 'এই গরমে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। এখন আমাদের প্রতিটা ফোঁটা সঞ্চয় করা দরকার।'

লুনার চেহারায় হতাশ একটা ভাব লক্ষ্য করল রানা। অভয় দিয়ে হাসল ও। বলল, 'এই ফ্যাসাদ থেকে ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা, তুমি দেখো।'

'শুধু যদি একটা গ্রামের দেখা পাই...' হঠাৎ চুপ করে গিয়ে দূরে তাকাল লুনা। 'মনে হলো, ওদিকে কি যেন দেখলাম, রানা। নড়ল।'

লুনার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল রানা। প্রচণ্ড খরতাপে দগ্ধ হচ্ছে মরু-ঝোপের গাছ, ঘাস, লতাপাতা আর বালি।

'কিছু না, রোদ,' বলল রানা। 'তোমার চোখ ভুল দেখেছে। প্রচণ্ড রোদ থাকলে স্থির জিনিসও মনে হয় কাঁপছে।'

'না! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কিছু একটা নড়েছে।' কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকাল লুনা। 'ওই গাছের ডান দিকে।'

আবার সেদিকে তাকাল রানা। কিন্তু সে-ও কি যেন দেখল। সাদা মত একটা কিছু নড়ে উঠল, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল। 'গাড়ির পেছনে চলে যাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ও। 'জলদি!'

ছুটল লুনা। গাড়ির পিছনে গিয়েই বসে পড়ল সে। মাথা নিচু করে রানাও চলে এল ওর পাশে। এরই মধ্যে ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার। উঁকি দিয়ে বনেট বরাবর গাছটার দিকে তাকাল ও। নড়াচড়াটা আবার চোখে পড়ল ওর। এবার নিশ্চিত ভাবে বুঝল, বালি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগোল একজন লোক, তারপর আবার নিচু হয়ে মিশে গেল মাটির সাথে।

'বাঁ দিকে আরও একজন আছে,' বলল লুনা। 'আরও বাঁ দিকে আরও একজন।'

তিনজনকেই দেখতে পেল রানা। সতর্কতার সাথে, একছুটে খানিকটা করে এগোচ্ছে তারা। ক্রমশ কাছে চলে আসছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল। দু'দলের মাঝখানের দূরত্ব পাঁচশো মিটারও হবে না।

সাইড পকেট থেকে ওয়েন প্যাকারের রিভলভারটা বের করল রানা। 'এটা চালাতে জানো?' জিজ্ঞেস করল ও, পিছিয়ে এসে লুনার দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা।

'জানি।' রিভলভারটা নিল লুনা।

লুনার হাত কাঁপছে না দেখে স্বস্তিবোধ করল রানা। চোখ দুটো শান্ত,

স্থির—ভয়ের চিহ্ন নেই।

আগের জায়গায় ফিরে এল ও, শত্রুদের এগিয়ে আসার জন্যে যথেষ্ট সময় দিয়ে বনেটের ওপর কাঁধ আর মাথা তুলল। গর্জে উঠল একটা রাইফেল, সেই সাথে ওর কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। আহত পশুর মত আর্তনাদ করে উঠল রানা। মাথার ওপর শূন্যে উঠে গেল হাত জোড়া। তারপর পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির আড়ালে।

লুনার গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল।

'শান্ত হও,' ফিস ফিস করে বলল রানা। 'কিছু হয়নি আমার। নোড়ো না।'

দু'জন আফ্রিকান উঠে দাঁড়াল। উজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে চমৎকার টার্গেট। অনেক কাছে এসে গেছে।

'বাঁ দিকেরটা তোমার,' বলল রানা, লক্ষ্যস্থির করার জন্যে সময় নিল এক সেকেন্ড, তারপর গুলি করল। একই সাথে গুলি করল লুনাও, ফলে আওয়াজ হলো একটা গুলির।

দাঁড়ানো লোক দু'জন একই সাথে ঝাঁকি খেলো, তারপর পড়ে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে অপর লোকটা রাইফেল চালাল।

বাঁ হাতের বাইসেপে ধাক্কা খেলো রানা। জায়গাটা চেপে ধরে পিছিয়ে এল ও। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। মুখ তুলে তাকাল ও। এঁকেবেঁকে ক্রল করে এগিয়ে আসছে লোকটা। ও আবার রিভলভার তোলার আগেই গুলি করল লুনা।

একটা ঝোপের পিছন থেকে লাফ দিয়ে সিধে হলো সাদা জোব্বা পরা লোকটা। হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে আছে সে, রাইফেলটা পড়ে গেছে। এক সেকেন্ড হতবিহ্বল দেখাল তাকে, তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত গাড়ির দিকে ছুটে আসতে শুরু করল সে। গুলি করে তার কপাল ফুটো করে দিল রানা।

গাড়ির ওদিক থেকে রানার কাছে চলে এল লুনা। সাদা হয়ে গেছে মুখ, একটু একটু কাঁপছে। কিন্তু রানা আহত হয়েছে দেখে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে।

'সিরিয়াস?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'আরে না, একটু আঁচড় লেগেছে।'

'দাও, বেঁধে দিই।' ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে ফার্স্ট এইড কিটটা নিয়ে এল লুনা। পানি দিয়ে প্রথমে ধুয়ে নিল ক্ষতটা, মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

দ্রুত পায়ে হেঁটে লাশগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। রাইফেলগুলো সংগ্রহ করল ও। প্রতিটি লোকের কোমরে একটা করে কার্ট্রিজ বেল্ট রয়েছে। খোলার কাজে সাহায্য করল লুনা।

'এখন আমরা পাল্টা আঘাত হানতে পারব,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'এসো, গাড়িতে উঠি।'

'কতক্ষণই বা চলবে আর গাড়ি!'

'যতক্ষণ চলে।'

গাড়িতে উঠে সাথে সাথে স্টার্ট দিল রানা। ছোট ছোট লাফ দিয়ে ছুটল দিউ

সিডু। 'সামনে ওরা আরও কতজন আছে সেটাই ভাবছি,' বলল ও। হাতঘড়ি দেখল। তিনটে বিশ। মনে পড়ল, সকাল থেকে ওদের পেটে কিছু পড়েনি। তবে, খিদে পায়নি ওর। শুধু গলা শুকিয়ে খসখসে কাগজ হয়ে আছে, একটু পানির জন্যে ফেটে যেতে চাইছে বুক। পেট্রল গজের দিকে তাকাল ও। শূন্যের ঘরে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে কাঁটা।

'ব্যথা করছে?' জানতে চাইল লুনা।

'না। আড়ষ্ট হয়ে আছে হাতটা। তুমি কোথাও চোট পাওনি তো?'

'না।'

'হ্যাঁ, মেয়ে বটে একটা!' হাসল রানা। 'তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। এমন ইস্পাতের নার্ভ পেলে কোত্থেকে?'

'এরই মধ্যে ভুলে গেছ আমি কার মেয়ে?' ক্ষীণ বিষণ্ণ একটু হাসি দেখা দিল লুনার ঠোঁটে। প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয়, রানা? এই বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাব?'

'আশা করতে দোষ কি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল লুনা। তারপর জানতে চাইল, 'যদি নিরাপদে ফিরে যেতে পারি, ঠিক কোথায় পৌঁছে বিদায় নেব আমরা?'

'বিদায়? তার আগে তো উৎসব!'

'উৎসব? কিসের উৎসব?'

'তোমাকে নিয়ে আমার উৎসব,' বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে প্যারিসে ছোট একটা উৎসব করতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে। এবার কিন্তু সেটা হবে না। এবারের আয়োজনটা হবে বিরাট। তোমাকে আমি নিজের কাজে লাগাতে চাই, লুনা।'

'বুঝলাম না।'

'ঝামেলা কাটুক, তখন বলব,' কথা দিল রানা। 'তোমার মত মেয়ে দরকার আমার রানা এজেন্সিতে।'

'তোমার কাজে লাগতে পারলে তো খুশির কথা,' বলল লুনা। 'কিন্তু এই বিপদ থেকে আগে উদ্ধার পাই তো!'

'হ্যাঁ,' ম্লান সুরে বলল রানা। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল ও। 'দেখো কিসের মধ্যে ঢুকছি।' গাড়ি থামাল ও।

ওদের সামনে হলুদাভ বালির বিস্তৃতি, সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত। আলগা নয়, শক্ত পাথর হয়ে আছে বালি, টান টান করে বিছানো চাদরের মত সমতল। দেখে যেন মনে হয়, গাছ আর ঝোপঝাড়গুলো এরপর আর এগোতে সাহস পায়নি।

'মরা সাগরের মত লাগছে দেখতে,' বলল রানা। 'এটা পেরোবার আশা করা বোকামি।'

'মনে পড়ছে, মোহার এই জায়গার কথা বলেছিল আমাকে।' উত্তেজিত হয়ে উঠল লুনা। 'ওদিকে কোথাও মস্ত একটা ঝর্ণা আছে। গরু-ছাগলকে পানি খাওয়াতে নিয়ে আসে লোকেরা। ওখানে পৌঁছতে পারলে গাইড পাওয়া যাবে।'

'আমাদের গ্যাস নেই।'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, পায়ে হেঁটে হলেও।'

খানিক ইতস্তত করে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। শক্ত, নিরেট বালির ওপর উঠে এল ওরা। কামড়ে ধরার জন্যে শক্ত কিছু পেয়ে দ্রুত এগোল দিউ গিড়ু। গাড়ির ভেতর এখন আর ওরা ঝাঁকি খাচ্ছে না। সাবলীল হয়ে উঠল চলাটা।

'ঝর্ণাটা কতদূর, তোমার কোন ধারণা আছে?' জানতে চাইল রানা। 'দেখে তো মনে হচ্ছে সারাজীবন ছুটলেও এই বালি ফুরোবার নয়।'

মাথা নাড়ল লুনা। 'জানি না। শুধু জানি, অপরদিকে একটা ঝর্ণা আছে।'

পেট্রল গজের কাঁটা স্থির হয়ে আছে। রানা ভাবল, কাঁটার হিসেব কতটুকু নিখুঁত? এই তেপান্তর পেরোবার মত যথেষ্ট গ্যাস ট্যাংকে আছে কি? নিরেট বালি থেকে ছিটকে উঠছে রোদের আঁচ, গাড়ির ভেতর সেদ্ধ হচ্ছে ওরা। মনের ভেতর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে বড় হয়ে উঠছে একটা আতঙ্ক। এই খোলা জায়গায় রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। ইস্পাত-নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার দেখতে পেল রানা শকুনগুলোকে।

গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল ও।

'না!' দ্রুত বলল লুনা। 'জোরে গাড়ি চালালে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে গ্যাস...' ইঞ্জিন ঘড় ঘড় করে উঠল দেখে চোখে আতঙ্ক নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

চাপ দিয়ে শেষ সীমা পর্যন্ত গ্যাস পেডাল নামাল রানা, কিন্তু ইঞ্জিন সাড়া দিল না। খক খক করে কেশে উঠে এবার একেবারে থেমে গেল।

মাথার ওপর স্থির হয়ে ভাসছে কয়েকটা শকুন। হলুদ বালিতে বিরাট ছায়া পড়ল তাদের। জোর করে একটু হাসল রানা। গরম স্টিয়ারিং হুইলে হাত চাপড়ে বলল, 'করার কিছু নেই। সূর্য ডুবতে আরও তিন ঘন্টা। ততক্ষণ এখানেই আছি। তারপর হাঁটব।'

বালির ওপর কালো ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল লুনা। 'তুমি সাথে আছ,' ফিস ফিস করে বলল সে, 'ভয় কিসের! একা থাকলে ভয়েই মরে যেতাম।'

'আমিও,' বলে লুনার ঘামে ভেজা হাতটা ধরে একটু চাপ দিল রানা। হাসল।

কয়েক মিনিট হয়ে গেল ওয়াকি-টকির ডায়াল নাড়াচাড়া করছে রোমানভ। বুলিন লক্ষ্য করল, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে সে।

'তিন নম্বর পোস্ট থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না,' অবশেষে বলল রোমানভ। ওখানে কিছু একটা ঘটেছে।'

'চার নম্বরকে ডেকে দেখো।'

'অনেক উত্তরে ওরা, কিছু জানার কথা নয় ওদের। শেষ মেসেজে তিন নম্বর বলেছিল, গাড়িটা সোজা ওদের দিকে আসছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই গাড়িটাকে বাধা দিয়েছে ওরা।'

'ওদের কাছ থেকে বেশি দূরে নেই আমরা,' বলল বুলিন। 'দশ কিলোমিটারও হবে না।' জাহেরের ঘাড়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল সে। 'জোরে, আরও জোরে!'

স্পীড বাড়ার সাথে সাথে তীব্র ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি। হাতের কাছে যে যা পেল তাই ধরে ঝুলে থাকল ওরা চারজন। গাড়ির ছাদ থেকে বার বার পড়ে যাবার উপক্রম করল দাউদ। ছাদের কিনারা ধরে চেঁচাচ্ছে সে। কিন্তু কেউ তার চিৎকার কানে তুলল না।

এভাবে মিনিট দশেক গাড়ি চালাল জাহের, তারপর তীক্ষ্ণ সুরে নিকোলাই বলল, 'ওখানে···ওইদিকে, তোমার ডানে···কি ওটা?'

স্পীড কমাল জাহের। উইন্ডস্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল বুলিন। বালির ওপর সাদা কি যেন পড়ে থাকতে দেখল সে। নির্দেশ পেয়ে সেদিকে ছুটল গাড়ি। তারপর থামল।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল ওরা। লাশ তিনটেকে ঘিরে দাঁড়াল চারজন।

থমথমে পরিবেশ। কেউ কথা বলল না অনেকক্ষণ। নিস্তব্ধতা ভাঙল রোমানভ, 'আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, রানা ভয়ঙ্কর!'

'রাইফেলগুলো নিয়ে গেছে সে,' বলল নিকোলাই।

ওদের দিকে পিছন ফিরল বুলিন, বালি ঢাকা তেপান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকল। নরম বালিতে আবছাভাবে এখনও ফুটে আছে চাকার দাগ। 'ওদিকে গেছে ওরা,' বলে জীপে এসে উঠল সে। ম্যাপটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। তার সবুজ চোখ জোড়া আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হতাশা আর প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে তার চোখের এই অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।

গাড়িতে তার পাশে উঠে বসল রোমানভ।

'চার নম্বর পোস্ট এখানে?' জিজ্ঞেস করল বুলিন। ম্যাপের গায়ে একটা আঙুল রাখল সে।

'হ্যাঁ।'

'তার মানে আমাদের বৃত্তের বাইরে চলে গেছে ওরা,' বলল বুলিন। 'পিছু ধাওয়া না করে আর কোন পথ নেই। ওরা মরু-ঝোপের ভেতর দিকে যাচ্ছে, বাইরের দিকে নয়, কিন্তু আমাদের কোন পোস্টই এখন আর ওদেরকে বাধা দিতে পারবে না। ওদের পেট্রল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধাওয়া করব আমরা।' মুখ তুলল সে। 'আমাদের পেট্রলের অবস্থা কি?'

'ট্যাংক মাত্র অর্ধেক খালি হয়েছে, সাথে আছে দুটো ক্যান,' বলল নিকোলাই, গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। 'ওদিক থেকে কোন চিন্তা নেই।'

'পানি?'

গম্ভীর হলো নিকোলাই। 'খুব বেশি নেই। যাও একটু আছে শালার এইগরমে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে সব। বুঝেশুনে খরচ করতে হবে।'

হাতঘড়ি দেখল বুলিন। 'সন্ধে হতে আর চারঘণ্টা। তার আগেই ধরতে হবে ওদের।'

'আমাদের সেরা স্নাইপার তিনটেকে মেরেছে ওরা,' বলল রোমানভ। 'কাছে

যাবার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে…'

'নিকোলাই,' বুলিন বলল, 'রাইফেলটা তোমার কাছে থাক। সবার চেয়ে তোমার নিশানা ভাল।'

গাড়ির ছাদ থেকে এইমাত্র নেমে এসেছে দাউদ, তার দিকে তাকাল নিকোলাই। 'রাইফেল দাও।'

আড়মোড়া ভাঙছিল দাউদ, খিক খিক করে হেসে উঠল সে, হাসিটা ঢাকার জন্যে মুখে একটা হাত চাপা দিল। 'গাড়ি যখন খুব জোরে ছুটছিল, ছাদ থেকে পড়ে গেছে ওটা!' হাসির দমকে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল তার। 'আমি খুব চালাক, গায়ে জোর আছে, তাই পড়িনি।'

নিকোলাইয়ের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'বলতে চাইছ, রাইফেলটা হারিয়ে ফেলেছ তুমি?' চিৎকার করে উঠল সে।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল দাউদ। 'না। হারাব কেন? পড়ে গেছে।'

গাড়ি থেকে নেমে এল বুলিন। নিকোলাই দাউদকে মারার জন্যে হাত তুলতেই সেটা ধরে ফেলল সে। 'থামো।' দাউদের দিকে ফিরল সে। 'রাইফেলটা ছাদ থেকে পড়ে গেছে—কোথায়, কতটা পিছনে?'

দু'কাঁধ একসাথে ঝাঁকাল দাউদ। ফেলে আসা পথের দিকে একটা হাত তুলল সে। 'ওদিকে।'

'ওটা কুড়িয়ে আনার জন্যে ফিরে যেতে হবে,' রুশ ভাষায় বলল রোমানভ।

'পাগল হলে?' বলল বুলিন। 'আর কোনদিন পাওয়া যাবে ভেবেছ? হয়তো এক মিটার পাশ দিয়ে চলে যাব, কিন্তু চোখে পড়বে না।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'একটা করে মিনিট নষ্ট করছি, অনেকটা করে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে রানা।' দাউদের দিকে তাকাল সে। 'যাও, রাইফেলটা খুঁজে নিয়ে এসো। তোমার জন্যে আমরা এখানে অপেক্ষা করব।'

দ্রুত মাথা নাড়ল দাউদ। 'অনেক দূর, মশিয়ে। আমি হারিয়ে যাব।'

'যাও বলছি!' হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করল বুলিন।

তাড়াতাড়ি ওদের কাছে এসে দাঁড়াল জাহের। 'মাফ করবেন, মশিয়ে। এই লোক আমার বন্ধু। ও ঠিকই বলছে। ওকে পাঠালে আর ফিরে আসতে পারবে না।'

'তাহলে তুমি ওর সাথে যাও,' বলল বুলিন, রিভলভারটা ঝট করে জাহেরের দিকে তাক করল সে। 'যাও!'

বুলিনের সবুজ চোখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জাহের, দর দর করে ঘামছে সে। কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল। 'আ-আমি তো কি-কিছু ব বলিনি, মশিয়ে। আমি থা-থাকি। ও-ও যা-যাক।'

'তোমরা দু'জনেই যাবে!' এক ঝটকায় রিভলভারের হ্যামার তুলল সে।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা, ফেলে আসা পথ ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটল। রিভলভার তুলে তাদের মাথার ওপর ফাঁকা একটা গুলি করল বুলিন। আরও জোরে ছুটতে শুরু করল ওরা। বারবার হোঁচট খেলো। পড়েও গেল কয়েকবার। কিন্তু পিছন

ফিরে তাকাল না বা থামল না।

'পানির যখন অভাবই,' দেঁতো হাসি হেসে বলল বুলিন, 'মুখের সংখ্যা কমে যাওয়াই ভাল।' রিভলভারটা হোলস্টারে ভরে রাখল সে। ফিরে এসে উঠে পড়ল জীপে। ড্রাইভিং সীটে বসল সে।

বাকি সবাইও জীপে চড়ল। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল বুলিন।

'আমার ভাল ঠেকছে না,' গম্ভীর সুরে বলল রোমানভ। 'রানার হাতে রাইফেল থাকায় আমরা বেকায়দায় পড়ে গেছি। আমরা কাছে ঘেঁষতেই পারব না।'

'আমরা তিনজন,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল বুলিন। 'একজন তার চোখে পড়ব, বাকি দু'জন দু'পাশ থেকে এগিয়ে রেঞ্জের মধ্যে আনব তাকে।'

একঘেয়ে দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রোমানভ। চেহারা আরও যেন থমথমে হয়ে উঠল। 'তাকে পেলে তো! কি রকম বাতাস দিচ্ছে, দেখেছ? চাকার দাগ মুছে যাবে।'

'বলতে পারো ওকে আমরা পেয়ে গেছি,' কঠিন সুরে বলল বুলিন। 'আকাশের দিকে তাকাও। শকুনগুলো ওরই মাথার ওপর ঘুরছে।'

চোখ-ধাঁধানো আকাশের দিকে তাকাল রোমানভ আর নিকোলাই। দূর আকাশের গায়ে কালো কালো কিছু বিন্দু দেখা গেল।

'ওর পেট্রলের অবস্থার ওপর নির্ভর করছে সব,' বলল বুলিন। দক্ষ হাতে ঘণ্টায় নব্বুই কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

ঘড় ঘড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওয়াকি-টকি। তাড়াতাড়ি হেডফোন পরল রোমানভ। কিছুক্ষণ শুনল সে, তারপর নিজের মেসেজে বলল, 'আমরা স্কয়্যার সেভেনের দিকে যাচ্ছি। পানিসহ লোক পাঠাও আমাদের পেছনে। এটা একটা অর্ডার!'

'কি বলে?' জানতে চাইল বুলিন। প্রতিটি মুহূর্ত স্টিয়ারিং হুইলের সাথে কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে।

'পাঁচ নম্বর পোস্ট। দুটো লাশ আর একটা বুইক গাড়ি পেয়েছে ওরা। লাশগুলোর অর্ধেক নেই, শকুনে খেয়ে ফেলেছে। একজন লোক মোটাসোটা, আরেকজন রোগা।'

'ফচেট আর জ্যাসন,' বলল বুলিন। 'ঠিক হয়েছে! কি বলল, পানি পাঠাবে?'

'না,' বলল রোমানভ। 'পাঁচ নম্বর পোস্ট আমাদের কাছ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। গাড়ি নেই। আমরা মরি কি বাঁচি তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই।'

'এসো, একটু পানি খাই,' বলল নিকোলাই। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল সে। 'পরে কি হয় দেখা যাবে।'

পানির ব্যাগে হাত দিল রোমানভ, অন্যমনস্কভাবে বলল, 'রানাকে খতম করলেই সমস্যা শেষ হচ্ছে না। এই বাজ পড়া ঝোপ থেকে বেরুতে হবে আমাদের।'

'এইটুকু পানি নিয়ে এত দূর আসাটা স্রেফ পাগলামি,' অভিযোগের সুরে বলল

নিকোলাই। 'পথে কোথাও ঝর্ণা বা আর কিছু পড়বে না?'

'দেখো তো,' রোমানভকে নির্দেশ দিল বুলিন।

ম্যাপ দেখে নিয়ে রোমানভ বলল, 'এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে একটা ঝর্ণা আছে বটে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে হলে পুরোদস্তুর একটা মরুভূমি পেরোতে হবে। গাছ নেই, ছায়া নেই। শুধু বালি। তোমার কি মনে হয় ওদিকেই যাচ্ছে রানা?'

'তার পেট্রলের ওপর নির্ভর করে।'

'ঝর্ণার দিকেই চলো!' আবেদনের সুরে বলল নিকোলাই। 'পানি না হলে মারা পড়ব সবাই।'

সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ইতস্তত করতে লাগল বুলিন। ভাবছে, রানার কাছে অতিরিক্ত পেট্রল থাকতে পারে। তা থাকলে, সে-ও ওই ঝর্ণার দিকেই যাবে। অবশ্য, ওদিকে ঝর্ণা আছে তা যদি জানা থাকে তার। 'হ্যাঁ,' বলল সে। ড্যাশবোর্ডে ফিট করা কম্পাসের দিকে চোখ রেখে গাড়ির দিক বদলাল।

নতুন দিক ধরে এগোল ওরা। মরু-ঝোপের শেষ মাথায় এসে পৌঁছল। দেখল, এক কিলোমিটার সামনে রোদের মাঝখানে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি—একটা দিউ সিভু।

তেরো

আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে ছোট্ট গাড়ির ভেতর বসে আছে। অসহ্য গরমে হাঁসফাঁস করছে ওরা। রানার মনে হলো, শিরার ভেতর টগবগ করে ফুটছে রক্ত। ধাতব যে-কোন জিনিস ছুঁলেই বিপদ। খেয়াল না করায় জানালার ফ্রেমে কব্জি পড়েছিল ওর, সাথে সাথে চামড়া উঠে গেছে।

'জ্যান্ত পুড়ে মরব!' প্রায় কেঁদে ফেলল লুনা।

'বাইরে আরও গরম,' বলল রানা। লুনার কাঁধে একটা হাত রাখল ও। 'সূর্য নামছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গাড়ির ছায়া হবে, তখন বাইরে গিয়ে বসতে পারব আমরা।'

'এক ঘণ্টা!' হাঁপাতে শুরু করেছে লুনা। মুখ মুছে ঘামের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে। মোছার সাথে সাথে আবার ভিজে যাচ্ছে। 'ততক্ষণ আমি বাঁচব না, রানা!'

'মনটাকে শক্ত করো,' নরম সুরে বলল রানা। 'চেষ্টা করো ভুলে থাকতে। লক্ষ্য করেছ, আগের চেয়ে একটু কম লাগছে গরম? এখন থেকে কমতেই থাকবে। এসো, একটু পানি খাই।'

লুনাকে পানি খাইয়ে নিজে খেতে যাবে রানা, ভিউ মিররে চোখ পড়ে গেল। হাতের গ্লাস আর ঠোঁটে উঠল না, মাঝপথে স্থির হয়ে থাকল। অসহ্য গরম, বুক ফাটা তৃষ্ণা—সব ভুলে গেল ও।

অনেক দূরে বালির একটা পাহাড় দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এই পাহাড়ের একটাই অর্থ। ছুটে আসছে একটা গাড়ি।

'লুনা··· দেখো!'

রানার তীক্ষ্ণ গলা শুনে ঝট করে ফিরল লুনা।

'একটা গাড়ি আসছে!' নিচু হয়ে একটা রাইফেল তুলে নিল রানা।

'ওরা নাও হতে পারে,' সাবধান করে দিল লুনা। 'আগে দেখে নাও।'

'এই নরকে ওরা ছাড়া আর কে আসতে যাবে?' রাইফেলের বাট দিয়ে দরজা খুলে চামড়া-পোড়ানো রোদে বেরিয়ে এল ও। 'তুমি নেমো না,' লুনাকে বলল ও। 'ফাঁকা একটা গুলি করে দেখি কি করে ওরা।' রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করল ও। বালির পাহাড়ের ভেতর গাড়িটাকে দেখতে পেল। একটা জীপ।

গুলি করল রানা।

একদিকে কাত হয়ে গেল জীপ, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনজন লোককে নামতে দেখল রানা। আধ কিলোমিটার দূর থেকেও প্রখর রোদের মধ্যে বুলিনের বিশাল কাঠামো চিনতে পারল ও।

'ওরাই,' বলে রাইফেলের সাইট অ্যাডজাস্ট করল ও। তারপর পর পর তিনটে গুলি করল, সব ক'টা জীপ লক্ষ্য করে।

তিনজনের দলটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, গা ঢাকা দিল কাছাকাছি ঝোপে।

'অ্যামুনিশনের কোন অভাব নেই আমাদের,' বলল রানা। 'আগে জীপটাকে অচল করে দিই। এখান থেকে আমরা যদি বেরুতে না পারি, ওরাও পারবে না।'

একটা রাইফেল হাতে গাড়ি থেকে নেমে এল লুনা। 'তুমি একা মজা লুটবে, সেটি হবে না।'

দু'জন একসাথে গুলি করতে শুরু করল। টায়ার বিস্ফোরণের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা।

'চমৎকার নিশানা তো!'

ঝোপের আড়াল থেকে মোটাসোটা একজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। লোকটার হাতে ওটা বোধহয় রিভলভার। বালির ওপর দিয়ে গাড়ির দিকে নয়, ডান দিকে ছুটছে সে। রানা বুঝল, ঘুরপথে ওদের পিছনে আসতে চায় লোকটা। রাইফেলের সাইট তাড়াহুড়ো করে বদলে মনোযোগের সাথে লক্ষ্য স্থির করল ও। তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

ছুটছিল নিকোলাই, তার আস্তিন ধরে কে যেন টান দিল। তাকিয়ে দেখল, ফুটো হয়ে গেছে।

'ফিরে এসো, গর্দভ!' পিছন থেকে চিৎকার করল বুলিন। 'ফিরে এসো!'

ঘাড় ফিরিয়ে বুলিনের দিকে তাকাল নিকোলাই। ট্রিগারে চাপ দিল রানা। হঠাৎ করেই নিকোলাইয়ের সাদা শার্ট লাল হয়ে উঠল। কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

'বোকা! বোকা!' হাতের তালুতে ঘুসি বসিয়ে দিল বুলিন।

'ওর কথা ছাড়ো,' বলল রোমানভ। বুলিনের পাশে শুয়ে আছে সে। 'আমরা

কি করব তাই চিন্তা করো। আড়াল না পেলে রানার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আড়াল নেই।'

'আড়াল নেই তো কি হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠল বুলিন। 'ওকে আমরা রাতের অন্ধকারে ধরব। এটা কোন সমস্যাই নয়, শুধু অপেক্ষা করলেই আমরা জিতব। গাড়িটা চেক করো, যাও। পানির ব্যাগটা নিয়ে এসো এখানে।'

ক্রল করে জীপের দিকে এগোল রোমানভ। প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় আবার গুলি করল রানা। উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ চুরমার হয়ে গেল দেখে দাঁতে দাঁত চাপল রোমানভ, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল সে।

জীপের নিচে কালো একটা পুকুর দেখে আবার অভিশাপ দিল রোমানভ। পেট্রল ট্যাংক ফুটো করে দিয়েছে রানা! জীপের উল্টো দিকে এসে ভেতর থেকে পেট্রলের অতিরিক্ত ক্যান দুটো নামাল সে, গর্ত করে বালির নিচে পুঁতে রাখল সেগুলো। তারপর হাত বাড়াল পানির ব্যাগের দিকে। ব্যাগটা খালি দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। দেখল, ব্যাগের গায়ে পাশাপাশি একজোড়া গর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

আবার গুলি করল ওরা। জীপের ছাদে লেগে পিছলে গেল বুলেট।

ক্রল করে বুলিনের পাশে ফিরে এল রোমানভ। 'পানি নেই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'গুলি লেগে ফুটো হয়ে গেছে ব্যাগ। জীপটাকে চুরমার করে দিচ্ছে ওরা।'

ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়ে বুলিনের কুকুরে-দাঁত বেরিয়ে পড়ল। হিংস্র হয়ে উঠল তার চেহারা। 'পানি নষ্ট করলেই রেহাই পাবে ওরা, সেটা ভুল। আমাদের কোন চিন্তা নেই। ওদের পানিও আছে, গাড়িও আছে, দুটোই আমরা নিজেদের কাজে লাগাব। পেট্রলের ক্যান দুটো ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা মনে রেখেই উৎসাহ পাবার চেষ্টা করো,' বলে ক্রল করে আরও একটু সামনে এগিয়ে থামল বুলিন।

'গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে, একটু পানি পেলে বেঁচে যেতাম!'

'যাও, রানার কাছে চেয়ে দেখো!' খেঁকিয়ে উঠল বুলিন। 'আর কোন কথা শুনতে চাই না!'

চোখ-ধাঁধানো রোদে দাঁড়িয়ে ভোগান্তির সীমা নেই রানা আর লুনার। গাড়িতে ফিরে যাবার সাহস হলো না রানার। একটু সুযোগ পেলেই রাশিয়ানরা ছুটে কাছে চলে আসবে। ও জানে, ওকে রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে আছে তারা। যেভাবেই হোক, ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

'পানি, লুনা?'

টলতে টলতে গাড়ির দিকে এগোল লুনা। দু'গ্লাস পানি নিয়ে আবার টলতে টলতেই ফিরে এল।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'ব্যাগের ভেতর পানি বোধহয় ফুটছে।'

'এখন না হয় ঠেকিয়ে রাখলাম,' বলল লুনা। 'কিন্তু রাতে কি করবে?'

'হ্যাঁ, রাতে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের,' বলল রানা। বালির ওপর দিয়ে দূরে তাকাল ও। রাশিয়ানদের কাউকে কোথাও দেখল না। 'তুমি লক্ষ্য রাখো। আমি গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করি।'

'গাড়ির ব্যবস্থা?' ভুরু কুঁচকে উঠল লুনার। 'মানে?'

'সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে কোন লাভ নেই, লুনা। সত্যি কথা বলতে কি, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার খুব সামান্যই সম্ভাবনা আছে আমাদের।' কথা বলার সময় লক্ষ্য করল রানা, চেহারা স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লুনা। 'পেট্রল ছাড়া আমরা অসহায়। ওদের দু'জনকে যদি মারতেও পারি, দিউগবেলে পৌঁছবার আশা আমরা করতে পারি না। গাড়িটাকে নষ্ট করে রাখতে চাই আমি, ওরা যাতে আমাদের গাড়ি ব্যবহার করতে না পারে।'

কথা না বলে লুনা শুধু মাথা ঝাঁকাল, 'তুমি যা ভাল মনে করো।'

দিউ সিভুর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বনেট খুলে টার্মিনাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল লিডগুলো ছিঁড়ে ফেলল। তারপর রাইফেল বাটের ঘা দিয়ে কারবুরেটরে লাগানো পেট্রল পাইপটা গুঁড়িয়ে দিল। যখন বুঝল গাড়িটা নষ্ট করা গেছে, লুনার কাছে ফিরে এল ও। তার পাশে বসে বলল, 'তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো। আমি পাহারায় আছি।'

'না, আমি তোমার সাথে থাকব।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না ওরা, তারপর জানতে চাইল রানা, 'ধরো, উদ্ধার পেলাম, প্যারিসে ফিরে কি করতে চাও তুমি?'

'ভাবিনি, ভাবতে চাইও না।'

'আমার খাতিরে একটু না হয় ভাবলেই!'

মুখ তুলে তাকাল লুনা। ঘামে চোখের পাপড়ি পর্যন্ত ভিজে গেছে তার। 'কি লাভ?'

'তবু!'

'প্যারিসে ফিরে আমি চাকরি খুঁজব,' বলল লুনা। 'অনেক বান্ধবী আছে আমার, কাজ পেতে অসুবিধে হবে না।'

'আমার প্রতিষ্ঠানে তোমার মত মেয়ে দরকার,' বলল রানা। 'ভাল বেতন। কিন্তু ঝুঁকি আছে।'

'সত্যি তুমি চাও তোমার সাথে কাজ করি আমি?'

'অবশ্যই চাই।'

'বেশ তো, করব!'

এইভাবে গল্প করে চলল ওরা। মাঝে মাঝে মজার কিছুও বলছে, হাসছে। কিন্তু চোখ দু'জোড়া সতর্ক থাকল সর্বক্ষণ।

দিগন্তরেখার কাছে পৌঁছে গেছে সূর্য। আকাশের দিকে তাকিয়ে শকুনগুলোকে দেখল রানা। 'অন্ধকার হয়ে এলেই গাড়ির কাছ থেকে সরে যাব আমরা। আমি জানি, অন্ধকারে শেষ একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে বুলিন।'

'ওর ওপর সুযোগ নেবার তখনই সময় তোমার,' বলল লুনা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আর আধঘণ্টা, তারপরই সন্ধে হয়ে যাবে।'

পাশাপাশি বসে থাকল, অপেক্ষা করছে ওরা। এক দুই করে পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। ধীরে ধীরে কমে আসছে আলো। কমলা রঙে ছেয়ে গেল পশ্চিমের আকাশ। তারপর একটা দুটো করে ফুটতে শুরু করল তারা।

হঠাৎ মাথা তুলল লুনা। কি যেন শোনার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'শুনতে পাচ্ছ, রানা? কিসের শব্দ ওটা?' উত্তেজনায় কাঁপছে সে। 'শোনো!'

'মনে হচ্ছে হেলিকপ্টার!' রানাও উঠে দাঁড়াল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, দু'জনেই আকাশের গায়ে খুঁজছে ওটাকে।

'ওই যে!' আকাশের দিকে ঝট্ করে একটা হাত তুলল রানা। 'হেলিকপ্টার নয়··· হোভারক্রাফট!'

'ওগুলো কিসের চিহ্ন, রানা?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল লুনা।

'ইউ. এস. এয়ারফোর্সের প্রতীক,' বলল রানা। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রানা, মাথার ওপর হাত তুলে নাড়তে শুরু করল।

নিচু দিয়ে উড়ে আসছে হোভারক্রাফট। শকুনগুলো ছড়িয়ে পড়ল। গতি মন্থর হয়ে এল হোভারক্রাফটের।

একছুটে গাড়ির ভেতর থেকে পানির ব্যাগ বের করে নিয়ে এল রানা। ছিপি খুলে ব্যাগটা উপুড় করে ধরল সে। গরম বালিতে পানি পড়তে না পড়তে যাদু-মন্ত্রের মত শুকিয়ে গেল সবটুকু। আবার গাড়ির কাছে ছুটে গেল ও। ওয়েন প্যাকারের দেয়া টিনের বাক্সটা বের করে নিয়ে এল।

দেখল, শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে হোভারক্রাফট, জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত নাড়ছে পাইলট। তারপর ধীরস্থির ভঙ্গিতে বালির ওপর নামল যান্ত্রিক ফড়িংটা।

একমুখ হাসি নিয়ে দরজা খুলছে পাইলট, দূর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। লুনার হাত ধরে ছুটল রানা। হোভারক্রাফটের খোলা দরজার কাছে এসে থামল ওরা। লুনাকে উঠতে সাহায্য করল রানা, তারপর পিছন ফিরে তাকাল একবার।

রোমানভকে পিছনে নিয়ে ছুটে আসছে বুলিন। হাতটা লম্বা করে দিয়েছে সে, একের পর এক গুলি করছে। হাসি পেল রানার। এখনও অনেক দূরে ওরা, গুলি লাগার প্রশ্নই ওঠে না।

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে হোভারক্রাফটে চড়ল রানা, লুনার পাশে বসে পাইলটকে বলল, 'কুইক!'

ছুটন্ত লোক দু'জনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করল হোভারক্রাফট, তারপর বালি ছেড়ে উঠে পড়ল শূন্যে।

'কেন, বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে চান না?'

কথাটা কে বলল দেখার জন্যে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। হোভারক্রাফটের পিছনে ইউ. এস. আর্মির একজন অফিসারের সাথে বসে আছে লোকটা।

আবার নিচে তাকাল রানা। মাইলের পর মাইল খাঁ খাঁ মরু-ঝোপ, এই

মৃত্যুফাঁদ থেকে নিস্তার পাবার কোন উপায় নেই ওদের। বালির ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে হোভারক্রাফটের দিকে। খুদে একজোড়া পিঁপড়ের মত দেখাচ্ছে ওদেরকে।

সাদা পোশাক পরা লোকটার দিকে আবার একবার তাকাল রানা।

'আমি রবার্ট লুডলাম,' বলল সে। 'আপনি হয়তো আমার নাম শুনেছেন। আমি মি. ওয়াটের লোক। আর ইনি লে. রনি পিটারসন, সিকিউরিটি। ঠিক যেন সিনেমার মত ব্যাপারস্যাপার, তাই না, মি. রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আপনাদের সাথে ঠাণ্ডা কিছু নেই বোধ হয়?'

একগাল হাসল লুডলাম। 'নেই মানে!' রানার হাতে একটা ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিল সে। 'স্কোয়াশ।'

ফ্লাস্কটা লুনাকে দিল রানা। 'তুমি আগে।' তারপর লুডলামের দিকে ফিরল ও। 'আমাদেরকে পেলেন কিভাবে?'

'একটু বুদ্ধি খাটিয়ে, বাকিটা ভাগ্য,' বলল লুডলাম। 'পাপিতার লাশ পাবার পর…'

শিউরে উঠল রানা। 'মারা গেছে পাপিতা?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লুডলাম। 'একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে বুলিনের বাংলোয় গিয়েছিল। আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। শুধু যে করুণা তা নয়, পাপিতার জন্যে দুঃখও বোধ করল ও।

'পাপিতার লাশ দেখার পর বুলিনকে খুঁজতে শুরু করলাম,' বলে চলেছে লুডলাম। 'আপনার নষ্ট গাড়িটা পেলাম। দিউগবেলে পৌঁছে ফোন করলাম লেফটেন্যান্টকে। সাথে সাথে হোভারক্রাফট নিয়ে পৌঁছে গেলেন তিনি।'

'তারপর?'

'লেফটেন্যান্টের জন্যে অপেক্ষা করার সময় শহরে ঢুকে গন্ধ শুঁকতে শুরু করলাম,' বলল লুডলাম। 'গল্পবাজ একজন আফ্রিকান ছোকরা আমাকে জানাল, সে আপনাদের একটা ভিলায় ঢুকতে দেখেছে।'

'আচ্ছা!' এই প্রথম কথা বলল লুনা। 'ওখানে গিয়ে কি দেখলেন, মি. লুডলাম? পোলো কাকু…।'

'আপনার পোলো কাকুর সাথে একটু বাজে ব্যবহার করতে হয়েছে,' বলল লুডলাম। 'কি করব, উনি কোনমতেই মুখ খুলতে রাজি হচ্ছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত আমার যুক্তি এবং ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেন তিনি। সম্পূর্ণ ঘটনাটা তাঁর মুখ থেকে শুনলাম। ইতিমধ্যে লেফটেন্যান্ট পৌঁছে গেছেন। হোভারক্রাফট নিয়ে চলে এলাম মরু-ঝোপে—ব্যস, এই তো!'

'আরেকটু আছে,' লুডলামের পাশ থেকে বলল রনি পিটারসন। 'আপনাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি আমরা। প্রথমে পেলাম দুটো লাশ।'

'হ্যাঁ,' বলল লুডলাম। 'ফচেট আর জ্যাসনের লাশ। তারপর পেলাম মি. ওয়েন প্যাকার যেখানে লুকিয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা।' শিউরে উঠল সে।

'কি দেখলেন?'

'জার্মানরা ওদের সবাইকে মেরে রেখে এসেছে,' মৃদু গলায় বলল লুডলাম। 'এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেখিনি আর।'

লুনাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে রানা বলল, 'ও লুনা প্যাকার। ওয়েন প্যাকারের মেয়ে।'

'তাই? পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমিও,' বিড় বিড় করে বলল লুনা।

'আপনি দেখছি খুব ব্যস্ত মৌমাছি,' বলল রানা।

গলা ছেড়ে হাসল লুডলাম।

'আপনাকে কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছে, মি. রানা,' বলল লেফটেন্যান্ট পিটারসন। 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, যেভাবে হোক আজ রাতের প্লেনেই আপনাকে প্যারিসে পাঠাতে হবে। মি. ওয়াট আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

রাগের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু কি মনে করে হাসল ও। জিজ্ঞেস করল, 'হাতকড়া কোথায়?'

'ছি, ছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, মি. রানা,' তাড়াতাড়ি বলল পিটারসন। 'গ্রেফতার…ওটা একটা কথার কথা, এমনিই ঠাট্টা করে বলেছি—আসলে মি. ওয়াট সব বুঝে পাবার পর আপনাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন বলে অপেক্ষা করছেন।'

'ওর কি হবে?' লুনাকে দেখিয়ে গম্ভীর সুরে জানতে চাইল রানা। 'ডাকারে থাকা উচিত হবে না আর।'

'স্পেশাল একটা প্লেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে,' মুচকি হেসে বলল লুডলাম। 'আপনি আমাদের ভি. আই. পি. অতিথি, মি. রানা। মিস লুনার সাথেও কথা বলতে চাইবেন মি. ওয়াট, কিন্তু পরে। সে ক'দিন উনি আমাদের হেফাজতে থাকতে পারবেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মি. ওয়াটকে দেয়ার জন্যে ওর কাছেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেটেরিয়াল আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাই নাকি? তাহলে উনিও প্যারিস যাচ্ছেন আপনার সাথে, আজই রাতে।'

সীটে হেলান দিল রানা। ক্লান্ত হলেও, নিজের কাজ করে চলেছে মাথা। সীন ওয়াটকে নিয়ে ওর কোন চিন্তা নেই। প্যারিসে থাকতে কেন তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, সেটা তাকে বোঝানো যাবে। মাইক্রোফিল্মগুলো পেলে খুশিতে নাচতে শুরু করবে ওই লোক। কার্ল হফারের বারোটা বাজাবার এই সুযোগ আরও বিশ বছর বাড়িয়ে দেবে তার আয়ু। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল রানা, সমস্ত কৃতিত্ব ওয়াটকেই নিতে দেবে ও। বুলিন আর নেই, এই খবরটাও পুলকিত করবে ওয়াটকে। এই কেসে অধিকারের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা নিয়েছে রানা, এই অভিযোগ তুলে ওয়াট যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে, তার ওষুধ জানা আছে রানার। ওয়াট নিশ্চয়ই সি. আই. এ-কে. জানতে দিতে চাইবে না যে পাপিয়া তাকে

একটানা কয়েক বছর ধরে বোকা বানিয়ে গেছে।

আশরাফের কথা মনে পড়ল বারবার। ওর অভাব পূরণ হবার নয়, তবু সান্ত্বনা এইটুকু যে, প্রতিশোধ নেয়া গেছে। এদিকের কাজ মোটামুটি শেষ।

এবার লুনার কথা ভাবতে হবে। দ্বিতীয় ডিনারও কি ওই রোজ গার্ডেন হোটেলে খাবে ওরা? গোলাপ বাগান—নামটা কিন্তু বেশ।

ডাকার এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে হোভারক্রাফট।

(শেষ)